আলোচনা-প্রসঙ্গে

দশম খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

দশম খণ্ড

সঙ্কলয়িতা
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম্-এ

প্রকাশক :

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

প্রথম প্রকাশ—
১লা বৈশাখ, ১৩৬৩

মুদ্রক :

কাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২২শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ৮।১২।৪৭)

প্রাতে ইউনাইটেড প্রেসের বিধুবাবু (সেনগুপ্ত) এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রাজেনদা (মজুমদার), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), বীরেনদা (মিত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতভাই প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন বড়াল-বাংলোয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে।

বিধুবাবু প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

রাজেনদা তাঁর পরিচয় দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহ-সহকারে বললেন—খুব ভাল। আপনাদের অত্যন্ত বড় কাজ। সমাজের বুকে Ideal infuse (আদর্শ সঞ্চার) করবার কর্ত্তা আপনারা। আপনারা ইচ্ছা করলে দেশের চেহারা পালটে দিতে পারেন।

বিধুবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণগ্রহণমুখর, প্রীতিদীপ্ত, প্রাণপূর্ণ কথাগুলি শুনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর পানে।

একটু বাদে বিধুবাবু সবিনয়ে বললেন—দেখুন, আমার অপরাধ নেবেন না, কিন্তু অনেকেই মনে করেন—পাকিস্থান ছেড়ে আসাটা একটা কাপুরুষতা। বিশেষতঃ আপনাদের মতো শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা যদি চ'লে আসেন, তখন সাধারণের মনোবল ভেঙ্গে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, পিছনে কেউ আছে—এইটে না জানলে সাহস হয় না। সাহসের সঙ্গে সহ আছে। লোক যদি ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিত্তিতে সংহত ও সঙ্ঘবন্ধ না হয়, মানুষ যদি মানুষের বান্ধব হ'য়ে তার পিছনে না দাঁড়ায়, বেশীর ভাগ লোকেরই যদি 'চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা'—এমনতর মনোভাব হয়, অর্থাৎ মানুষগুলি যদি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, সেখানে বাহবার লোভে প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে সাহস দেখাতে যাওয়া বোকামিরই রকমারি হ'তে পারে। আমরা যদি আগে থাকতে তেমন সংগঠিত হ'তাম, তাহ'লে দেশবিভাগই হয়তো সম্ভব হ'তো না। কিন্তু সত্যিই-কি আমরা দেশকে ভালবাসি? আমাদের কি সেই দীর্ঘ-দৃষ্টি ও কুশল-কৌশলী পরিচালনা আছে—যাতে সব অমঙ্গলকে অসম্ভব ক'রে তুলতে পারি? আমরা ঘটনাগুলির শিকার হ'য়ে পড়ছি, কিন্তু ভবিষ্যৎকে এঁকে নিয়ে আগে থেকে এমনভাবে প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি করতে পারছি না, যাতে সব শাতানি অভিযানকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে মাঙ্গলিক অভিযান অঢেল ও এস্তার ক'রে তুলতে পারি। আমার

কথা যদি বলেন, তাহ'লে আমি তো এসেছি প্রায় বছর দেড়েক আগে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। এখানে থাকতে-থাকতে গত আগষ্ট মাসে দেশ ভাগ হ'য়ে গেল। পাবনা আশ্রমে তো আমার লোকজন ছিলই, তা'ছাড়া, গত আগষ্ট মাসের পর এখানকার কতকগুলি পরিবারকে পাঠিয়ে দিলাম ওখানে, যাতে ওখানে কাজকর্ম্ম ভালভাবে চলে। কিন্তু কই, তারা কি টিঁকতে পারল? একে-একে সবাই চ'লে আসতে বাধ্য হ'লো। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে কি করবেন বলুন? আমি তো চেষ্টা কম করিনি। এখন অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় কী? তবে হাল ছেড়ে দেবার কিছু নেই। মিলনটাই মানুষের কাম্য, মিলনটাই মানুষের স্বার্থ। আমাদের তাই ক'রে চলতে হবে যাতে সকলের সত্তা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। এরমধ্যে কোন মানুষ বাদ নেই, কোন সম্প্রদায় বাদ নেই, কোন দেশ বাদ নেই, কোন দল বাদ নেই, কোন বাদ বাদ নেই, কোন বৈশিষ্ট্য বাদ নেই। আমি জানি, আমি সকলের, সকলে আমার। এমন ক'রে যদি আমরা না দাঁড়াতে পারি, তবে আমাদের দাঁড়ানটা পোক্ত হবে না। এমন ক'রে দাঁড়াবার যে দাঁড়া তাকেই বলে ধর্ম্ম—যাতে পরিবেশকে নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে। আমাদের কাঠামোকে বলতে পারেন Indo-Aryan Soviet Socialist Republic (আর্য্য-ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)।

বিধুবাবু—আমাদের হিন্দুসমাজে বৈষম্যমূলক আচরণ বড় বেশী, যার ফলে মানুষগুলি বিভক্ত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু মিলিত হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমাদের ঋষি-মহাপুরুষরা কখনও বৈষম্যমূলক আচরণ করেনওনি এবং সে-কথা ভাবেনওনি। তাঁরা যা' করেছেন তা' হ'লো বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ। সেই বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণী আচরণকে যদি আমরা বৈষম্যমূলক আচরণ ব'লে মনে করি, সে ভুল আমাদের। ধরেন, সাম্যের নামে আজ যেমন প্রতিলোমের ধুয়ো উঠেছে। কিন্তু আমি বলি—প্রতিলোম বিয়ে যে দেবেন, তাতে original gene (মৌলিক জনি)-গুলি intact (পুরোপুরি অবিকৃত) থাকবে তো? তা' যদি না থাকে, তাহ'লে যা' তা' করলেই হ'লো? আমাদের শাস্ত্র হ'লো বিজ্ঞান। তা' মঙ্গলের বিধিকে উল্লঙ্ঘন করতে উৎসাহ দেয় না। তাতে যদি আমরা বেজার হই, শাস্ত্র সেখানে নাচার। ফলকথা, এমনতরভাবে বিয়ে হওয়া ভাল না যাতে পূর্ব্বতন শত-শত পুরুষের সাধনার সুফলবাহী gene (জনি) বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এমনতরভাবে gene (জনি) নষ্ট হ'তে দেওয়া মহাপাপ। খেয়ালের খাতিরে ন্যাংড়া আমের ন্যাংড়া-আমত্ব যদি নষ্ট করি, তাতে পরিণামে আমরাই কি বঞ্চিত হব না? আজ হয়তো ন্যাংড়ায় অরুচি ধরেছে আমার। সেই অরুচির আতিশয্যে দুনিয়া থেকে ন্যাংড়াকে যদি নিশ্চিহ্ন ক'রে দেই, এবং পরে যদি একদিন আমার বা আপনার ন্যাংড়া আম খেতে ইচ্ছা করে কিংবা ন্যাংড়ার যদি সেদিন আমার কোন অপরিহার্য্য প্রয়োজন হয়, তাহ'লে মাথা কুটলেও তো সেদিন

আপনি-আমি ন্যাংড়া আম পাব না। অবস্থাটা কি ভয়াবহ ভেবে দেখেছেন? প্রতিলোম বিবাহের প্রশ্রয় দেওয়া মানে কোন জৈবী দানাকে, জৈবী বৈশিষ্ট্যকে জন্মের তরে বরবাদ ক'রে দেওয়া, immortal necklace of germcell (জননকোষের অবিনশ্বর মালা)-কে নষ্ট ক'রে ফেলা। আমি সামান্য মানুষ—অতবড় সর্ব্বনাশা সাহস আমার হয় না। ভগবান দুনিয়ায় equal (একঢালা সমান) নন্, equitable (বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমান)। বেলগাছ, পেয়ারাগাছ, মানুষ, গরু প্রত্যেকে নিজের মতো ক'রে mercy (দয়া) পায় পরমপিতার। কেউ যদি তার বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন ক'রে আর কিছু হ'তে চায়, তাতে পরমপিতা খুশি হন না। যাকে দিয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে চান তিনি, সেই প্রয়োজন সে যথাযথভাবে সিদ্ধ করুক। তাতেই সৃজন-সংস্থিতি সুশৃংখল থাকে। দু'টো মানুষ একরকম নয়, প্রত্যেকের এই অনন্যতা ও অতুলনীয়তাই ঘোষণা করে যে, পরমপিতা এক ও অদ্বিতীয়। কোন শুভ বৈশিষ্ট্যকে তাই নষ্ট করা ঠিক নয়। এইজন্যই বর্ণ মানতে হয়, বিয়ে-থাওয়া, আচার-আচরণ, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য-পোষণী ধাঁজে সুবিনায়িত করতে হয়। আমাদের শাস্ত্র এই নিগূঢ় বিজ্ঞানের বাণীই বলেছে সূত্রাকারে, তা' আপনারা তুলে ধরেন সবার সামনে। মানুষের বেকুবী বিজ্ঞতা ঘুচে যাক। পরমপিতার দয়ায় আপনারা সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন। আপনাদের দৌলতে দেশ বাঁচার পথ পাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ময় হ'য়ে ব'লে চলেছেন। বিধুবাবু ও উপস্থিত সবাই নির্ব্বাক হ'য়ে শুনছেন।

একটু থেমে মাতোয়ারা হ'য়ে আবার বলছেন—আমরা আজ বাপ, বড় বাপের দিকে, ঘরের দিকে তাকাই না। দুটো ইংরেজী বুলি শিখে ধরাকে সরা জ্ঞান করি। ঢের কথা, অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করে। কেবল পচাল পাড়তে ইচ্ছা করে, তাতে যদি মানুষের চেতনা জাগে। আমার মতো মূর্খ, অপদার্থ আর কি-ই বা করতে পারে? ভাবি নিজের আনন্দটা, নিজের জ্বালাটা, নিজের জানাটা, দেখাটা, ভাবাটা যদি সবার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি, হয়তো কিছু কাজ হ'তে পারে। তাও বেশী কইতে পারি না। Blood pressure (রক্তের চাপ) আছে, emotion (আবেগ) হ'লে বুকের মধ্যে দুরু-দুরু করে। এত অস্বস্তি নিয়েও কই কেন? কারণ, বাঁচতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ সকলে মিলে ভালভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের সুবুদ্ধ পিতৃ-পিতামহগণ যে সুন্দর জীবনের কথা বলেছেন, তেমনতর জীবনের অধিকারী হ'য়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলকে সুখী ক'রে, সকলের সুখে সুখী হ'য়ে।

বিধুবাবু—আপনার ভাবাদর্শের প্রচার যতখানি হওয়া উচিত ছিল, তা' হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রচারের বুদ্ধি ছিল না। আমি ছিলাম অজ পাড়াগাঁয়ে। লোকে যেত। তাদের ভালর জন্য যা' বুঝতাম কইতাম, করতাম। জঙ্গল ফুঁড়ে গজিয়ে

উঠেছে যা'-কিছু। আমাকে যারা initiative (স্বতঃ-প্রবর্ত্তনা) নিয়ে ভালবাসতে চাইতো, তারা আমার way of life-এ (জীবনপন্থায়) initiated (দীক্ষিত) হ'তো, আজও হয়। Initiates-দের (দীক্ষিতদের) নিয়ে ধীরে-ধীরে একটা বড় রকমের মানুষের দঙ্গল গ'ড়ে উঠেছে—যারা ভাল চায়, ভাল করে। আমি বুঝি ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ এক বাণীই বহন ক'রে চলেছেন। তাই সৎসঙ্গ সারা পৃথিবীর মানুষের ঈশ্বরকেন্দ্রিক প্রীতিপ্রাণতা ও সেবাপ্রাণতার কথাই ভাবে। দেশ-দেশান্তর থেকে, সুদূর আমেরিকা থেকে লোক এসেছে। সকলেই মনে করে আশ্রম তাদেরই নিজস্ব জায়গা। এটা একটা যৌথ পরিবারের মতো, যে পরিবারে সকলেরই হিস্যা আছে। পরমপিতার দয়ার উপর যেমন সকলেরই অধিকার আছে। তা' থেকে কেউই বঞ্চিত হয় না। তাই প্রচার করতে যাইনি, plan (পরিকল্পনা) ক'রেও কিছু করিনি। Movement (আন্দোলন) বা organisation (সংগঠন) হিসাবেও কিছু করা হয়নি। যা' হবার তা' হ'য়ে উঠেছে পরমপিতার দয়ায়। তবে কল্যাণকর যা'-কিছু তা' ভাল ক'রে চারানই ভাল। না চারান অন্যায়। পরিবেশ যদি কষ্টের মধ্যে থাকে, সে-কষ্ট আপনাকে আমাকেও ছাড়ে না। পরিবেশের যাতে ভাল হয়, তা' করতে হবে। এটা আত্মস্বার্থের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু চারাবার কথা যে বলি—তার তো মাধ্যম চাই। এক জায়গায় গন্ধ যতই থাকুক না কেন, বায়ু না হ'লে তো গন্ধ বয় না, তাই বায়ুর এক নাম গন্ধবহ। বায়ুর উপাসনা তো করিনি। কিন্তু যে মাধ্যমে সত্য ব্যাপকভাবে ছড়ায়, ব্যাপকভাবে চারায়, সে-দিকে নজর দেবারও প্রয়োজন আছে। তাতে পরমপিতার কাজ আরও ভালভাবে হয়। পরমপিতার কাজ বলতে বুঝি সেই কাজ যাতে সবার স্বস্তি হয়।

কেষ্টদা—সে-কাজ এঁরা অনেকখানি পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-ই তো ওঁদের কাজ।

বিধুবাবু—আপনার শরীর খারাপ। তারপর দেশের পরিস্থিতিতেও মন চঞ্চল হয়। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি এমন কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, যাতে শরীর আরও খারও খারাপ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জন্ম নেওয়া ও বেঁচে থাকাটা এমন ধারায় নিয়ন্ত্রিত যে একে অন্যের প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) হওয়া ছাড়া অস্তিত্বই অসম্ভব। তাই আমার যতদিন ব্যথাবোধ আছে, ততদিন অন্যের ব্যথায় আমার ব্যথা লাগবেই এবং অপরের ব্যথার নিরাকরণ না করতে পারা পর্য্যন্ত আমার ব্যথা ঘুচবে না।

বিধুবাবু ও তাঁর সঙ্গী শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরগত গভীরতম সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হলেন। বিদায় নেবার আগে বার-বার বলতে লাগলেন—খুব আনন্দ পেলাম'।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে বললেল—ফাঁক পেলে আবার আসবেন। আমার কিন্তু আশ মিটলো না।

২৩শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ৯।১২।৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর গোল তাঁবুতে ব'সে আছেন। গোঁসাইদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) প্রভৃতি অনেকে ব'সে আছেন কাছে।

সংবিধান কেমন হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় constitution (সংবিধান) রচনা করতে গেলে প্রথম লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন, কিভাবে প্রত্যেকটি মানুষ তার বৈশিষ্ট্যের পথে মঙ্গলের অধিকারী হ'তে পারে। বৈশিষ্ট্য লোপ পায় এমনতর কোন কাণ্ড করা ভাল নয়। বৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করলে সেই সঙ্গে-সঙ্গে সত্তাও বিলুপ্ত হবে। সত্তা বিলুপ্ত হ'লে সম্বর্দ্ধনাই বা দাঁড়াবে কিসের উপর ? তাই constitution (সংবিধান) হওয়া চাই বৈশিষ্ট্যপালী। আর, দেখতে হবে মন্দকে কিভাবে ভালর দিকে মোড় ফেরান যায়, ভালকে কিভাবে আরও ভাল ক'রে তোলা যায়। সমাজে যদি একটা progressive trend (উন্নতিমুখী ধাঁচ) সৃষ্টি না করা যায়, তাহ'লে সমাজ অধোগতির দিকে চলে। তাই দরকার ধর্ম্মপ্রাণতা ও আদর্শপ্রাণতা, যাকে ভিত্তি ক'রে মানুষ প্রবৃত্তি-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। একাদর্শপ্রাণতা থাকলেই প্রত্যেকটা মানুষ স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের পথে চ'লেও ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে। বৈশিষ্ট্যানুসরণ ও ঐক্যবদ্ধতা—একই সঙ্গে এই দুটি জিনিসের সমাবেশ না হ'লে দেশ, জাতি ও সমাজ বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে। আর, ঐ শুভ সামঞ্জস্যের spine (মেরুদণ্ড) হলেন আদর্শ। Constancy to fulfil the Ideal invites the constitution that fulfils.

ইংরাজীতে কথাটা বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই আবার বাংলা ক'রে বললেন—পূরয়মাণ আদর্শনিষ্ঠাই সেই বিধানকে আহ্বান করে যা সর্ব্বপূরণী।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা যে জপধ্যান করি, তার প্রকৃত তাৎপর্য্যই বা কী আর প্রয়োজনই বা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাতঞ্জলে আছে, তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। জপের মধ্যে আছে মানস প্রবৃত্তি। আবৃত্তি মানে সম্যকভাবে থাকা। জপ্য মন্ত্র বা নাম আদি কারণের প্রতীক-স্বরূপ। আর, নাম করা মানে সেই কারণ-সত্তার প্রতি আনত হ'য়ে তাঁতেই অবস্থান করার চেষ্টা করা। অর্থ মানে গতি বা গন্তব্য। নামের গন্তব্য হচ্ছেন নামী। নামের অর্থ ভাবতে গেলেই নামীতে যেয়ে পৌঁছাতে হবে। নাম, নামী, জগৎ ও আমি এই সবগুলির সার্থক সঙ্গতি ও সম্পর্ক আবিষ্কারই জপধ্যানের কাজ। তা' যদি না করি তবে আঁধারে পথ চলার মতো অবস্থা হয়। চলনাটা হয় ফসকানো রকমের। কারণ, নিজের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে এবং তার পিছনের কারণের সঙ্গে কোন পরিচয় বা যোগসূত্র ঘটে না। তাই চলনটা হয় এলোমেলো ও অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু

সেই পরিচয় আমাদের করাই চাই। অর্থসহ নাম করলে ঠাকুরের পরমস্তুতি হয়। নাম হ'লো শব্দব্রহ্মেরই প্রতীক, তা' থেকেই যা'-কিছুর উদ্ভব। নামের মধ্যেই আছে বিশ্বসত্তার বর্ণপরিচয়। নামই ঠাকুরের সত্তা, প্রতিটি যা'-কিছুর সত্তা। তোমার প্রাণনশক্তির তোষণ করলে তুমি যেমন তৃপ্ত হও, ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ নিয়ে নাম করলে তিনিও তেমনি তৃপ্ত হন, তুষ্ট হন অর্থাৎ তোমার সত্তারূপী ঠাকুর প্রেরণাপুষ্ট ও নন্দিত হ'য়ে ওঠেন। যতই নামধ্যান করা যায় ততই ঠাকুরের প্রতি অর্থাৎ জীবন্ত সদ্‌গুরুর প্রতি সত্তার সম্বেগ বাড়ে। তিনিই যে আমার জান-প্রাণ এমনতর অনুভব সমগ্র সত্তাকে ঠেসে ধরে। এইভাবে এগোতে-এগোতে 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' হ'য়ে ওঠেন। স্পষ্ট বোধ করা যায় তিনি ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। সবের মধ্যে এককে দেখি, আবার সেই পরম একের মধ্যে সবকে দেখি। এই দেখাই তো দেখা, এই জানাই তো জানা। আর, এই জানাটাই কিন্তু একটা ধ'রে নেওয়া বা আরোপ করা ব্যাপার নয়। সেই একই শক্তি কোথায় কিভাবে কেমন ক'রে কিরূপে পরিণয়ন লাভ করেছে, তা' মরকোচ-সহ বোধ করা যায়। Analytically (বিশ্লেষণ সহকারে) ও synthetically (সংশ্লেষণ সহকারে) দেখা যায়—সেই একই আছেন সর্ব্বত্র। সবদিক দিয়ে এগিয়ে, সবরকমে সেই এককে বিচিত্ররূপে না পেলে সুখ কোথায়, মজা কোথায়? এ-আনন্দ নিত্যনূতন যোগসূত্র ও সম্পর্ক আবিষ্কারের আনন্দ। তাই বলে নিত্যলীলা। মানুষ তখন নির্ভয় হয়, নিরুদ্বেগ হয়, সদানন্দ হয়। স্ফূর্ত্তিতে গান ধরে (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অপার্থিব আনন্দের দ্যুতি ও ললিতমধুর স্বর্গীয় লাবণ্য)—তোমার খাই, তোমার পরি, তোমার ঘরে বসত করি। Theory (উপপত্তি) করলে হবে না, concrete-এ (বাস্তবে) এসে পৌঁছান চাই। তাই বলেছেন বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেবের ছেলে কেষ্ট ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।

শুধু নরবপু ব'লে ছেড়ে দেননি, গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর ব'লে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন। তাঁকেই চাই। অর্থাৎ নিজ সদ্‌গুরুর প্রতি অটুট নিষ্ঠা চাই। ঐ সক্রিয় নিষ্ঠা ও অনুরাগই মূল জিনিস! নতুবা শুধু নাম করলে কি হবে? তাই আছে 'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্ত্তন, তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন'। অবশ্য, আগ্রহ সহকারে নাম করতে-করতে অনুরাগ হয়। তাই চাই আগ্রহ-সন্দীপ্ত অভ্যাস-যোগ। Mood-টা (ভাবটা) ঐ মুখী ক'রে ফেলতে হয়। করলেই হয়। হওয়ার রাস্তা এস্তার খোলা। 'মীরা কহে বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা'। আমি বলি, নন্দলাল কেন, কাউকেই কিছুকেই 'বিনা প্রেমসে' মেলে না। প্রেম যদি

ঢালতেই হয় তবে নন্দলাল ছাড়া যার-তার পায়ে ঢালতে যাব কোন্ দুঃখে? আমরা কি বেকুব নাকি?

কেষ্টদা—কেউ যদি ঈশ্বরকে চান, অথচ গুরুকরণ না করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তিনি ঈশ্বরকেই চান না। যেমন হাগা যদি পায়, তাহ'লে মানুষ যেমন না হেগে পারে না, ঈশ্বর-লিপ্সাও যদি তেমনি আন্তরিক হয়, তাহ'লেও মানুষ গুরুর শরণাপন্ন না হ'য়ে পারে না। অন্ততঃ আমার এমন ধারণা। গুরুকরণের form (রূপ) সব জায়গায় সমান না হ'তে পারে, তবে গুরুকরণের তাৎপর্য্য যাতে সম্পন্ন হয়, তা' তাকে করতেই হবে।

এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক এসেছিলেন—হরিনাম জপ করতেন, ঘুমের মধ্যেও তাঁর নাম চলতো। কিন্তু অবতারবাদ বা গুরুতত্ত্বে তাঁর আদৌ বিশ্বাস ছিল না। ভক্তি-বিশ্বাস বাস্তব ও জীয়ন্ত কাউকে অবলম্বন করতে যখন কুণ্ঠিত হয়, তখন মনে হয় তার মধ্যে মনের কারচুপির অবকাশ থাকে ঢের। আমি সাধনা করি অথচ আমার গুরু নাই, তার মানে আমার অনিয়ন্ত্রিত মনকে গুরুপদে বসিয়ে তাকেই আমি অনুসরণ করছি। অর্থাৎ, আমি আমার মনের ঘানিতেই ঘুরছি। বল্গাহারা অনিয়ন্ত্রিত মন-বুদ্ধিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুকেন্দ্রিক করাই সাধনা। কিন্তু আমার যদি কোন জীয়ন্ত নিয়ন্ত্রণী-কেন্দ্র না থাকে এবং সেখানে যদি আমি সক্রিয়ভাবে অনুরাগ-নিবদ্ধ না হই, তবে আমি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুকেন্দ্রিক হ'তে পারব কেমন ক'রে, তা' আমি বুঝতে পারি না। তাই গীতায় আছে 'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'।

এরপর আবার পূর্ব্বের প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নামের সঙ্গে ধ্যান না থাকলে নামটা sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে যায় আবার ধ্যানের সঙ্গে নাম না থাকলে ধ্যানটা dry (শুষ্ক) হ'য়ে ওঠে। আমি যা করেছি নেশার চোটে করেছি। খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দেবার মতো কেউ ছিল না, কিন্তু যা' করণীয় ব'লে বুঝেছিলাম তার পিছনে লেগে-থাকার ঝোঁক ও অভ্যাস ছিল অসাধারণ। মাঝে-মাঝে এমন period (সময়) এসেছে, গেছি-গেছি করেছি, অবসাদে মুহ্যমান, শরীর চলে না, মন চলে না, রুঠো হ'য়ে গেছে, মনে হয় ম'রে গেলাম, তবু লেগে থাকতে বাধ্য হয়েছি। ছাড়ব যে তেমন সাধ্য ছিল না, নেইও। নাম যেন পেয়ে ব'সে আছে আমাকে আজীবন। নামই যে আমার অস্তিত্ব তা' আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাই।

এইসব উচ্চাঙ্গের আলোচনা হ'চ্ছে এমন সময় একজন এসে তাঁর উগ্র আর্থিক প্রয়োজনের কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে দিতে বললেন।

এইবার হেসে-হেসে বলছেন—'ও তোর পাকলো চুল, কুটনিপনা গেল না।' বুড়ো হ'য়ে গেলাম। তবু আমার ভিক্ষা করা ঘুচল না।

২৪শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ১০।১২।৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। কাছে আছেন ছোটমা, সুধাংশুদা, সান্ত্বনা দেবী (শ্রীশ্রীঠাকুরের কন্যা), কালিদাসী-মা প্রভৃতি।

ঘরোয়াভাবে নানা বিষয়ে আলোচনা হ'চ্ছে। কাজল-ভাইয়ের পড়াশুনা-সম্বন্ধে ছোটমা একটু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপর ওর যেমন নেশা, তাতে তোমাকে খুশি করার আগ্রহে একঠেলায় শিখে ফেলবে। সেজন্য ভাবতে হবে না। ওর শরীরটা যাতে ভাল থাকে, তাই করা লাগে। আর, মুখে-মুখেই তুমি কত-কিছু শিখিয়ে দিতে পারবে। পড়াশুনার জন্য কখনও তাড়না ক'রো না। ওতে পড়ার প্রতি টান হবার পরিবর্ত্তে বিতৃষ্ণা জন্মাবে। স্ফূর্ত্তি দিয়ে ওর অজ্ঞাতসারে ওকে যদি এদিকে আকৃষ্ট করতে পার, তাতেই কাজ ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইষ্টভৃতির আশীর্ব্বাদী দেওয়ার প্রথা উঠিয়ে দিতে চান। সেই সম্পর্কে বললেন—সব বাপারে democracy (গণতন্ত্র) চলতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাপারে democracy (গণতন্ত্র) চলে না। আমি ওদের latitude (ঈষৎ ঢিল দিয়ে প্রশ্রয়) দিতে কম দিইনি, কিন্তু দেখলাম কিছু হয় না ওতে। ওরা বলল—allurement ও incentive (লোভ ও উৎসাহ)-এর কথা। যদিও জানি ওতে কোন লাভ হয় না, তবু রাজী হলাম এই ভেবে যে ক'রে বুঝুক। এমনি ক'রেই কর্ম্মীদের allowance (ভাতা) ও benefaction (আশীর্ব্বাদী) দেবার রেওয়াজ হয়েছিল। কিন্তু এগুলি কাজের incentive (উৎসাহ-সঞ্চারক) হওয়া দূরের কথা, আগের সেই urge (আকুতি) কোথায় উবে গেল। নিরাশী নির্ম্মম হ'য়ে না নামলে এ-কাজ হবার নয়। আমি বলি কর্ম্মীরা তাদের সেবার উপর দাঁড়াক, যোগ্যতার উপর দাঁড়াক, মানুষ-সম্পদের উপর দাঁড়াক। ঋত্বিকরা যদি ঋত্বিকীর উপর দাঁড়ায়, তাহ'লেই এ movement (আন্দোলন)-এর ভোল বদলে যাবে। তাতে ঋত্বিক্, যজমান সবারই হিম্মত বেড়ে যাবে।

২৫শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১১।১২।৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন। Democracy (গণতন্ত্র)-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—শুনেছি Democracy-র বাংলা নাকি গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের শাসনতন্ত্র। কিন্তু আমার একটা কথা স্বতঃই মনে হয় যে, যে নিজে শাসিত নয় সে কি কখনও দেশকে, সমাজকে বা অন্যকে শাসন করবার অধিকার বা যোগ্যতা লাভ ক'রতে পারে? শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বা পরিচালনার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি যারা হবে, অন্ততঃ তাদের উচিত কোন সুনিয়ন্ত্রিত মানুষের শাসনাধীনে থেকে নিজেদের

সুশাসিত করা। আত্মশাসনের মূল জিনিস হ'চ্ছে ঐ বাঞ্ছিত শ্রেয়ের প্রতি অকাট্য অনুরাগ, যাতে তাঁর মনোমতো হ'য়ে উঠে তাঁকে তৃপ্তিদান ক'রতে না পারলে নিজের কিছুতেই ভাল লাগে না। ঐ হাড়ভাঙ্গা নেশাই মানুষকে শায়েস্তা ক'রে তোলে। প্রেষ্ঠের খুশির জন্য মানুষ ক্রমাগত নিজেকে পরিশুদ্ধ ক'রে চলে। এমনতর আত্মশাসন-তৎপর লোকই জানে অপরকে শাসন করতে হয় কেমন ক'রে। প্রকৃতপক্ষে তার শ্রদ্ধার্হ চরিত্রই অপরকে আত্মশাসনে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। তাই যে তন্ত্রীই আমরা হ'তে চাই, গোড়ায় চাই আদর্শতন্ত্রী হওয়া। জনগণ যদি আদর্শতন্ত্রী না হয়, তাহ'লে গণশক্তির অভ্যুত্থান হয় না। শক্তির মূলে আছে ভক্তি, প্রীতি, সংহতি ও সহযোগিতা। মানুষ যখন আদর্শকে ভালবেসে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধারক, পালক, সেবক ও সহায়ক হ'য়ে ওঠে, তখনই গজিয়ে ওঠে শক্তি। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি যদি পরস্পরকে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও পরপীড়নের পথে পরিচালিত করে, সেই পরিবেশের মধ্যে গণশক্তি যেমন স্ফূর্ত্তিলাভ করতে পারে না, ব্যক্তির আত্মশক্তিও তেমনি পদে-পদে ব্যাহত হ'তে থাকে। এতে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র সবই হীনবল হ'তে বাধ্য হয়। মানুষের চিরকাম্য স্বস্তি, শান্তি, সমৃদ্ধি, দিন-দিন তিরোহিত হ'তে থাকে। তাই গণতন্ত্রকে সফল করতে গেলে আগে ইষ্টতন্ত্রকে কায়েম করতে হবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লিখবি নাকি ?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি ইংরেজীতে বললেন—

Where people unite in a common unit—the Ideal,
with service and surrender to fulfil,
that make every life launch into growth that upholds,
strength or power evolves, rule of love glows,
democratic autocracy shines
with a speed of glory and freedom
in a normal constitution ;
—that is normal democracy as I mean.

(যেখানে জনগণ পরিপূরণী সেবা ও আত্মসমর্পণ নিয়ে একাদর্শে মিলিত হয়, যে সেবা ও আত্মসমর্পণ কিনা প্রতিটি জীবনকে ধৃতিপোষণী বর্দ্ধনায় পরিচালিত করে, সেখানে জেগে ওঠে শক্তি, দীপ্ত হ'য়ে ওঠে প্রেমের শাসন আর ত্বরিত গতিতে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে সহজ সংবিধানাশ্রিত গৌরব ও স্বাধীনতাসমন্বিত গণতান্ত্রিক স্বতঃতন্ত্র। আমি যা' বুঝি, এই হ'লো স্বাভাবিক গণতন্ত্র।)

প্রফুল্ল—Autocracy কথাটার প্রচলিত অর্থ ভাল নয়। যথেচ্ছাচার-সম্পন্ন শাসন-প্রণালীকে মানুষ autocracy বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি autocracy ব'লতে তা' বুঝি না। আমি বুঝি স্বতঃস্ফূর্ত্ত

শাসনতন্ত্র। কেউ যদি ইষ্টকে ভালবাসে, এবং ইষ্টানুরাগের অনুপ্রেরণায় পরিবেশের ইষ্টানুগ সেবা-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে চলে, তার চলনটা হয় অবাধ। যে ভগবানের বিধি মানে, সত্তাসম্বর্দ্ধনার বিধি মানে, সেই-ই প্রকৃত স্বাধীন। তার স্বাধীন চলন অন্যের সত্তাপোষণী স্বাধীন চলনে কোন ব্যাঘাত তো সৃষ্টি করেই না, বরং তাকে পুষ্ট ক'রে তোলে। এমনতর নির্বিরোধ অবাধ চলন কি খারাপ? রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কের গতি-প্রকৃতি যদি এমনতর হয়, তাতেও ভাল বই খারাপ হয় না।

এরপর বললেন—

Autocracy that upholds and nurtures
every individual of adherence
with inter interested obliging service to one another,
and elates the life and growth of everyone
along the requisites,
of their own uplifting move
is a domain of interunited love-service ;
democracy smiles there in an autocratic effulgence
with every freedom of love-rule.

(যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শাসনতন্ত্র পারস্পরিক স্বার্থান্বিত প্রীতিমুখর সেবার মাধ্যমে প্রতিটি অনুরাগদীপ্ত ব্যক্তিকে ধারণ ও পোষণ করে এবং তাদের উন্নয়নী গতির উপযোগী লওয়াজিমার ব্যবস্থা ক'রে প্রত্যেকের জীবন এবং বর্দ্ধনকে ফুল্ল ক'রে তোলে, তাই-ই হ'লো পারস্পরিক ঐক্যসম্বদ্ধ প্রীতিপরিচর্য্যার আবাসভূমি, প্রীতিপ্রবুদ্ধ শাসন-সমন্বিত স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত শাসনতন্ত্রের ঔজ্জ্বল্য সহ গণতন্ত্র সেখানে হাস্য-মুখর।)

প্রফুল্ল—সাধারণতঃ দেখা যায় ধর্ম্মগুরু যাঁরা, তাঁরা আপোষরফাহীন, এমনি তাঁরা খুব সদয়, কিন্তু নীতির বিচ্যুতি তাঁরা সমর্থন করেন না। এমতক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ক'রে ধর্ম্মবিধির গণতন্ত্রীকরণ কি সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিজ্ঞানের বিধির গণতন্ত্রীকরণ কি সম্ভব? ধর, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। একটা বৈজ্ঞানিক বিধি এখানে ক্রিয়া করছে। মানুষের খেয়ালমতো সে বিধি কি উল্টে যাবে? যদি সে বিধি উল্টে যায়, তবে মানুষেরই তো মুশকিল সবচাইতে বেশী। ধর, তুমি কাঠ ধরিয়ে রান্না করবে, তখন যদি কাঠটা না ধরে ও না পোড়ে তখন তোমার সুবিধা হবে, না অসুবিধা হবে? বিজ্ঞানের বিধানের মতো ভগবানের বিধান সব ঠিকই আছে। তাতে কোন গড়বড় নেই, নড়চড় নেই, তোমার-আমার অবিহিত আব্দার বা বায়নায় তার কোন পরিবর্ত্তন হবে না, হবার নয়। তুমি যদি ভাল চাও, ভাল পাওয়ার বিধি তোমাকে অনুসরণ করতেই হবে। চাইবে ভাল, করবে খারাপ, তাতে কখনও ভালটাকে পাবে না। ধর্ম্ম পালন করা মানে সেই বিধি-

অনুযায়ী চলা, যা'তে মানুষ পরিবেশকে নিয়ে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে। যে যতটুকু চলবে, সে যথাসময়ে ততটুকু ফল পাবেই। এর মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ হ'লো অলঙ্ঘনীয় বিধি। এই বিধিই ধারণ ক'রে রেখেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা'কিছুকে। তুমি যেমনটি যা' চাও, তেমনটি তা' পাওয়া যাতে অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে, তেমন ক'রে নিজেকে তার উপযোগী ক'রে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তোমাকে—চিন্তা, বাক্যে, কর্ম্মে, সত্তার সমুচিত বিন্যাসে। তোমার হাউস পূরণ করার জন্য বিধি তার নিজস্ব পথ ছেড়ে বিপথে পরিচালিত করবে না নিজেকে। তাহ'লে সে আর বিধি থাকবে না। তোমাকেই এগিয়ে চলতে হবে তার পথে। তবেই তার আলিঙ্গন, সমাদর ও পুরস্কার লাভ করতে পারবে। সদ্‌গুরুও তাই সার্থক জীবনের বিধিকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেন মানুষের সামনে নিজ জীবনের নিখুঁত আচরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে। তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে চলতে হবে আমাদের, যদি আমরা সার্থক জীবনের অধিকারী হ'তে চাই। এখানে কোন গোঁজামিল চলবে না। গোঁজামিল যতটুকু দেব, বাঞ্ছিত ফল লাভের বেলায় অমিল হবে ততটুকু। তবে এহ বাহ্য। 'বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।' গুরুকে ভালবাসলে ব্যত্যয়ী চলনকে প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। তখন সব প্রবৃত্তি, সব আবোল-তাবোল অভ্যাস, ব্যবহার, ইচ্ছা ও সম্বেগ স্বতঃই গুরুমুখী হ'য়ে বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে। তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা নিজ ইচ্ছা ও খেয়ালের মতো দুর্দ্ধর্ষ হ'য়ে ওঠে মনের কাছে। তা' ত্বরিতগতিতে তামিল না করতে পারলেই যেন চলছে না। এতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযম-সাধনা সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। ধর্ম্মজীবনে কোন কৃচ্ছ্রতার বোধ থাকে না। তাই ধর্ম্ম যারা করবে, তারা কখনও ধর্ম্মকে বিকৃত ক'রে নিজেদের প্রবৃত্তির উপযোগী ক'রে তুলতে চাইবে না। তারা বরং চাইবে ধর্ম্মকে অবিকৃত রেখে নিজেদের চলনাকে নিখুঁতভাবে তার উপযোগী ক'রে তুলতে। এই তো আমি যা' বুঝি।

এরপর বললেন—লেখ্

Where surrender is the essential life-tenor of Dharma,
uphold of existence,
renunciation of passionate crave
and adherence and service to the Ideal are the normal
tenor and tune ;
can it be of a democratic form ?
God is ever auto-cratic,
Dharma—Providence—
the law of life and becoming
is ever autocratic,
Prophets are ever autocratic ;
will-to achieve should ever surrender to it.

(যেখানে আত্মসমর্পণই ধর্ম্মের প্রাণ, সত্তার ধৃতি, প্রবৃত্তিপরায়ণ কামনার পরিহার এবং আদর্শানুরাগ ও আদর্শের সেবা যেখানকার স্বাভাবিক ধারা ও সুর, সেখানে ধর্ম্ম কি কখনও গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ? ঈশ্বর সর্ব্বদা স্বতঃ-তন্ত্রী, ধর্ম্ম, ভগবদ্বিধান, জীবনবর্দ্ধনের বিধি সর্ব্বদা স্বতঃ-তন্ত্রী, মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা স্বতঃ-তন্ত্রী, যারা কিছু লাভ করতে ইচ্ছা করে, তাদের বিধির বেদীর কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত।)

মানুষের কর্ম্মদক্ষতার বিষয়ে কথা উঠলো। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেখানে যেমন টান থাকা উচিত, তা' যদি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে তাহ'লে কর্ম্মক্ষমতাও মিইয়ে যেতে থাকে। মা-বাবা হলেন স্বভাবগুরু। তাঁদের উপর প্রবল টান না থাকলে, মানুষ কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো অকেজো হ'য়ে পড়ে। মানুষ নিজ খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য যতই ভীমকর্ম্মা হো'ক, তার কিন্তু কোন স্থিরতা থাকে না। কোন্ সময়ে যে আর-এক খেয়াল তার কাঁধে চেপে তাকে দিয়ে কি করাবে, তা' সে নিজেও জানে না। অনেক ক'রে-ক'র্ম্মে, একদিকে অনেকদূর এগিয়ে লহমায় হয়তো তা' ছেড়ে দেবে বা পণ্ড ক'রে দেবে। মা-বাপের উপর যাদের নেশা নেই, তারা হ'লো বেওয়ারিশ মাল। জীবনভোর নানা ভূত তাদের নানাভাবে নাচাবেই কি নাচাবে। পাঁচ ভূতের শিকার হবার জন্য তারা পা বাড়িয়ে খাড়া হ'য়ে আছে। এ বড় কঠিন অবস্থা। কর্ম্মক্ষমতা ক্রমবৃদ্ধিপর করতে গেলে যেমন চাই শ্রেয়ের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, তেমনি চাই instinctive activity-তে (সহজাত সংস্কারানুযায়ী কর্ম্মে) লিপ্ত থাকা। এদিক দিয়ে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মব্যবস্থার তুলনা হয় না। আমার মনে হয়—If traditional Varnasramic division of professional labour be established, rinsed and renovated, unemployment will be off, efficiency will be on, capability will set up, imparting of instinctive talent will effulge. (যদি ঐতিহ্যগত বর্ণাশ্রমসম্মত বৃত্তিমূলক শ্রম-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত, পরিস্কৃত ও নবায়িত হয়, তাহ'লে বেকারত্ব দূর হবে, দক্ষতা জেগে উঠবে, যোগ্যতার যাত্রা সুরু হবে, সহজাত শক্তির সঞ্চারণা বিভান্বিত হ'য়ে উঠবে।)

বাণীটি পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন—হ'লো নাকি ?······ প্রফুল্লর আবার ঝোঁক আছে—যা' কই তা' লিখে ফেলে। আপনি ঠিকঠাক ক'রে দেবেন। ইংরেজী জানি না, অথচ কওয়ার হাউস আছে।—ব'লেই বালকের মতো হাসছেন।

কেষ্টদা—অতি সুন্দর হয়েছে। আমারা যে এত ইংরেজী বই পড়েছি, আমরা কিছু লিখতে বা বলতে গেলে এমন apt expression (যথোপযুক্ত ভাষা) তো খুঁজে পাই না। তাই মনে হয় আমাদের মতো ক'রে যে আপনি শেখেননি, সেইটেই পরম-পিতার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—হয়তো তাই।

২৯শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১৫।১২।৪৭)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে রোদপিঠ ক'রে একটা চেয়ারে বসেছেন। কালিদাসীমা, সরোজিনীমা, কালিষষ্ঠীমা, রাণীমা, হেমপ্রভামা, সুষমামা, সুশীলাদি, অনুমা প্রভৃতি মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে আছেন। কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাল সন্ধ্যার পর গোলঘরটার বিছানায় শুয়ে আছি—এমন সময় কে যেন স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট, মানুষের গলার চাইতেও সুস্পষ্টস্বরে বলল—'সন্ন্যাসি না হ'লে কি কাম হয়? হয়, তবে দেরীতে।' সেই থেকে ভাবছি।

মায়েদের মধ্যে কথা হচ্ছে—একজন আর একজনের কথার পৃষ্ঠে বললেন—টাকা না থাকলে ভাব থাকে না। সব ভাব শুকিয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—ভাব-ভালবাসার সম্পদ যার থাকে তার টাকার অভাব হয়ই না। তার চরিত্রই তাকে সব দিক দিয়ে উচ্ছল ক'রে তোলে। সুখ তার পিছে-পিছে ঘোরে, সে কিন্তু নিজের সুখের তোয়াক্কা রাখে না। তার চিন্তা কেমন ক'রে প্রিয়কে সুখী করবে। এই জিনিসটিই সুখ ও ঐশ্বর্য্যের গুপ্ত রহস্য। নারায়ণকে যে ভালবাসে, লক্ষ্মী তার অনুসরণ করেন, তার কষ্ট হ'তে দেন না, যদিও ঐশ্বর্য্যের প্রতি তার লোভ থাকে না, ভাব থাকে না। 'সে তো একলা থাকে না ভাই, যখন যেখানে যায় গো, তাহার সঙ্গে থাকে গো রাই।' রাই মানে লক্ষ্মী। নারায়ণ যেখানে সেখানেই লক্ষ্মী। কিন্তু নারায়ণকে অবজ্ঞা ক'রে যারা লক্ষ্মীর উপাসনা করে, লক্ষ্মী তাদের কাছে অতি চঞ্চলা, ক্রূরা, নিষ্ঠুরা।

নিবারণদা (বাগচী) বহুদিন থেকে অসুস্থ। কোনরকম চিকিৎসায় ফল হচ্ছে না। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমাকে বললেন—তুই বাবার মন্দিরে ধর্না দিলে পারিস। অনেকে তো এতে ফল পায়।

অনুমা—আপনার দয়া হ'লেই সারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর সুস্থতা যে আমারই স্বার্থ। আমি তো চাই-ই—নিবারণ ভাল হ'য়ে উঠুক।

১৮ই পৌষ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ৩।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর আমতলায় ইজি চেয়ারে ব'সে সমবেত দাদাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করছেন।

ধর্ম্মজীবনের বিকাশের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির অবশ্যমান্য কী-কী সেই প্রসঙ্গে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক এবং অদ্বিতীয় যিনি বিশ্বচরাচরের ধারক-পালক ও স্রষ্টা, তাঁর প্রতি নতি ও আনুগত্য প্রথম প্রয়োজন, সেই সঙ্গে-সঙ্গে মানতে হবে পূর্ব্বপরি-

পুরুষ ঋষি-মহাপুরুষগণকে, তাঁদের আবির্ভাব যেখানে যখনই হ'য়ে থাকুক না কেন। আমি শ্রীকৃষ্ণকে মানি যিশুখ্রীষ্টকে মানি না, বা রসুলকে মানি না, তাতে কিন্তু হবে না। যাঁরা দ্রষ্টা ও পরমপথের সন্ধানদাতা, তাঁদের প্রত্যেককে মানতে হবে। আর, মানতে হবে পিতৃপুরুষকে যাঁদের থেকে আমরা উৎসৃষ্ট হয়েছি। পিতৃপুরুষকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা ক'রে, তাঁদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হ'য়ে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। পিতৃপুরুষ তো আমারই উৎস, আমি তো পিতৃপুরুষেরই পরিণতি। পিতৃপুরুষকে বাদ দিয়ে আমরা দাঁড়াই কোথা? আর যা মানা দরকার তা' হ'লো সেই বিধান যা' আমাদের রক্তের ধারা, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্ট কর্ম্মদক্ষতাকে বংশ-পরম্পরায় সঞ্জীবিত ক'রে রাখে। এই উদ্দেশ্যগুলি যা' দিয়ে ভাল ক'রে সিদ্ধ হয়, তাকে আমরা বলি বর্ণাশ্রম। তাই বর্ণাশ্রমের নীতিকে আমাদের মানতে হবে। শুধু মানা নয়, যাতে অভ্যুদয়ের ক্রমাগতি ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, সেইজন্য সর্ব্বত্র বিবাহ ও বৃত্তি-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিক বিধানকে প্রয়োগ করতে হবে। আর, মানতে হবে বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে। তাঁকে মানা মানে তাঁকে ধরা। তাঁকে ধ'রেই মানুষ সঙ্গতি ও সার্থকতার সূত্র খুঁজে পাবে।

উমাদা (বাগচী)—পুরুষোত্তম যে সর্ব্বদা পৃথিবীর বুকে থাকেন, তা' তো নয়। তিনি যখন থাকেন না, তখন মানুষ তাঁকে কিভাবে ধরবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরা মানে দীক্ষা নেওয়া। যুগপুরুষোত্তমের ভাবে ভাবিত, অনুরঞ্জিত, নিষ্ঠাবান, আচারবান, তদ্গতচিত্ত ঋত্বিকের কাছ থেকে ঐ পুরুষোত্তম-প্রবর্ত্তিত দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে ঐ পুরুষোত্তমকেই ইষ্ট মেনে তাঁর পথে চলবে। তবে ভাগ্যবান তারাই যারা তাঁকে রক্ত-মাংস-সঙ্কুল নরদেহে পায়। তাঁকে পাওয়া সার্থক হয় তাদের, যারা নিজেদের তাঁর হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়—নিজেদের খেয়ালখুশি ও চাহিদা বিসর্জ্জন দিয়ে। পরমপুরুষকে নিজেদের মনোমতো ক'রে পেতে চায় যারা এবং তেমনটি না পেলে যারা ক্ষুব্ধ হয়, তাদের বিশেষ কোন লাভ হয় না, তারা ঠকে যায়। কিন্তু যত কষ্টই হোক, যারা নিজেদেরকে তাঁর মনোমতো ক'রে গ'ড়ে তুলতে রাজী থাকে, তাদের আর ভাবনা নেই। একজীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে তারা যতখানি অগ্রসর হয়, শত-শত জীবন সাধনা ক'রেও মানুষ তার ধারে-কাছে এগোতে পারে না। আকাশের ভগবানের প্রতি অনেকেই অনুরাগ ও আনুগত্য দেখাতে পারে, কারণ নিজের মর্জ্জিমতো চলবার অনেক অবকাশ থাকে সেখানে। কিন্তু জীবন্ত ভগবান যখন সামনে দাঁড়িয়ে চালনা করেন মানুষকে তখন বোঝা যায় তাঁর পথে চলতে আমরা রাজী কতটুকু। তাঁর প্রতি চাই unrepelling attachment (প্রতিরোধশূন্য অনুরাগ)। তাঁর নির্দ্দেশ যেটা যতটুকু ভাল লাগবে, সেটা ততটুকু পালন করব, যা' ভাল লাগবে না, তা' এড়িয়ে চলব। এতে চলবে না। তাঁকে যদি ভালবাস, তাঁর প্রত্যেকটি নির্দ্দেশই তোমার কাছে ভাল লাগবে—তা' যতই কষ্টসাধ্য হো'ক। মানুষ

যে ইষ্টের প্রত্যেকটি নির্দ্দেশ হাসিমুখে মাথাপেতে নিতে পারে না, তার কারণ, প্রত্যেকের কতকগুলি পোষা ও প্রিয় দুর্ব্বলতা থাকে। সেগুলির উপর খুব বেশী হাত পড়ে, তা তার কাছে খুব বাঞ্ছনীয় নয়। এটা হ'চ্ছে একরকমের শাতন-প্রীতি। এই শাতন-প্রীতি ইষ্টপ্রীতির পথে বাদ সাধে এবং ইষ্টের ইচ্ছার তালে-তালে ছুটতে দেয় না। যারা ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বরং ওর প্রতি নির্ম্মম হ'য়ে বেপরোয়াভাবে ইষ্টের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলে, তাদের স্থূল সূক্ষ্ম সব রকমের weakness (দুর্ব্বলতা) ও obsession (অভিভূতি) কেমনভাবে যে কেটে যায়, তা' তারা ঠাওর পায় না।

চারুদা (করণ) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেককে দেখেছি ইষ্টভৃতি হয়তো নিয়মিত করে কিন্তু যেদিন পাঠাবার সেদিন হয়তো পাঠায় না, কিংবা যতখানি সাবধানতা অবলম্বন ক'রে নিবেদিত অর্ঘ্যটা রাখা উচিত তা' হয়তো রাখে না, মাঝে-মাঝে তা' থেকে চুরি যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-বিষয়ে খুব শক্ত হওয়া লাগে, তাতে constant concentration (নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতা) হয়, ওতেই মানুষের উন্নতি হয়। দীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও যারা যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে স্বভাবতঃই শৈথিল্যপরায়ণ, বুঝতে হবে তাদের জীবন-সম্বেগই শিথিল। আর, ঐ শৈথিল্যের ফল যা' তাও ফলতে বাধ্য। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির নৈষ্ঠিক পালন হ'লো মিটার যা' দিয়ে বোঝা যায় কে তার অস্তিত্বকে কতখানি সাবুদ ক'রে তুলছে।

প্রফুল্ল—যারা আদৌ দীক্ষা নেয়নি বা অন্যত্র দীক্ষা নিয়েছে তাদের সম্বন্ধে কি এ কথা খাটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা দীক্ষা নেয়নি, তাদেরও দেখতে হবে, তারা বাপ-মা ও গুরুজনকে মানে কিনা, চিন্তায়, বাক্যে, বাস্তব-কর্ম্মে তারা তাদের পালন-পোষণ করে কিনা। যারা অন্যত্র দীক্ষা নিয়েছে, তাদের দেখতে হবে গুরুনিষ্ঠ হ'য়ে যা' করণীয় তারা তা' করছে কিনা। বিহিত দীক্ষা না হ'লে কিন্তু সত্তার সর্ব্বতোমুখী পোষণ হয় না। নামের মধ্যে আছে সত্তার আদিম উপাদান। গুরুভক্তি-সমন্বিত নাম সাধন-সত্তাকে আমূল সঞ্জীবিত ক'রে তোলে।

২২শে পৌষ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ৭।১।৪৮)

মাঝে ক'দিন মেঘলার পর আজ বেশ রোদ উঠেছে। শীতের সকালে এই রোদটা বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিছানায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), হরেনদা (বসু) প্রভৃতি কাছে আছেন।

দক্ষিণাদা রামকানাল্লীর বিবরণ যা' শুনেছেন, সেই-সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাদার আগ্রহদীপ্ত আলোচনা শুনে সহাস্যে বললেন—দক্ষিণাদার রামকানালী না দেখেই খুব ভাল লেগেছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিকতার কাজ যে কত বড় কাজ তা' আজ হয়তো লোকে টের পাচ্ছে না। কিন্তু ঋত্বিক্‌রা যত প্রকৃত ঋত্বিকের গুণে ভূষিত হবে এবং যজমানরা যত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুযোগ্য হ'য়ে উঠবে, ততই ঋত্বিকের কদর বেড়ে যাবে। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, গভর্ণর, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই সেদিন বুঝবে ঋত্বিকের কাজের তুলনায় তাদের কাজ কতখানি superficial (উপরসা)। ঋত্বিকের কাজের পর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শিক্ষকের। যারা জীবন গ'ড়ে দেয়, চরিত্র গ'ড়ে দেয়, তারাই হ'লো সবচাইতে মূল্যবান মানুষ। সে দিক দিয়ে ঘরে-ঘরে বাপ-মায়েরও কিন্তু খুব উচ্চ পদবী। বাপ-মা যদি নিজেদের দায়িত্ব-সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে নিজেদের অভ্যাস-ব্যবহার mould (নিয়ন্ত্রণ) করে তাহ'লে অজ্ঞাতসারে দেশের হাওয়া বদলে যায়। মানুষকে উন্নত ক'রে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্র খুব কমই করতে পারে, যদি ঋত্বিক্‌, শিক্ষক ও বাপ-মা সহযোগিতা না করে। আজকাল পোষাকী চেষ্টা খুব হচ্ছে, কিন্তু যে ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে মানুষ অভ্যুদয়ের আদি সূত্র করতলগত করে, তার জাগরণের কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। সে চেষ্টা যারা করে তাদেরও উৎসাহিত করা হয় না। আপনারা যা করছেন, তা' না করা হ'লে যে হোমরাচোমরাদের লাখো করা ফলপ্রসূ হবার soil (ভূমি) পাবে না, সেই কথাটাই বা কটা লোকে বোঝে?

ঋত্বিকী-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিক্‌দের nurture (পোষণ)-এর বিনিময়ে যজমানরা যদি ঋত্বিক্‌দের জন্য বাস্তবে কিছু না করে, তবে ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীনতার ছিদ্র দিয়ে তাদের জীবনের অনেক উন্নয়নী সম্পদ বেরিয়ে যেতে পারে। মানুষ বড় বা ছোট হয় তার গুণপনার তারতম্য-অনুযায়ী। কারও কাছ থেকে সত্তাপোষণী সেবা পাওয়া সত্ত্বেও তার জন্য যদি কিছু না করা হয় বা করার চেষ্টা না থাকে, তবে ঐ নিথর ভাব কালে-কালে অযোগ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার সৃষ্টি ক'রে তোলে। তাই, প্রত্যেকেরই ইষ্টভৃতির সঙ্গে-সঙ্গে ঋত্বিকী করা উচিত নিজ মঙ্গলের দিকে চেয়ে। তবে মানুষের করার বুদ্ধি খুব। ঋত্বিক্‌দের জন্য যজমানরা খুব করে। ঋত্বিক্‌ যদি মানুষ ভাল হয়, দরদী ও সেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন হয় তাহ'লে তো কথাই নেই। রবি (বন্দ্যোপাধ্যায়) নাকি কয়—যজমান কি চীজ বুঝতে পেরেছি। এমনি বোঝা যায় না, বিপদে পড়লে বোঝা যায়। রবির অসুখ হওয়ার পর থেকে যজমানরা কি করাটাই না করছে। এই করার বুদ্ধিটাকে অনেক সময় নষ্ট ক'রে দেয় ঋত্বিক্‌রা নিজেরা। যেই যজমান দেখে ঋত্বিক্‌ লোভী ও স্বার্থপর, ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা ও লোকের সুখসুবিধার ধান্ধা সে বহন করে না, তখন ঋত্বিক্‌কে দেবার জন্য সে আর কোন আগ্রহ বোধ করে না। তাই, যাদের চারিত্রিক সঙ্গতি নেই, তারা যদি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়, তাতে পরোক্ষে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

কেষ্টদা—যাদের পাঞ্জা দেওয়া হয়েছে, তাদের অনেকেরই তো চারিত্রিক সঙ্গতি নেই ব'লে মনে হয়! তাদের দিয়েও তো লোকের ক্ষতি হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চারিত্রিক সঙ্গতি পুরোপুরি কারও তো হ'য়ে যায় না বা হ'য়ে থাকে না। এ হ'লো নিত্যসাধ্য। যারা sincere (অকপট) তারা নিষ্ঠাসহকারে চেষ্টা করে। তারা ভুল করতে পারে, কিন্তু ভুল সমর্থন করে না। আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম-সমালোচনা ও ভুল সংশোধনের চেষ্টা তাদের লেগেই থাকে। দিন-দিন তারা এগিয়ে চলে। এদের দিয়ে লোকের ভাল বই ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদি কারও দুষ্টবুদ্ধি থাকে, মানুষ হবার পরিবর্তে দাঁও মারার বুদ্ধি থাকে, ক্ষতি হয় তাকে দিয়ে। পাঞ্জা দেওয়া হয় মানুষকে মনুষ্যত্বের সাধনায় অগ্রসর ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে, সেই সুযোগের কেউ যদি অপব্যবহার করে, তাহ'লে তাকে হতভাগ্য ছাড়া আর কি বলা চলে?

প্রফুল্ল—আপনি তো জানেন কে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে, কেবা সেই সুযোগের অপব্যবহার করবে। যার সেই সুযোগের অপব্যবহার করবার সম্ভাবনা আছে, তাকে যদি পাঞ্জা না দেওয়া হয়, তাহ'লেই তো ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন মানুষ কমই আছে বা হয়তো আদৌ নেই, যার সুযোগের অপব্যবহার করবার সম্ভাবনা একেবারে নেই। বেশীর ভাগ মানুষই তো প্রবৃত্তি-ঝোঁকা। এই অবস্থায় কারও ভিতর সৎ নেশা একটু-আধটু দেখলে, তার উপর ভর ক'রে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। যেসব মানুষকে দিয়ে যতখানি হচ্ছে, সেই তো আমি দেখি পরমপিতার অসীম দয়া। তাঁর দয়ায় নাম পেয়ে নিষ্ঠাসহকারে চলে যারা, তাদের কিন্তু অল্পতেই মাথা খুলে যায়। তাদের বিভ্রান্ত করা মুশকিল আছে। যে যত বড়ই হোক, উল্টো চালে চললে, সে এ-বাজারে কলকে পাবে কমই। পরমপিতা যে স্রোত বইয়ে দিয়েছেন তার গতি পরিবর্তন করার সাধ্য আমার নিজেরও নেই। অন্য পরে কা কথা! যে ঠিকভাবে চলবে সেই তরতর ক'রে এগিয়ে যাবে। যে এই সুযোগ পেয়েও দুরিতবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেবে, পুষে রাখবে প্রকৃতিই তাকে বাতিল ক'রে দেবে। তবে মানুষ একটা কলের পুতুল নয়। যে ভাল করতে পারে, সে মন্দও করতে পারে। মন্দ করলেই সে পচে যায় না। মন্দকে শুধরে নেবার ক্ষমতা তারই মধ্যে নিহিত আছে। শুভবুদ্ধির পথে নিজেকে পরিচালিত করতে মন্দ কারও মধ্যে বাসা বেঁধে থাকতে পারে না। তাই মানুষ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে it is to be taken for granted (নিশ্চিত ধ'রে নিতে হবে) যে ভাল করতে গিয়ে কিছু-কিছু মন্দ হতেই পারে। তাতে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। কিছু লোক এমনতর চাই যারা অপরের দোষ দেখে কিছুতেই দুষ্ট হবে না, বরং তারা নিজেরা অক্ষত থেকে সহ্য, ধৈর্য্য নিয়ে সবাইকে ক্রমাগত adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলবে। এইরকম কিছু লোক থাকলে balance (সাম্য) ঠিক থাকে। এরাই হ'লো সমাজের curative force (নিরাকরণী শক্তি)। এদের দৌলতেই সমাজ টিকে থাকে।

কেষ্টদা—যাদের প্রকৃতি খারাপ, তাদের প্রকৃতির কি আদৌ পরিবর্ত্তন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতি ভাল থাক, খারাপ থাক, মানুষের, মানুষের কেন, জীবমাত্রেরই অন্তরগত চাহিদা হ'লো টিকে থাকা। অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায় সকলেই। খারাপ করার ফলে অস্তিত্ব যখন কারও বিপন্ন হয়, তখন কিন্তু সে মনে করে আর খারাপ করবে না। হয়তো রেহাই পেয়ে আবার খারাপ করে। কারণ, বিপন্ন অবস্থায় যে চেতনা জেগেছিল সে চেতনা আর তখন থাকে না। আগের অভ্যাস ও ঝোঁকই আবার প্রবল হয়। তাই দরকার মানুষের অচেতন অবস্থা, অসাড় অবস্থা বা অজ্ঞানতা যাতে বিলকুল কেটে যায় তার ব্যবস্থা। এর জন্য জন্মও ভাল চাই, কর্ম্মও ভাল চাই, পরিবেশও ভাল চাই। যাদের জন্মগত প্রকৃতি খারাপ, তাদের নিয়ে খুব বেগ পেতে হয়। তাদের ভাল হবার ইচ্ছাই জাগতে চায় না। তাদের প্রকৃতি, তাদের বুদ্ধি ও বোধের উল্টো মোড়টাকে সিধে হ'তে দেয় না। তারা মনে করে ভাল হওয়াটা একটা লোকসানী ব্যাপার। এমনি তারা যতই তুখোড় হোক না কেন আদতে তাদের বোধ স্থূল, বিকৃত, জড়, সংকীর্ণ ও অপরিণত। মন তাদের পশুত্বঘেষা। তবু গোড়া থেকে যদি তাদের কতকগুলি ভাল অভ্যাস কলে-কৌশলে ধরিয়ে দেওয়া যায় এবং ভাল পরিবেশের মধ্যে রাখা যায়, তাছাড়া প্রত্যেকটি ভাল কাজের জন্য যদি তাদিগকে লোকসমক্ষে আন্তরিকতার সঙ্গে তারিফ করা যায়, তাহ'লে তারাও ভাল হবার প্রেরণা পায়। মানুষ সামাজিক জীব, লোকের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পেলে খুশি না হয় এমন লোক বড় একটা দেখা যায় না। তাই ভালর জন্য মানুষকে তারিফ করাই ভাল। আর একটা কথা মনে রাখবেন—প্রকৃতি যার যতই ভাল হোক না কেন, ভাল অভ্যাসগুলি যদি গোড়া থেকে কেউ আয়ত্ত না করে, একবার যদি কেউ কতকগুলি বদভ্যাসের দাস হ'য়ে পড়ে, তখন সেও কিন্তু মুশকিলে পড়ে যায়। কর্ম্মীদের বেশীর ভাগের দেখি প্রকৃতি ভাল, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস যেমন দুরস্ত হওয়া উচিত ছিল তা' হয়নি, তাই তারা নিজেরাও ঠিক-ঠিক স্বস্তি পায় না, অন্যকেও ঠিক-ঠিক স্বস্তি দিতে পারে না। ভাল কর্ম্ম বলতে প্রধান জিনিস হচ্ছে শিশুকাল থেকে সর্ব্বপ্রকার সদভ্যাস গ'ড়ে তোলা। এ-ব্যাপারে বাপ-মা ও পরিবারস্থ গুরুজনদের করণীয় খুব বেশী। সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করাটাই সেইজন্য একটা পরম সৌভাগ্য। সদ্বংশ বলতে আমি বুঝি সেই বংশ যাদের পরিবারে বিয়েথাওয়ার ব্যাপারে কোন গোলমাল ঢোকেনি এবং যারা ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও সদাচার সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান। তারা দরিদ্র হো'ক বা লেখাপড়া বেশী না জানুক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ঐ-সব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে জন্মগত প্রকৃতি ও early training (শৈশব-শিক্ষা) দুই-ই ভাল হবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রফুল্ল—ঠাকুর! আপনি বলছিলেন ভাল কাজের জন্য মানুষকে প্রশংসা করবার কথা। কিন্তু মানুষ যদি সুখ্যাতির লোভে ভাল কাজ করে, তাহলে সেই ভাল কাজ কি তার চরিত্রগত হয়? কোন-কোন লোককে তো দেখা যায়, লোকের নিন্দামন্দ বিরোধিতা ও শত্রুতা সত্ত্বেও সে যা' কল্যাণকর ব'লে বোঝে, তা' সে ক'রে চলে।

লোকের নিন্দাস্তুতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। এমনতর লোকই তো প্রকৃত ভাল লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেই তো আর মহাপুরুষ হ'য়ে জন্মায় না। যে যেখানে আছে, তাকে সেখান থেকেই কলে-কৌশলে আরও উন্নত অবস্থার দিকে টেনে তুলতে হবে। মানুষ যদি প্রশংসার লোভে ভাল কাজ করতে অভ্যস্ত হয়, তাই বা মন্দ কী? ভাল অভ্যাসটা ঐ তালে প'ড়ে যদি পাকা হ'য়ে যায়, তাহ'লে তা' আর পরে ছাড়তে চাইবে না। তা ছাড়া ভাল কাজ করার একটা নিজস্ব তৃপ্তি আছে, সেই তৃপ্তির সন্ধান যদি কেউ পায়, তবে সেইটাই হয় বড় incentive (প্রেরণাদায়ক)। বাইরের প্রশংসার উপর নির্ভরশীলতা তখন যায় কমে। ধর, তুমি লেখা-পড়া করতে ভালবাস। তোমার নিজেরই ভাল লাগে এই কাজ। এই কাজের জন্য যদি কেউ তোমাকে নিন্দা করে, তাও তুমি ছাড়তে পারবে না তা'। কিন্তু ছেলেবেলায় তোমার বাড়ীর লোক ও শিক্ষকের উৎসাহ, প্রেরণা ও প্রশংসাই হয়তো তোমাকে এই অভ্যাস গঠনে প্রবৃত্ত করেছে। তুমি কি বলতে চাও, তারা খারাপ কাজ করেছে? তা'ছাড়া পারস্পরিক প্রশংসাপ্রবণতা ও গুণগ্রহণমুখরতা যত বাড়ে পারিবারিক ও সামাজিক প্রীতিবন্ধনও তত দৃঢ় হয়। প্রশংসা করতে শেখা মানে বড় হ'তে শেখা, সহজে আনন্দ পেতে ও আনন্দ দিতে শেখা, হীনম্মন্যতার পাষাণচাপ উপেক্ষা করতে শেখা।

আকাশে হঠাৎ কিছুটা মেঘলাভাব দেখা দিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে কিছু সময় সেদিকে চেয়ে রইলেন। তারপরে আপনমনে অর্দ্ধস্ফুটভাবে অন্তরঙ্গস্বরে বললেন —মা এমনি কোথায় থাকতেন ঠিক থাকত না। মেঘ উঠলেই অমনি তখনই হাসতে-হাসতে কাছে এসে হাজির হ'তেন। জানতেন ঝড়-ঝাপটার সম্ভাবনা দেখলে আমার ভয় করে। মনে হ'তো, সকলেই বুঝি সাবাড় হ'যে যাবেনে, আমি একলাই বুঝি থাকবোনে। পায়ের অসুখের আগে মেঘ দেখলে আনন্দ হ'তো। পা-টা অশক্ত হ'য়ে পরে ভয় হ'তো। মনে হ'তো—টিন ছুটে কারও বুঝি গলাটা কেটে যাবে। ছুটে যেয়ে আমি যে কাউকে বাঁচাব তা' আর পারব না।

আমার পায়ের অসুখ হওয়ায় খুব ক্ষতি হয়েছে। আগে আমি গাঁয়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতাম। পায়ের অসুখ হ'য়ে অচল হ'য়ে পড়লাম। নিজের ইচ্ছামতো একাকী কোথাও যাব, সে উপায় আর থাকল না। এতে যখন যেখানে যার যে knot (গিঁট) খোলা দরকার, তা' আর পারলাম না। এক-এক জনের মনে এক-এক গোপন অনুযোগ জমা হ'তে লাগল। তাতে আবার শশধর ওরা নিজেদের ওজন বাড়াবার জন্য লোকের কাছে আশ্রমের পয়সার গরব করতো। ধীরে-ধীরে স্থানীয় লোকের কতকটা ঈর্ষাপরায়ণতায়, কতকটা হীনম্মন্যতায়, কতকটা বুঝের অভাবে, কতকটা আমাদের লোকের বোকামিতে আশ্রমের প্রতি বিরুদ্ধভাব দানা বেঁধে উঠতে লাগল। নইলে গোড়ায় কিন্তু আশেপাশের লোক বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। আমাদের উপর অবিচার হ'চ্ছে বুঝে বিনাপয়সায় লোকে আশ্রমের

মামলা ক'রে দিয়েছে। পরে হাওয়াটা পালটে গেল। আগে আপনাকে (কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে) ও খ্যাপাকে সবার বাড়ী যাবার কথা বলতাম, তার কারণ ছিল। মানুষের বাড়ীতে গেলে তাতে তাদের ego (অহং)-টা নরম থাকে। অবশ্য বিচার-বিবেচনা ক'রে মাত্রামত আলাপ-ব্যবহার করতে জানা চাই। খোসামোদও ভাল নয়, অহংকারও ভাল নয়। মর্য্যাদাপূর্ণ স্বাভাবিক মেলামেশা একটা art (শিল্প)। অনেকেই তা' জানে না। আমি নিজে যে যাব তা' সঙ্গে হয়তো ২৫ জন জুটলো। তারা হয়তো এমনভাবে কথাবার্ত্তা কইতো, যার ঠেলা সামলান দায় হ'তো। অন্য যারা নিজেরা যেত, তাতেও উল্টো কাম হ'তো। এই তো আমার অবস্থা। লোকের সঙ্গে যারা deal (ব্যবহার) করতে জানে না, purpose to the principle (আদর্শপূরণী উদ্দেশ্য)-সম্বন্ধে যাদের সঠিক ধারণা নেই, তারা সৎ ও পণ্ডিত হ'লেও complex situation (জটিল পরিস্থিতি) manage (পরিচালনা) করতে পারে না।

দক্ষিণাদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—রামকানালীতে যদি আমাদের কলোনী হয় তবে অভিনব ধরণে করা ভাল, টাটানগর কিংবা অন্য কোন জায়গার imitation-এ (অনুকরণে) নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা ঠিকই কইছেন।…………আমার সব সময় মনে হয়, কেমন ক'রে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' আমাদের ছেলেরা বিলেত, আমেরিকা যায়। আমার মনে হয়, invited (নিমন্ত্রিত) হ'য়ে গেলে তার দাম হ'তো। মানে সবাই বুঝুক India-র (ভারতের) কিছু দেবার আছে।

বিকেলে রায়বাহাদুর সত্যেন চৌধুরী আসলেন। তিনি একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ঘুম থেকে উঠে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে বসে তামাক খাচ্ছেন।

প্রফুল্ল সেরপুরের জমিদার সত্যেনবাবুর পরিচয় দানপ্রসঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগের বিষয় বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আনন্দিত হ'য়ে সত্যেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে সুরু করলেন।

আলোচনা-প্রসঙ্গে সত্যেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা তো চেয়েছিলাম independence (স্বাধীনতা), কিন্তু যা পেলাম, তা' টিকবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চেয়েছিলাম freedom (স্বাধীনতা), হয়েছে fewdom (কতিপয়ের রাজত্ব)। কি ভারত, কি পাকিস্তান, কোথাও জনসাধারণের সুখসুবিধা কতখানি হবে বলতে পারি না। যেভাবে স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে তার গোড়াতেই আছে আত্মদ্রোহিতা। যে ক্ষতি হ'য়ে গেছে তা' counteract (ব্যাহত) করতে আরো কতদিন যাবে, তার ঠিক নেই। আমাদের বুদ্ধিগুলি suicidal (আত্মঘাতী), আমরা বৈশিষ্ট্য ও বর্ণাশ্রম ভাঙ্গতে ব্যস্ত, নিজেদের হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে যেন লজ্জা বোধ করি, শাস্ত্রের কল্যাণকর বিধানগুলি বুঝবার মতো মাথাও নেই,

চেষ্টাও নেই, আবার শ্রদ্ধাহীন শত্রুভাবাপন্ন লোকদের কুব্যাখ্যা শুনে নিজেদের ভাল অনেক কিছুকে গলদ মনে ক'রে সেগুলি দূর করার জন্য নাচানাচি ক'রে বেড়াই। মজা হয়েছে মন্দ না। যে আর্য্যকৃষ্টি ষোল আনা বৈজ্ঞানিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার মধ্যে আছে পরম সমাধানের চাবিকাঠি, অপযাজনের পাল্লায় প'ড়ে তাকেই আমরা বরবাদ করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছি। মুসলমান জানে সে কী, খ্রীষ্টান জানে সে কী, কিন্তু আমরা হিন্দুরা জানি না আমরা কী। প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজনা যদি লোপ পেয়ে যায়, তাহ'লেই লোকের মধ্যে আসে এমনতর আত্মবিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি। তাই আজ জোর যাজন চাই। যাতে মানুষগুলি আবার চনমনে হ'য়ে ওঠে। এই ঘুমন্ত অবস্থা কেটে যায়। ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। ধর্ম্মকে জাগালে সব জেগে ওঠে। ধর্ম্ম হ'লো একটা মস্তবড় unifying force (ঐক্যবিধায়নী শক্তি)। মানুষগুলি যার-যার তার-তার মতো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে ব'লে ফেরুপালের মতো হ'য়ে আছে। সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে যে এরা কতবড় শক্তি হ'য়ে দাঁড়ায়, তা' টের পায় না। সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে গেলেই লাগে ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শ। আমি যে সঙ্ঘবদ্ধতার কথা বলছি তার মধ্যে মানুষমাত্রেরই স্থান আছে, তার মধ্যে কোন সম্প্রদায় বাদ নেই, কোন প্রদেশ বাদ নেই, কোন দেশ বাদ নেই। আমরা মানি একমেবাদ্বিতীয়ং, মানি ঋষি, মানি সহজাত-সংস্কার-প্রসূত বর্ণাশ্রম, মানি পূর্ব্বপুরুষ, মানি পূরয়মাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তম। এই নতি ও স্বীকৃতিই অস্তিত্ব ও উদ্বর্দ্ধনের অগ্রনায়ক—এ কথা আমাদের মাথায় থাকা দরকার।

সত্যেনবাবু—Culture (কৃষ্টি) কথাটা বড় শক্ত, ধরুন, Islamic culture (ইসলামীয় কৃষ্টি) বলতেই বা কী বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Islamic culture (ইসলামীয় কৃষ্টি) বলতে বুঝব হজরত রসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে furtherance-এ (আরোতর উন্নতিতে) যাওয়া, achievement-এ (ক্রমাধিগমনে) যাওয়া। উৎকর্ষে যেতে গেলেই চাই উৎকৃষ্ট যিনি তাঁতে আনত। সত্তাসম্বর্দ্ধনী সব culture (কৃষ্টি)-ই তাই মূলতঃ এক। কিন্তু যার যা' নিজস্ব জিনিস তার প্রতি নিষ্ঠা চাই। নিষ্ঠাসহকারে একটাকে হৃদয়ঙ্গম করলে, সেই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে অন্যেরটাকেও বোঝা যায়। তবে এগিয়ে যাওয়ার কোন ইতি নেই। অতীতের প্রতি অনুরাগ নিয়ে ভবিষ্যতের আরোকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য উন্মুখ থাকতে হবে। তবেই মানুষ এগিয়ে যেতে পাবে। একজন যদি রসুলকে ভালবাসে তবে তাকে দেখতে হবে রসুলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অবলম্বন ক'রে বর্ত্তমান-কালে যুগপ্রয়োজন-অনুযায়ী তার পরিপূরণ ক'বে চলছেন এমন কেউ আছেন কিনা। এমন কেউ থাকলে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। পরবর্ত্তীকে দিয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী fulfilled (পরিপূরিত) হন। যেমন আইনষ্টাইনকে দিয়ে নিউটন enhanced (বর্দ্ধিত) হয়েছেন, diminished (হ্রাসপ্রাপ্ত) হননি। নিউটনের যথাযথ মূল্য আমরা বুঝতে পেরেছি আইনষ্টাইনকে পেয়ে।

সত্যেনবাবু—আইনষ্টাইনের মত বের হবার ফলে নিউটনের সিদ্ধান্ত যে অনেকখানি ভুল, তাই-ই তো প্রমাণিত হয়েছে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। পড়াশুনাও করিনি। তবে শুনে-মিলে আমার যা' মনে হয়—তাতে এই বুঝি একসময় নিউটনের সিদ্ধান্তকে এ বিষয়ের whole truth (সমগ্র সত্য) ব'লে মনে করা হ'তো, কিন্তু আজ আইনষ্টাইনের মত বের হওয়াতে এইটুকুই বোঝা যাচ্ছে—ঐটুকুই সব নয়, ঐ truth (সত্য)-এর undiscovered (অনাবিষ্কৃত) অন্যান্য aspect (দিক)-ও আছে। আইনষ্টাইন আজ যা ধরিয়ে দিয়ে গেলেন, তাও হয়তো চরম কথা নয়। পরে হয়তো অন্য বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হবে। তিনি আরো নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করবেন। তাতে নিউটন বা আইনষ্টাইন কেউই নাকোচ হ'য়ে যাবেন না। উভয়কেই আমরা আরো ভাল ক'রে বুঝব। ধর্ম্মজগতেও এই একই ব্যাপার।

প্রফুল্ল—মানুষের বুদ্ধি না হয় সীমিত, কিন্তু অবতার-মহাপুরুষরা তো পূর্ণব্রহ্মের প্রতীক, তাঁরা সমগ্র সত্য যে-কোন সময়েই তো দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানাটা তাঁদের কাছে না-জানার মতো হ'য়ে থাকে। জানাটা সম্বন্ধে তাঁদের কোন অহঙ্কার থাকে না, বা জানাটাকে জাহির করবার জন্যও তাঁরা ব্যস্ত হন না। Environment (পারিপার্শ্বিক)-এর impulse (সাড়া), requisition (প্রার্থনা) ও receptivity (গ্রহণ-ক্ষমতা)-অনুযায়ী যখন যতটুকু দেবার তা' দেন। সাধারণ জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কালে আবির্ভূত পুরুষোত্তমগণের বাণীর মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। যখন যেটুকু তাঁরা ব্যক্ত করেন, তার মধ্যেই পূর্ণতা ও অভ্রান্ততা থাকে।

দূর থেকে নরেনদাকে (মিত্র) দেখে (নরেনদা দীর্ঘদিন রোগভোগের পর এই প্রথম আসলেন) শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে স্নেহলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আসতে পারছেন ? আসতে পারছেন ? রিক্সা ক'রে, না হেঁটে আসলেন ?

নরেনদা—রিক্সায় আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল একটু গায় বল পান তো ?

নরেনদা—অল্প-অল্প।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধানে চলবেন। পেটটা ভারি ক'রে খাবেন না।

আরো কিছু সময় কথাবার্ত্তা ব'লে সত্যেনবাবু বিদায় নিলেন।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—এক-এক যুগে এক-এক নাম দেওয়া হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়—Present Ideal of the time যিনি, তিনিই হ'লেন পথ। তাঁকে বলা যায় নারায়ণ—the way of becoming (বৃদ্ধির পথ)। তাঁর realisation (উপলব্ধি)-অনুয়ায়ী তিনি যে নাম দেন, ঐ নাম করায় দ্রুত উন্নতি হয়। ঐ মানুষটিই হ'লেন নামী অর্থাৎ নামের physicalised form

(শারীর মূর্ত্তি)। তাঁর ধ্যান করতে হয় আর সঙ্গে-সঙ্গে নাম করতে হয়। মানুষের বিবর্ত্তন-অনুযায়ী নামেরও বিবর্ত্তন হয়। উচ্চস্তরের বীজের মধ্যে নিম্নস্তরের বীজ নিহিত থাকে। তাই অবতার-পুরুষরা যুগ-বিবর্ত্তন অনুযায়ী যে-যুগে যে নাম দেন, সেই নাম-সাধনে চরম আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব হ'তে পারে।

শরৎদা—শুনেছি কোন-কোন গুরু শিষ্যের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও স্বধর্ম্ম-অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন নাম দিয়ে থাকেন। এইটেই তো যুক্তিসম্মত ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎনাম সব বৈশিষ্ট্যেরই আদিম উৎস, তাই সৎনামে যে-কোন বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে পরিপোষিত হয়। সেইজন্য আলাদা-আলাদা নাম দেবার প্রয়োজন হয় না। বেশীর ভাগ মানুষই ঢিলে, যেমন ক'রে যা' করবার তা' করে না। সদ্‌গুরু ও সৎনাম পেয়ে মানুষ যদি urge (আকূতি) নিয়ে নিয়মিতভাবে আজীবন আপ্রাণ অনুশীলন করে, তবে এক জীবনেই অনেক-অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। Complex (প্রবৃত্তি)-এর obsession (অভিভূতি)-এর ঊর্দ্ধ্বে ওঠা কঠিন কিছুই না। গুরুকে একমাত্র কামনার বস্তু ক'রে নিলে, সব কামনা, সব প্রবৃত্তি তখন adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে আসে। Adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হওয়া মানে কিন্তু annihilated (নাশপ্রাপ্ত) হওয়া নয়। যে-কামনা, যে-প্রবৃত্তি মানুষকে সংকীর্ণতার কবরে আবদ্ধ ক'রে অনর্থের সৃষ্টি করতো, তাই-ই তখন গুরুর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হ'য়ে ভূমায়িত লোককল্যাণের উদ্‌যাপনে ব্যাপক সার্থকতা লাভ করবে। ফেলা যাবে না কিছু, খোয়া যাবে না কিছু। ক্ষতিকরও হবে না কিছু। আজ যা' বিষ ব'লে মনে হ'চ্ছে সেদিন তা' অমৃত হ'য়ে দেখা দেবে।

প্রফুল্ল—বৈষ্ণবদের মধ্যে নামের উপর খুব জোর দেওয়া আছে। নাম করতে গেলে নামীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে নাম করতে হবে, তাও বুঝলাম, কিন্তু ইষ্টভৃতি জাতীয় বাস্তব কিছু করার বিধান তো দেখা যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মবৎ ইষ্টসেবা এটা বৈষ্ণবদের মধ্যে normal (স্বাভাবিক) হ'য়ে আছে। That is the beginning (সেই-ই সুরু)। এই করাটাই আগ্রহ বাড়ায়। ওরা বিগ্রহের সেবা খুব নিষ্ঠাসহকারে করে। ওটা হ'লো বিকল্প ব্যবস্থা। ওতেও কাজ কিছুটা হয়। বেশী কাজ হয় জীবন্ত গুরু যিনি, তাঁর বাস্তব সেবায়। একজন জ্যান্ত মানুষকে সেবায় তুষ্ট করতে গেলে নজর দিতে হয় তিনি কী চান, তাঁর কী পছন্দ, তাঁর কী প্রয়োজন, আর সেইভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, এতে নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে আবিষ্ট হ'য়ে থাকার জড় অভ্যাসটা ভাঙ্গে। শ্রেয়জনকে সেবায় প্রীত করা তাই একটা মস্ত সাধনা। ওতে অনেক কাজ হয়। অনেক আড় ভাঙ্গে। ছেলেপেলেদের দিয়ে ইষ্টভৃতি যেমন করাতে হয়, তেমনি করাতে হয় মাতৃভৃতি, পিতৃভৃতি। মাথায় ধাঁধাটা ঢুকিয়ে দিতে হয়, যাতে মা-বাবাকে নিত্যনূতন কিছু দিয়ে খুশি ক'রে খুশি হওয়ার নেশা চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। এতে জীবনটা উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। মানুষের সার্থকতা হ'লো শ্রেয়কে প্রীত ক'রে চলায়। সেইজন্য বাপ, মা, গুরুজন ও শিক্ষকের

উচিত হ'লো ছোটরা সামান্য কিছু প্রশংসনীয় কাজ করলেই আন্তরিকতার সঙ্গে উৎসাহ দেওয়া ও তারিফ করা। তা' না করলে ওদের সম্বৃদ্ধি পোষণ পায় না। ছেলেপেলের যেমন বাপ-মা'র খুশিকে মুখ্য ক'রে চলা উচিত, স্ত্রীরও উচিত তেমনি স্বামীর খুশিকে মুখ্য ক'রে চলা। স্ত্রী নিত্য না পারলেও তার মতো ক'রে কিছু-কিছু উপঢৌকন যদি স্বামীকে মাঝে-মাঝে দেয়, তাতে তার স্বামীভক্তি বাড়ে এবং ছেলেপেলেরাও ঐ দৃষ্টান্ত দেখে উপকৃত হয়। রোজ যদি কিছু-না-কিছু দেয়, তাতে আরও ভাল হয়। দিয়ে ও ক'রে পরস্পরের পরস্পরকে সুখী করার অভ্যাস যত চারায়, ততই সমাজের মঙ্গল। গুরুসেবার কথা নানা জায়গায় নানাভাবে আছে। শুনেছি, শিখদের আছে দশবন্ধ—অর্থাৎ অর্জ্জনের অগ্রভাগ দশ আঙ্গুল দিয়ে তুলে গুরুকে নিবেদন করতে হবে।

কথা উঠলো—আমরা যা'-কিছু পাই, তার জন্য যদি পরমপিতার নিকট কৃতজ্ঞ থাকি, তাহ'লে মানুষের নিকট আলাদা ক'রে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবার প্রয়োজন আছে কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, একজনের সাহায্যের উপর দাঁড়িয়ে তুমি বেঁচে আছ। যার সাহায্যে বেঁচে আছ, তার কথা সম্পূর্ণ উহ্য রেখে যদি বল পরমপিতার দয়ায় বেঁচে আছি, তাহ'লে সেটা প্রচ্ছন্ন অকৃতজ্ঞতা হবে। বরং বলা উচিত পরমপিতার দয়ায় অমুকের সাহায্যের উপর দাঁড়িয়ে আমি বেঁচে আছি। তেমনতর বলাই সত্য কথা বলা এবং পরমপিতা ঐ কথাই গ্রাহ্য করেন। অশরীরী সত্তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, অথচ শরীরী যাদের কাছ-থেকে সেবা-সাহায্য পাই, তা ঢাক পিটিয়ে বলতে পারি না, তার মানে অহঙ্কার ও হীনম্মন্যতা আমার কৃতজ্ঞতাবোধের থেকে প্রবল। তাই সেগুলি কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তিকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখে।

যুগ কথার তাৎপর্য্য কী সেই-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সভ্যতার ইতিহাসে এক-এক সময় এক-একটা ভাবের হাওয়া ওঠে, সেই ভাবের প্রাধান্য চলে, এক-এক হাউড় ওঠে, তার সাথে আর সবাই যোগ দেয়। এই যে ভাবের হাওয়া এইটেই হ'লো যুগ-বৈশিষ্ট্য। আজকের যুগের বৈশিষ্ট্য যেমন সবকিছুর যুক্তিবিচার খোঁজা। আপ্তবাক্য ব'লে আজ কোন কথা লোককে মানতে বাধ্য করা যাবে না, যদি তার সঙ্গে যুক্তিবিচার না থাকে। এই যুগের হাওয়াই বোধ হয় আমার কথাগুলিকে mould (নিয়ন্ত্রিত) করেছে। কিছু বলতে গেলেই তার সঙ্গে কার্য্যকারণ সূত্র এসে পড়েছে। যুক্তিবিচারের সাহায্যে মানুষ আবার মানুষকে বিভ্রান্তও করছে। এই বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে ভাল ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে পরিবেশ-সহ প্রত্যেকের সত্তাসম্বর্দ্ধনা অক্ষুণ্ণ থাকে কিভাবে। এই সঞ্চারণাই হ'লো যাজন। ভগবদ্ভক্তি-সমন্বিত যুক্তিপূর্ণ যাজন আজকের যুগে বিশেষ প্রয়োজন। নইলে প্রবৃত্তি-অনুগ যুক্তি যেমন ক'রে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করছে তা থেকে তাদের বাঁচান যাবে না। প্রবৃত্তির দাবী ততদূরই মানা চলে, যতদূর পর্য্যন্ত তা'

সত্তাপোষণের সহায়ক। সেই সীমা লঙ্ঘন ক'রে যখন তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তখনই হয় অধর্ম্ম। অধর্ম্ম কিন্তু প্রবৃত্তিরও সয় না, সত্তারও সয় না। কারণ, সত্তা যদি বজায় না থাকে, তাহ'লে প্রবৃত্তিও আশ্রয়চ্যুত হ'য়ে পড়ে। প্রবৃত্তির নিজস্ব উপভোগও অসম্ভব হ'য়ে পড়ে যদি সত্তা সাবাড় হ'য়ে যায়। তাই, প্রবৃত্তি উপভোগ করতে গিয়েও দেখতে হবে তা' কিভাবে সত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে পোষণপুষ্ট ক'রে তোলে। এই মাত্রা ঠিক রাখতে গেলে লক্ষ্য রাখতে হবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার মানদণ্ডের উপর। তাই ইষ্টে যুক্ত না হ'লে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'লে ভ্রান্তিহীন যুক্তিবিচারের সামর্থ্যই গজায় না।

শরৎদা—বিরূপাক্ষ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরূপাক্ষ মানে বিষম চক্ষু যাঁর। দু'টি চক্ষু যাঁর সমান নয়। শিবের একনাম বিরূপাক্ষ। তিনি ধ্বংসের ভিতর-দিয়ে মঙ্গল করেন। প্রবৃত্তিমূঢ়তা আমাদের কাছে অতি প্রিয়। তা' যখন বিধিবশে বিপর্য্যয় ডেকে আনে, তখন আমরা মনে করি আমাদের কিছু থাকলো না, সব চ'লে গেল। ঐ অসহায় ও আর্ত্ত অবস্থায় মানুষ যখন গেলাম-গেলাম করতে-করতে আশ্রয়ের আশায় চারিদিকে হাতড়াতে থাকে, তখন সে দেখে তার সত্তার একমাত্র আশ্রয় ইষ্ট তাকে কখনও ছাড়েননি, সেই আশ্রয় তার অটুটই আছে। একদিক দিয়ে নিরাশ্রয় ক'রে আর-এক দিক দিয়ে যে আগলে ধরেন—এ দুটোই তাঁর মাঙ্গলিক লীলা! কিন্তু মানুষ একটা অবস্থায় চারিদিক আঁধার দেখে, সেই আঁধার ফেটে পরে ফুটে ওঠে আলো। এইটেকে মানুষ মনে করে এক চোখে তিনি ভয়াল, একচোখে তিনি দয়াল। তিনি কিন্তু দয়াল চিরকালই। প্রবৃত্তি-আচ্ছন্ন হ'য়ে সবটা আমরা একযোগে দেখতে পাই না ব'লে এইসব বৈপরীত্য আরোপ করি তাঁর উপর। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভাল বই মন্দ করেন না। আমরা আমাদের কর্ম্মফলে কষ্টও পাই, সুখও পাই। কিন্তু ভাল করি, মন্দ করি, তিনি আমাদের ভালই চান চিরকাল। তবে তাঁকে যত ভালবাসি ততই ভাল করার প্রবৃত্তি হয় এবং তিনি যে আমাদের কতখানি মঙ্গলকামী তা' অনুভব করতে পারি। তখন এমন কিছু করতে ইচ্ছা করে না যাতে দুর্ভোগের ভিতর গিয়ে পড়ি। কারণ, দুর্ভোগ ভোগার যে কষ্ট তার থেকে বেশী কষ্টদায়ক মনে হয় আমাদের কষ্ট পেতে দেখে তিনি কষ্ট পাবেন সেই কষ্ট। একটা মানুষ ভগবানকে ভালবাসে কিনা তার একটা মস্ত পরখ হ'চ্ছে সে অকাম করা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার কিনা। যে-কাজ কোন-না-কোনভাবে কখনও-না-কখনও তাঁর অস্বস্তির কারণ হ'তে পারে, তা' সে করতে ভয় পায়। শুধু তেমন কাজ করা নয়, তেমন বাক্য বা চিন্তারও সে প্রশ্রয় দেয় না।

ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মজ্ঞান মানে আমার মনে হয় progressive becoming (প্রগতি-মুখী বিবর্দ্ধন)-এর জ্ঞান। এই জ্ঞান থাকলে মানুষ যে-কোন situation (পরিস্থিতি)-এর ভিতর পড়ুক তাকেই সপরিবেশ নিজের onward and forward

move (সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাওয়া)-এর সহায়ক ক'রে নিতে পারে। কিছুই তার অবিরাম উর্দ্ধগতিকে প্রতিহত করতে পারে না। বাধাই ব্যাহত হ'য়ে যায় তার কাছে এসে। তাকে বাঁধতে এসে সব বাঁধন ফস্কে যায়। দুর্ব্বার ও অপ্রতিহত হ'য়ে ওঠে সে বাঁচা-বাড়ার কলাকৌশলে, বাঁচাবার ও বাড়াবার এৎফাকি বুদ্ধিতে। হনুমানই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন কায়দা ক'রেই তাকে বেকায়দায় ফেলান যায় না। তার ভিতর-দিয়ে কলে-কৌশলে সে কেমন ক'রে বেরিয়ে আসে। শুধু বেরিয়ে আসা নয়, রামচন্দ্রের সুবিধা আদায় ক'রে নিয়ে কাজ হাসিল ক'রে বেরিয়ে আসে। ঐ রকম প্রবল ইষ্টনিষ্ঠা থাকলে ঐ ঠেলায় কোন্ ফাঁকে যে ব্রহ্মজ্ঞানের দরজায় পৌছে যায় মানুষ, তা' ঠাওরই পাওয়া যায় না। ইষ্টই হলেন তার কাছে একমাত্র consideration (বিবেচনা)। ঐ এক দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে সে জগতের যা'-কিছুকে চেনে, জানে, বোঝে, বিচার করে। তাতে বোধও হয় টনটনে। একটা grand generalisation of experiences (সমস্ত-অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ) হয় তার। সে যা' বোঝে তার মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না। যত বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী লোকই আসুক কথা বা যুক্তির মারপ্যাঁচে তাকে উল্টোও বুঝাতে পারে না। একটা মোক্ষম বুঝের উপর দাঁড়িয়ে সে অটল হ'য়ে থাকে। আর একটা হয়—ব্রহ্মজ্ঞানী যে সে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়-ক্ষেত্রেই সমভাবে দক্ষ ও উন্নতিশীল হয়। সে একথা বলে না—আমি জাগতিক ব্যাপার বুঝি না, তাত্ত্বিকতার ব্যাপার বুঝি। দুই দিকেই তার সমান অধিকার। আবার দু'টোর কোনটাই তাকে বেঁধে রাখতে পারে না, দুটোতেই সে নির্লিপ্ত। প্রয়োজন হ'লে কোটি টাকার আগম ক'রে ফেলে আবার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দরকার হ'লে ধুলোমুঠের মতো তা' উড়িয়ে দেয়। ধ্যান,-ধারণায়ও তার যত আনন্দ, কোদাল কোপানতেও তার তত আনন্দ। ইষ্টের ইচ্ছাপূরণের জন্য যখন যা' প্রয়োজন, তাতেই সে রাজী। কোন দিকে খাঁকতি থাকলে হবে না। শাস্ত্রে আছে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হ'য়ে ওঠেন। আজকাল একপেশে উন্নতির দিকে ঝোঁক বেশী। কেউ টাকা-পয়সা ও বিষয়ের দিকে ঝুঁকলো তো ভিতরের দিকে নজর দেয় না। আবার, কেউ ভিতরের দিকে ঝুঁকলো তো বাইরের দিকে নজর দেয় না। এই একপেশে ঝোঁক হ'লে একটা অভিভূতির মতো হয়। কোন কিছুর উপর অধিকার লাভ হয় না। কিন্তু ইষ্টার্থে ভিতর-বাহির দুইদিকেই যখন মানুষ সড়গড় হয়, motor nerve (কর্ম্মপ্রবাহী স্নায়ু) ও sensory nerve (চিন্তাপ্রবোধী স্নায়ু) এই দুটোরই অনুশীলন যখন সমান তালে করে, তখন সে পায় প্রকৃত স্বাস্ত, তৃপ্তি ও আনন্দের স্বাদ। আনন্দ মানে বৃদ্ধি। এই রকমটাই normal (স্বাভাবিক)। কারও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বাইরের দিকে ঝোঁক বেশী থাকতে পারে, কারও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ভিতরের দিকে ঝোঁক বেশী থাকতে পারে। বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলতে গিয়ে balance (সমতা) ঠিক রাখার জন্য ভিতর-ঝোঁকা যে তার কিছুটা বাইরের কাজ করা উচিত এবং বাহির-ঝোঁকা যে তার কিছুটা অন্তর্ম্মুখী হওয়া উচিত। এই corrective training

(সংশোধনী শিক্ষা)-টুকু না হ'লে বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণই ঠিকমতো হয় না। ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় সৎ-কে যে জানতে চায় তাকে জগৎ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনীয় সৎ-কে জানতে হবে, আর জগৎ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনীয় সৎ-কে যে জানতে চায় তাকে তা' জানতে হবে in relation to ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় সৎ বা ব্রহ্মের আলোকে। নইলে জানাটা complete (পূর্ণ) হবে না। আর, এটা মনে রাখতে হবে যে, The representative man of the age is the condensation and consummation of all evolution (যুগমানব হলেন বিবর্ত্তনের ঘনীভূত ও সম্পূর্ণতম রূপ)।

স্বর্গ ও নরক-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বর্গ মানে উত্তমে যাওয়া, উত্তমে থাকা, নরক মানে ক্ষয়ে থাকা। যারা সৎ চলনে চলে তারা দরিদ্র হ'য়েও অন্তরে স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারে। আসুরিক বুদ্ধি যাদের, তারা ভোগসুখের মধ্যে থেকেও অন্তরে নরকবাসের যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে।

২৩শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ৮।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোল তাঁবুতে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), হরেনদা (বসু) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Publicity (প্রচার) খুব দরকার। Paper publicity (খবরের কাগজে প্রচার) না হ'লে idea (ভাবধারা)-ও পরিবেশন হয় না, লোকেও interested (অন্তরাসী) হয় না। প্রথমে লোকে হয়তো মাথায় নেয় না, কান দেয় না, কিন্তু ক্রমাগত পরিবেশণ হ'তে থাকলে লোকের indifference (ঔদাসীন্য) ও resistance (প্রতিরোধ) ক'মে যায়, তখন কথাগুলির যুক্তিযুক্ততা বুঝতে চেষ্টা করে। জীবনকে ভালবাসে সকলেই, প্রত্যেকের তার মতো ক'রে একটা অভিজ্ঞতা আছে। জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক যে-কথা, সে-কথা ঠিকভাবে পরিবেষণ করতে থাকলে মানুষ তা' না নিয়ে পারে না। একটা মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে কোন ভাল কথা বলতে থাকলে, তার কথা মেনে নিতে অনেক সময় মানুষের অহং-এ বাধে। কিন্তু লেখার মাধ্যমে সেই কথা পেলে, তখন পাঠকের অহমিকায় যেন অতোখানি চোট লাগে না। মনে ধরলে সহজে সায় দিতে পারে। তাই কাগজের মাধ্যমে যাজনের কিছুটা সুবিধা আছে। অবশ্য সেই সঙ্গে চাই ব্যক্তিগত যাজন। মানুষের অহংকে উদ্বেজিত ও উত্তেজিত না ক'রে যাজিতের আপনজন হ'য়ে, তার অন্তরে প্রীতির আসন অধিকার ক'রে নিয়ে যাজন করতে হয়। কর্ম্মী ও সৎসঙ্গীদের যাজনমুখর ক'রে তোলার জন্য চিঠিপত্রও খুব লিখতে হয়। যারা চিঠি লিখবে তাদেরও খুব যাজনমুখর হওয়া লাগে —যজন ও ইষ্টভৃতিকে ঐ তালে অটুট রেখে। আচরণ-পরায়ণ মানুষের কথার দামই হয় আলাদা। তাদের কথার ভিতর পরমপিতার শক্তি কাজ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বাইরে এসে রোদপিঠ ক'রে বসলেন।

এর কিছু সময় পর হাউজারম্যানদা, তাঁর মা এবং নিউজিল্যাণ্ডের মিসেস এ্যালক্লেক আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের দেখে বাইরে থেকে গোলতাঁবুতে আসলেন এবং তাঁরা না বসা পর্য্যন্ত নিজে বসলেন না।

হাউজারম্যানদা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—ফ্রান্সে কোন-কোন জায়গায় অলৌকিকভাবে রোগ সারান হ'য়ে থাকে, বৈদ্যনাথের মন্দিরেও নাকি অনেক সময় এমন ঘটে। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মানুষের অন্তরের প্রত্যাদেশই তাদের সুস্থ ক'রে তোলে। এমন-এমন স্থান আছে, এমন-এমন প্রক্রিয়া আছে যা' ঐ অন্তরের প্রত্যাদেশকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বৈদ্যনাথ আমাদের inner curative force (অন্তর্নিহিত আরোগ্যশক্তি)-এরই প্রতীক।

মিসেস এ্যালক্লেক—আমি একটা বইতে পড়েছিলাম যে, মেয়েছেলেদের আধ্যাত্মিক আলোক পেতে হবে স্বামীর মাধ্যমে। এ-সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভগবান যীশুর ঐ উক্তি ভাল লাগে যেখানে তিনি বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এত গভীরভাবে প্রীতিসম্বন্ধ হবে যে তারা উভয়ে মিলে যেন এক।

মিসেস এ্যালক্লেক—মেয়েদের সর্ব্বোত্তম শিক্ষাপদ্ধতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের শিক্ষা হবে ভক্তি ও সেবামূলক। তারা হাতে-কলমে সেই সব কাজ শিখবে ও করবে যাতে পরিবার, পরিজন ও পরিবেশকে nurture (পোষণ) দিতে পারে। সেই সব কাজকে basis (ভিত্তি) ক'রে তার পরিপোষণী শিক্ষা যত দিক দিয়ে যত বেশী দেওয়া যায়, ততই ভাল। যে যত enlightened (আলোকপ্রাপ্ত) হয়, তার চলা, বলা ও কাজগুলিও তত enlightened ও enlightening (আলোক-দীপ্ত ও আলোকদীপী) হয়। যার যা' করণীয় তাকে তাই-ই করতে হবে কিন্তু সেই করণীয় সম্বন্ধে যদি তার একটা thorough intelligent understanding (পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিদীপ্ত বুঝ) থাকে, তাহ'লে করণীয়টা তার কাছে meaningful (অর্থপূর্ণ) হ'য়ে ওঠে এবং তা' করতেও পারে আরো ভাল ক'রে। মানুষের চলন জ্ঞানদীপ্ত হ'লে পরিবেশের মধ্যে তা'র একটা শুভসঞ্চারণা হয়। সে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে অজানার অন্ধকার ঘোচায়। মেয়েদের Devotion (ভক্তি) খুবই চাই। তারা যদি Ideal ও husband-এ (আদর্শ ও স্বামীর প্রতি) devoted (ভক্তিমতী) না হয়, তাহ'লে তারা disintegrated (বিশ্লিষ্ট) হ'য়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে তাই তাদের পিতা-মাতার অনুগত থাকা দরকার।

হাউজারম্যানদার মা—মেয়েদের শিক্ষা কী ধরণের হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞাতব্য বিষয় যা' তা' ছেলেরাও যেমন শিখবে, মেয়েরাও তেমনি শিখবে। তবে রকম আলাদা হবে। পুরুষদের শিক্ষা হবে fulfilling nature এর

(পরিপূরণী প্রকৃতির) আর মেয়েদের হবে servicing nature-এর (সেবাপরিবেষণী প্রকৃতির)। ওটা যাবে fatherhood (পিতৃত্ব)-এর দিকে, এটা যাবে motherhood (মাতৃত্ব)-এর দিকে।

মিসেস এ্যালব্রেক—যে-সব মেয়েরা বিবাহ করে না, তাদের কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের মধ্যেও motherhood (মাতৃত্ব) আছে। তারা নিজেদের মনে করবে people (লোকের)-এর মা ব'লে, এবং মা সন্তানের জন্য যেমন করে, তারাও মানুষের জন্য তেমনি করবে—স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব ও দূরত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে। আমার মনে হয় before adolescence (কৈশোরের আগে) ছেলেরা যদি মেয়েদের কাছে educated (শিক্ষিত) হয়, তাহ'লে ভাল হয়। তাতে তাদের inner being (অন্তর্নিহিত সত্তা)-টা educated (শিক্ষিত) হয়। আমার মনে হয়, শিশুদের মেয়েরাই প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী—ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই। আর, পরবর্ত্তী অবস্থায় ছেলেদের বেলায় মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া সেই শিক্ষারই ক্রমাধিগমন হওয়া উচিত পুরুষের কাছে।

হাউজারম্যানদার মা—প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত কি ছেলেদের ও মেয়েদের একই বিষয় পড়ান উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাদা হওয়া উচিত। মেয়েদের cooking (রান্না), washing (ধোয়া কাচা), domestic work (গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম), first aid (প্রাথমিক চিকিৎসা), nursing (রোগী-শুশ্রূষা), food-science (খাদ্য-বিজ্ঞান) ইত্যাদি prominent (প্রধান) হওয়া চাই। Husband selection (স্বামী-নির্ব্বাচন)-সম্বন্ধে মেয়েরা যাতে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ করে, in a healthy and psychological way (শোভন এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায়) তার ব্যবস্থা করা লাগে। এই সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান না থাকলে ঠ'কে যাবে। যাকে পছন্দ করার তাকে হয়তো পছন্দ করবে না, যাকে পছন্দ করার নয় তাকে হয়তো পছন্দ করবে।

হাউজারম্যানদার মা—কোন সৎসঙ্গী মেয়ে যদি সৎসঙ্গী নয় এমনতর ছেলেকে বিয়ে করে, তাহ'লে কি অসুবিধা হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নীতি-নিয়ম-অনুযায়ী যদি বিবাহ হয় এবং মেয়েদের habits, behaviour (অভ্যাস, ব্যবহার) যদি educated (শিক্ষাপ্রাপ্ত) হয়, তবে সে সব অসুবিধা adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে স্বামীকে আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে।

মিসেস এ্যালব্রেক—কোন মেয়ে যদি দু'জনকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে চায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' অনুমোদন করা যায় না। তাতে খারাপ হয়। Eugenic (সুপ্রজননের) দিক থেকেই খারাপ হয়। একই সময়ে দু'জন পুরুষকে ভালবাসলে মেয়েদের মন bifurcated (দ্বিধা-বিভক্ত) হ'য়ে যায়। মায়ের মন ঐরকম হ'লে সন্তানের মধ্যেও তা' সংক্রামিত হ'য়ে যায়।

হাউজারম্যানদার মা—পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারে, মেয়েরা পারবে না কেন? তার পিছনে যুক্তি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-যুক্তি নিহিত আছে তাদের জৈবী-গঠনে, তাদের মূল প্রকৃতিতে।

হাউজারম্যানদার মা—কিসের উপর আপনার এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত? ফ্রান্সে দুইরকমের নীতি আছে—একরকমের নীতি পুরুষের জন্য, একরকমের নীতি মেয়েদের জন্য। আমেরিকায় নৈতিকতা-সম্বন্ধে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এমন কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য আমেরিকাতেও পুরুষের নৈতিক স্খলনের চাইতে মেয়েদের নৈতিক স্খলন বেশী ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এই বুঝি—পুরুষ পুরুষ, নারী নারী। তাদের inner being (অন্তর্নিহিত সত্তা)-এর মধ্যেই বিহিত পার্থক্য আছে।

হাউজারম্যানদার মা—এ-বিষয়ে আমি একমত নই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারে, কিন্তু মা'র কাছ থেকে যা' পাই বাবার কাছ থেকে তা' পাই না। It appears monstrous to me to think otherwise (অন্য রকম ভাবা আমার কাছে বিকট মনে হয়)।

হাউজারম্যানদার মা—পুরুষের বহুবিবাহ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের চাইতে ভারতীয়দের মনেই প্রশ্ন ও সংশয় বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে পারে। তারা হয়তো ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝতে চায়, জানতে চায়। ঠিকমতো না হ'লে বহুবিবাহ কেন, এক বিবাহও দোষের কারণ হ'তে পারে। বহুবিবাহ আরো বেশী দোষের কারণ হ'তে পারে। সেই সব ব্যত্যয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তাদের মনে তো সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। তবে বহু-বিবাহ হ'তে গেলে তা' বিধিমতই হওয়া উচিত। বহুবিবাহ তো দূরের কথা, অনেক পুরুষ আছে, যারা একটা বিয়েরও যোগ্য নয়।

মিসেস এ্যালব্রেক—পুরুষের বহুবিবাহ হ'তে পারে, নারীর তা' হ'তে পারে না—এর ভিত্তি কি শাস্ত্র না ঈশ্বর-প্রকটিত সত্য (revelation)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে নারীর বহুবিবাহে দেখা গেছে যে ফল ভাল হয় না। আমাদের শাস্ত্রে এর সমর্থন নেই, আমিও ভেবে দেখেছি—নারীর বহুবিবাহ সঙ্গত নয়। শ্রীকৃষ্ণের সময় এ-জিনিস কিছু-কিছু ছিল। তিব্বতে ছিল। এর ফল ভাল হয় না।

হাউজারম্যানদার মা—নিউ টেষ্টামেণ্টে এক-বিবাহকেই উৎসাহিত করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তাই করি, তবে বিহিত ক্ষেত্রে পুরুষের বহুবিবাহ সমর্থন করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—With our love for Christ, we worship God (যীশুখ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা দিয়ে আমরা ভগবানকে পূজা করি)। সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) মানব-সমাজের অন্যতম গুরু। তাঁর মধ্যে মানব-সমাজের পূর্ব্বতন গুরুগণ জীবন্ত। আজ যদি আমরা Christ

(যীশুখ্রীষ্ট)-কে ভালবাসতে চাই, তাহ'লে দেখতে হবে—কে তাঁকে সবচাইতে বেশী ভালবাসেন, কে তাঁর প্রতি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুরক্ত, কার জীবন সেই অনুরাগে রঞ্জিত, কার চরিত্রে তাঁর গুণগুলি ফুটে উঠেছে, তেমন লোক পেলে তাঁর ভিতর-দিয়ে আমরা Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-কে পাই, Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-কে ভালবাসতে শিখি। আমরা সেই গুরুকে মানি যিনি সকল সত্যিকার গুরুকেই মানেন—দেশকাল ও সম্প্রদায়ের বিভেদ না ক'রে। তাঁকে মানলে সকলকে মানা হয়। তাঁকে ধরলে সকলকে ধরা হয়।

All the Prophets of the past converge and are awakened in the living guru of the age. It is through our love for the lover of Christ that we can love Christ. (পূর্ব্বতন প্রেরিতগণ জীবন্ত যুগগুরুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও জাগ্রত থাকেন। খ্রীষ্ট-প্রেমীর প্রতি ভালবাসার ভিতর-দিয়েই আমরা যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসতে পারি)।

হাউজারম্যানদার মা—জিরাল্ড হার্ড বলেছেন যে, প্রভুর প্রার্থনা (Lord's prayer) ও যীশুর আশীর্ব্বাদ (beatitude)—এই দুটির মধ্যেই আছে ধর্ম্মের মূল কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দুটো ব্রাকেটের মধ্যে সব আছে। একটা হ'লো ত্যাগের দিক আর একটা হ'লো সত্তারক্ষণী চাহিদার দিক। এই দুই প্রান্তের মধ্যে সত্তার ধৃতি ঠিক থাকে। আত্মরক্ষার দিকেও নজর চাই, পরিবেশের রক্ষার জন্য ত্যাগতিতিক্ষা, সহ্য, ধৈর্য্য, সহানুভূতি ইত্যাদিও চাই। আরো চাই প্রবৃত্তির adjustment ও সদ্‌গুণের বিকাশ।

বিবাহ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Female complex (নারী-মুখীনতা) থাকলে পুরুষদের মেয়েদের পিছনে ছোটার বুদ্ধি হয়। এটা normal (স্বাভাবিক) নয়। এই রকমটা থাকলে পুরুষ বিবাহ করবার উপযুক্ততা লাভ করে না। মেয়েমুখী পুরুষকে মেয়েরা কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। স্বামীর চরিত্র যদি শ্রদ্ধা করার মতো না হয়, তাহ'লে মেয়েরা সুখী হ'তে পারে না। ভাবে—আমি একটা হীন পুরুষের হাতে পড়েছি। মেয়েরা স্বামীর ভালবাসা চায় কিন্তু যখন দেখে স্বামী বিস্তারশীল জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে স্ত্রীসর্ব্বস্ব হ'তে চাচ্ছে, তখন তারা বোধ করে যে তাদের নিজেদের জীবনও যেন শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Marriage (বিবাহ)-সম্বন্ধে সব point (বিষয়) annotate (ব্যাখ্যা) ক'রে pamphlet (পুস্তিকা) লিখতে হয়। এমনভাবে লিখতে হয় যাতে not a chain will break, nor a link will stir (কোন শৃঙ্খলই ছিন্ন না হয়, কোন বন্ধনই বিচলিত না হয়)। অর্থাৎ, তার ভিতর-দিয়ে বিবাহের নীতি-বিধি-সম্বন্ধে প্রত্যেকেই যেন এমনভাবে ওয়াকিবহাল হ'তে পারে, যার ফলে কোন একটা বিবাহেও যেন কোন গোলমাল না থাকে এবং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার কথা কিছুতেই যেন কোন স্বামী-স্ত্রীর মনে না জাগে। প্রত্যেকটি Marriage

(বিবাহ) যদি rightly adjusted (ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত) হয়, তাহ'লে সমাজের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

এই আলোচনা চলবার সময় প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে বুঝিয়ে দেন।

মায়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নতি জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁরা যাবার বেলায় অনুবাদককেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ওরা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখেছিস ওরা কত inquisitive (অনুসন্ধিৎসু) ও courteous (ভদ্র) ? যার যতটুকু প্রাপ্য তা' দিতে ওরা কুণ্ঠিত হয় না।

এরপর ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টভৃতির মত মালই নেই। ইষ্টভৃতির ভিতর-দিয়েই দীক্ষা চেতন থাকে। রোজ বাস্তবে যাঁর জন্য কিছু করা যায় তাঁর সঙ্গে একটা বাস্তব সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠেই। ইষ্টের সঙ্গে একটা বাস্তব সম্পর্ক যদি আজীবন বজায় রাখা যায়, তাতেই দীক্ষা সজাগ থাকে। ঐ সম্পর্ককে অবলম্বন ক'রে ধীরে-ধীরে জীবনে পরিবর্ত্তন আসতে থাকে—অবশ্য যদি নিত্য করণীয়গুলি sincerely (আন্তরিকতা-সহকারে) ক'রে চলা যায়। ইষ্টের জন্য বাস্তব দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারটা প্রায় উঠেই গিয়েছিল। ওটা না থাকলে ধর্ম্ম কিন্তু একটা ভাবালুতায় পর্য্যবসিত হয়। জীবনে ব'সে যায় না।

প্রফুল্ল—অনেকে তো ইষ্টভৃতি অভ্যাস-বশে যান্ত্রিকভাবে করে। তাতে কি খুব ভাল হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেভাবে পারে, continuity (ক্রমাগতি) বজায় রেখে যদি ক'রে যায়, তাতে ভাল হয়। এমন-এমন ঘটনা শুনেছি যে ইষ্টভৃতি না ক'রে হঠাৎ ভুল ক'রে কিছু খেয়ে ফেলার পর এক-এক জনের নাকি বমি হ'য়ে সেই খাদ্য বেরিয়ে যায়। তার মানে system (বিধান)-এর ভিতর অভ্যাসটা অতোখানি ঢুকে গেছে। প্রথমে মানুষ সজাগভাবে অভ্যাস গঠন করে। পরে যখন সেটা রপ্ত হ'য়ে যায় তখন সে-সম্বন্ধে অতোখানি সচেতন ভাব থাকে না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাতে কোন ফল হচ্ছে না। ওটা ধীরে-ধীরে সত্তার সঙ্গে সহজভাবে মিশে যায়। ইষ্টার্থী অভ্যাস এইভাবে যত কায়েম হয়, ততই ভাল। তবে কোন প্রত্যাশা নিয়ে ইষ্টভৃতি করতে হয় না। ইষ্ট আমার পরম প্রিয়, তাঁর খুশিটাই আমার লাভ—সে বোধে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করতে হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজেদের জমি ক'রে নূতন আশ্রম করতে গেলে এমনভাবে করতে হয় যে আশ্রমে ঢোকার একটিমাত্র gate (দরজা) থাকবে এবং সেই gate (প্রবেশ দ্বার)-এর দু'পাশে উপযুক্ত দুজন লোকের বাড়ী থাকবে, বাড়ীর সামনের দিকে থাকবে একটি ক'রে হলঘর ও লাইব্রেরী, নবাগত কেউ ঢুকতে গেলেই সেই দুজনের

একজন প্রথমে তাকে ডেকে বসিয়ে আলাপ-সালাপ করবে। প্রত্যেকটি নূতন মানুষের সঙ্গে যদি ভাল ক'রে আলাপ-সালাপ করা হয়—বিহিত আদর-আপ্যায়নসহ, তাতে কাজ খুব ভাল হয়। এখানে কত মানুষ আসে, কিন্তু তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার লোক নেই। আমার এইটে দেখতে ভাল লাগে যে, যে-ই তোমাদের কাছে আসছে সে-ই তৃপ্ত ও তুষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। হোমরাচোমরাদের সমাদর করবে, সাধারণ মানুষকে পুছবে না, এটা ভাল নয়। দুঃখী মানুষকে বরং বেশী ক'রে আদর-যত্ন ক'রে সুখী ক'রে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

সুপ্রজনন-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ শুধু জন্মিলেই হয় না, ভাল মানুষ যাতে জন্মায় তার culture (অনুশীলন) করা লাগে। জমি-অনুযায়ী যেমন বীজ দিতে হয়, তেমনি নারী-পুরুষের প্রকৃতির সামঞ্জস্য দেখে বিয়ে দিতে হয়। পুরুষ-নারী সবারই চাই উৎকর্ষলাভের দিকে ঝোঁক, বিয়ে যদি সামঞ্জস্য হয় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই যদি থাকে উৎকর্ষ-অভিধায়িনী তপস্যা, তাহ'লে সন্তান শুভসম্বেগ নিয়ে জন্মে। আমার মনে হয়, environment (পরিবেশ) থেকেও জন্মের জোর বেশী। মানুষ environment (পরিবেশ) থেকে pick up (গ্রহণ) করলেও, pick up (গ্রহণ) করে instinct (সহজাত সংস্কার)-অনুযায়ী।

শরৎদা—ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বিয়ে হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এদের অধিকাংশই মূলতঃ একই species (জাতি), তাই with proper caution and selection (উপযুক্ত সাবধানতা ও নির্ব্বাচন সহ) বিয়ে হ'তে বাধা নেই। ইউরোপীয়ানরা ভারতীয় বিশেষ ক'রে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-কন্যা বিয়ে করলে সাধারণতঃ issue (সন্তান) তত ভাল হয় না, কিন্তু ভারতীয়রা ইউরোপীয়ান মেয়ে বিয়ে করলে ফল তত খারাপ হয় না। যেখানেই বিয়ে হো'ক বিয়ের মূল নীতিগুলি fulfilled (পরিপূরিত) হয়, এমনভাবেই বিয়ে হওয়া দরকার। যাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রতিপালিত হয়, তাদের biological stratum (জীববিজ্ঞান-সম্মত স্তর) ঠিক থাকে ও stable (স্থায়ী) হয়। তাদের মেয়ে বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত সমাজে দিতে গেলে প্রতিলোমের আশঙ্কা থাকে।

হাউজারম্যানদার মা এবং মিসেস এ্যালব্রেক আবার আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই মা'র (মিসেস এ্যালব্রেকের) কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

হাউজারম্যানদার মা বললেন—বড়দার বাড়ী আমাদের নিজের বাড়ীর মতো। সেখানে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ভালবাসাই সব কষ্টের বোধকে দূর ক'রে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে হাউজারম্যানদার মা ও মিসেস এ্যালব্রেক সানন্দে হাসতে লাগলেন।

মিসেস এ্যালব্রেক নূতন ক'রে প্রশ্ন করলেন—পুরুষ ও নারীর মৌলিক পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়ে মা হয়, পুরুষ বাবা হয়—এই fundamental difference (মৌলিক পার্থক্য)।

হাউজারম্যানদার মা—এতে সব কথা পরিষ্কার হ'লো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে গল্পচ্ছলে বললেন—ছোটবেলায় আমি আরো foolish (নির্ব্বোধ) ছিলাম। সোনার মতো বয়সে আমার মনে হ'তো মেয়েরা বোধহয় আমাদের কিছু বোঝে না। ভাবতে-ভাবতে insane (পাগলের মতো) অবস্থা, helpless condition (অসহায় অবস্থা)। মা'র সঙ্গে কথা বলার সময়ও মনে হ'তো মা আমার কথা বুঝতে পারছে কিনা কি জানি। এমন সময় একদিন শুনলাম এক বাড়ীতে এক মায়ের একটি ছেলে হয়েছে। তাই শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বুঝলাম ছেলে ও মেয়ে দু-ই মেয়েদের পেটে হয়। তাহ'লে তারা নিশ্চয়ই সবাইকে বোঝে। তখন মেয়েদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা হ'লো। একটা awe (ভক্তি-সমন্বিত ভয়) মেয়েদের প্রতি এখনও আমার আছে। মনে হয়—she is the way to heaven (সে স্বর্গের পথ)।

ঐ সময় ঐ বয়সে আর-একটা প্রশ্ন জাগতো। একই মাটিতে অতোরকমের গাছ হয় কী ক'রে। বাগানে ঢুকে কত গাছ তুলে দেখেছি কিছুই হদিশ পাই না। পরে গাছের বীজের দিকে নজর পড়লো। বুঝলাম, মাটির উর্ব্বরা শক্তির গুণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু অঙ্কুরণের পর বীজ সেই মূর্ত্তি নেয়, যে-মূর্ত্তি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিহিত আছে বীজের মধ্যে। তখন এ-সম্বন্ধে মনে আর কোন সমস্যা থাকলো না। এই দুটো perplexing thought (হতবুদ্ধিকর চিন্তা) আমাকে অনেকদিন ধ'রে কষ্ট দিয়েছে ছোটবেলায়।

হাউজারম্যানদার মা—আপনি যদি ভালবাসার উপর গুরুত্ব দেন, তাহ'লে আপনার শিষ্যবৃন্দ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে যুদ্ধ সমর্থন করে কীভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুদ্ধ ভাল নয়।

হাউজারম্যানদার মা—আপনি কি মনে করেন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি তা' অবশ্যম্ভাবীও হয়, তাও চেষ্টা করা উচিত যাতে যুদ্ধকে বাদ দিয়ে সমস্যার সমাধান হয়, যুদ্ধ বাধার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অন্যের ক্ষতি করাও ভাল নয়, অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও ভাল নয়।

হাউজারম্যানদার মা—আমার মনে হয়, ঈশ্বর এবং প্রেম যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন

খারাপ কোন কিছুই অবশ্যম্ভাবী নয়। ঈশ্বর এবং ভালবাসাকে আশ্রয় ক'রে আমরা সব খারাপ জিনিসকেই এড়াতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র মুখে এই কথা শুনে সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—হ্যাঁ! হ্যাঁ! অতি ঠিক কথা। এই কথাই মাথায় রেখে চলতে হবে আমাদের। শুধু ভাবলে হবে না। সমস্ত responsibility (দায়িত্ব) নিয়ে তাই করতে হবে যাতে কেউই দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিমর্দ্দিত হ'তে না পারে। মা বড় সুন্দর কথা বলেছেন। মা'র মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব আনন্দদীপ্ত প্রেমোচ্ছল ভাব দেখে ঐ দুটি মা এবং উপস্থিত সকলেরই চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

হাউজারম্যানদার মা প্রশ্ন করলেন—একটা কথা ভাবি, অপরে যদি স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হয়, সেখানে আমাদের করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তার পিছনে লেগে থাকব, তাকে বোঝাব selfish ও cruel (স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর) হ'লে তারই স্বার্থ ব্যাহত হবে। বলব—Selfish (স্বার্থপর) হতে চাইলে selfless (নিঃস্বার্থ) হও, তাতেই তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। মানুষের স্বার্থকেন্দ্র হ'লে, মানুষই তোমার স্বার্থ দেখবে।……একজন জেলে ছিল, সে চুরি করত, আমাদের বাড়ীতেও চুরি করেছিল। আমি তাকে চিনতাম। একদিন অনেক লোকের মধ্যে আছি, সেখানে ঐ লোকটাও ছিল। আমি আলোচনাচ্ছলে বললাম—আমরা বড় স্বার্থান্ধ, পারিপার্শ্বিককে ভালবাসি না, তাদের খোঁজখবর রাখি না। তাদের দিয়েই সব অথচ তাদের দেখি না। সহানুভূতি নেই, সেবা নেই, কেউ কোন অন্যায় করলেই শাস্তি দেবার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগি। অথচ ভেবে দেখি না কেন সে অন্যায় করে। ধর, একজন চুরি করে, কি অবস্থায় প'ড়ে কেন সে চুরি করে তা' কি আমরা তার অবস্থায় নিজেকে ফেলে বুঝতে চেষ্টা করি? তার যাতে চুরি করা না লাগে, তার ব্যবস্থা কি আমরা করি? হয়তো সে কোন পথ না পেয়ে, বালবাচ্চার জন্যে একমুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে না পেরে চুরি করতে বাধ্য হয়। তাকে শাস্তি না দিয়ে, ঘৃণা না ক'রে তার এই দুরবস্থার প্রতিকার যাতে হয়, দায়িত্বসহকারে তা' করলে হয়তো দেখা যাবে, সে আর ও-পথে পা বাড়াবে না। আমার মনে হয়, আমাদের বেদরদী ও উদাসীন রকমের দরুনই মানুষ ভাল হ'তে পারে না। আমরাই খারাপটাকে বাড়িয়ে তুলি—এই ধরণের অনেক কথা বললাম। চোরের ঐ কথা শুনে খুব ভাল লেগেছে। তখন লোকের সামনে নিজেকে ধরা দিল না। রাত্রে আমি নিরালায় ব'সে আছি। এমন সময় এসে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে বললো—বাবু! আমি চোর। চুরি না ক'রে উপায় নেই ব'লে চুরি করি। ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করি। অভ্যাসও খারাপ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আপনি যেমন আপন লোকের মতো কথাগুলি বললেন, অমন ক'রে তো কেউ বলে না। আপনার কথা কত মিষ্টি! তা' বাবু! আপনাকে আর কি বলব? আপনার বাড়ীতেও আমি চুরি করেছি। কতকগুলি জিনিস বিক্রী ক'রে

খেয়েছি। সামান্য যা' আছে আপনি রেখে দেন। আমি বললাম—ও-গুলি আমি তোকে দিচ্ছি। তুই রেখে দে। ওতে কোন দোষ হবে না। এইভাবে ওর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। আমি ওকে কোনদিন বলিনি 'চুরি ক'রো না'। ওর অসুবিধার কথা জানতে পারলেই মাঝে-মাঝে টাকা দিতাম। রাত্রিবেলায় ওর চুরির রোখ উঠতো। তখন আমার কাছে চ'লে আসতো। আমি ব'সে-ব'সে গল্প ক'রে অন্যমনস্ক ক'রে ওর চুরির ঝোঁক তখনকার মতো কাটিয়ে দিতাম। একদিন এসে বললো—আজ আমার চুরি করতেই হবে। ক্ষিতীশ মজুমদারের বাড়ীতে তিন হাজার টাকা এনে রেখেছে। ঐটে আমার নেওয়াই লাগবে। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না। বাধা দেবার পরিবর্ত্তে আমি উল্টো ঠেলা ধরলাম—আমিও তোর সঙ্গে যাব। ও রাজী হয় না। আমিও নাছোড়বান্দা। শেষটা রাজী হ'লো। রাত্রে চুরি করতে যাবার আগে আমাকে একখানা কাল কাপড় পরিয়ে নিল। ওর সঙ্গে যাচ্ছি। যেতে-যেতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ঘরে তালা দিয়ে আসছিস তো? সে বলে—বাবু! এই সময় কি তালা দিয়ে আসা যায় নাকি? কখন কোন্ দিক থেকে তাড়া খেয়ে ঘরে যেয়ে ঢুকতে হবে তার কি ঠিক আছে? আমি বললাম—সে তো ভাল কথা। কিন্তু তুই চুরি করতে আসছিস, এই ফাঁকে অমুক যদি তোর ঘরে ঢুকে কাম সারে, তার উপায় কী হবে? সে ঐ লোকটাকে এই ব'লে সন্দেহ করতো যে ওর স্ত্রীর উপর তার কুনজর আছে। আমার কথা শুনে সে ব'সে পড়লো। বললো—আজ আর হয় না। আমি insist (জোর) করতে লাগলাম। সে কিন্তু মনমরা হ'য়ে ঐ অবস্থায় বাড়ী চ'লে গেল। বাড়ীতে গিয়ে তালা দিয়ে আসলো। রাত ৩।৪টে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বললো। কিন্তু আর চুরি করতে গেল না। কেমন ক'রে জানি তার মাথায় ঢুকে গেল—অন্যের সর্ব্বনাশ করতে গেলে নিজেরই সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে। এইভাবে তার চুরি ঘুচে গেল। পরে সে অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক হ'য়ে উঠলো। আবার, চৌর্য্যস্বভাবসম্পন্ন কোন লোক দেখলেই সে বুঝতে পারত, আমাদের সাবধান ক'রে দিত। সে আশ্রমে থাকতে আশ্রমে আর চুরি হয়নি।.........Evil-কে (অসৎ যা' তাকে) ভালবাসা উচিত না, কিন্তু মানুষকে ভালবাসা উচিত। তাই আমি বলি—Hate evil but love man (অসৎ যা' তাকে ঘৃণা কর, কিন্তু মানুষকে ভালবাস)। Evil (খারাপ) করাটা একটা রোগ। এই রোগ যাতে সারে তাই করা লাগে।

হাউজারম্যানদার মা—অসৎ চিন্তার প্রশ্রয় দিলে তা' কি অসৎ আচরণ আমন্ত্রণ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Evil-কে (অসৎ যা' তা'কে) resist (নিরোধ) করা উচিত। তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। ওতে সবারই ক্ষতি।

হাউজারম্যানদা—আমরা যদি ভালবাসি, তাহ'লে কি আমরা সহিংস আচরণ করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ যা' তাকে আমরা হিংসা করব যাতে তা' পুষ্ট হ'য়ে সত্তার

ক্ষতি করতে না পারে। আমরা চাই যেন-তেন-প্রকারেণ মানুষকে সুস্থ রাখতে, মানুষের ভাল যাতে হয়, তাই করতে। মা যেমন সন্তানকে তার দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ভালবাসে, অথচ তাকে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ক'রে তুলবার জন্য প্রয়োজনমতো কঠোর হয়, আমাদেরও তেমনি হ'তে হবে। ভালবাসা ও ভাল চাওয়া বাদ দিয়ে শাসন করতে গেলে তা হিংস্রতায় পর্য্যবসিত হয়।

মিসেস এ্যালব্রেক—জগৎস্রষ্টা প্রেমস্বরূপ, সৎস্বরূপ। তিনি এমন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট জগতে অসৎ-প্রবণতা আসলো কোথা থেকে? এটা কি সহজাত না অর্জ্জিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God (ঈশ্বর)-এর opposite pole (বিপরীত প্রান্ত) হ'লো satan (শাতন) যা disintegrate (বিশ্লিষ্ট) করে। ভগবানের প্রতি বিমুখ হ'য়ে, তাঁকে অস্বীকার ক'রে তাঁর বিরুদ্ধ যা' তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে, তাকে প্রাধান্য দিয়ে চলার স্বাধীনতাটুকু মানুষের আছে। এই স্বাধীনতার উপর তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি যেমন ইচ্ছাময়, প্রত্যেকটি মানুষকে তেমনি ইচ্ছাময় ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। যে ইচ্ছাময় যেমন ইচ্ছা করে, সে ইচ্ছাময় তেমন হয়, তেমন পায়—বিধির অনুবর্ত্তনে। পরমপিতা বিশ্ববিধাতা আর আমরা হলাম আমাদের স্ব স্ব ভাগ্য-বিধাতা। স্রষ্টার বেটা সেও এক স্বতন্ত্র স্রষ্টা। যার প্রাণে যেমন চায়, সে তেমনি সৃষ্টির মালিক হয়।

মিসেস এ্যালব্রেক—শয়তান কি জগতে বেশী শক্তিমান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যার কাছে yield (নতি স্বীকার) করি, সেই-ই আমাদের কাছে powerful (শক্তিমান) হয়। Evil (অসৎ) যখন আমাদের disappoint (নিরাশ) করে এবং প্রবৃত্তির পথে চলতে-চলতে existence (অস্তিত্ব) যখন সাবাড় হ'তে বসে, তখন আমাদের hankering (আকাঙ্ক্ষা) উদগ্র হ'য়ে ওঠে to live and grow (বাঁচা-বাড়ার জন্য)। তখন আমরা আর্ত্ত হ'য়ে উঠি। তারপর আসে ভগবানের প্রতি আনুগত্য বা অনুরাগ। তখন থেকে চাকা ঘুরে যায়। অবশ্য আগের কর্ম্মফল ছাড়ে না। তবু মানুষ যত ভগবানের পথে চলে, ততই তার জীবন হ'তে থাকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ। একটা ভরসার কথা এই যে, আমরা যতই lost sheep (হারান-মেষ) হই না কেন এবং mercy (ভগবানের দয়া)-কে যতই আমরা ignore (উপেক্ষা) করি না কেন, mercy (ভগবানের দয়া) আমাদের pursue (অনুসরণ) করেই যতক্ষণ সম্ভব। যখন আর পারে না, তখন আসে annihilation (বিনাশ)। তারপরও mercy (ভগবানের দয়া) যা' করতে পারে, তা' করতে ছাড়ে না। কিন্তু পরমপিতার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরমপিতা আমাদের সাহায্য করতে পারেন না, যদি আমরা তাঁকে সে সুযোগ না দিই। জ্ঞানী বাপ কি ছেলের কিছু করতে পারে যদি ছেলে বাপের কথা না শোনে? বাপ যদি জ্ঞানী হয়, বহুদর্শী হয়, অভিজ্ঞ হয়, বিচক্ষণ হয় আর ছেলে যদি তার বাধ্য হয়, তার উপদেশ-নির্দ্দেশ মতো চলে, তাহ'লে কিন্তু সে অনেক লাভবান হ'তে পারে।

মিসেস এ্যালব্রেক—শয়তানের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনকে অবহেলা ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলার যে প্রবৃত্তি তাই-ই শয়তান। ভগবান আমাদের ভিতর complex (প্রবৃত্তি)-গুলি দিয়েছেন জীবনের রক্ষা ও বর্দ্ধনকল্পে। সেই complex (প্রবৃত্তি)-গুলিই শয়তান হ'য়ে দাঁড়ায় তখনই, যখন তারা আমাদের মৃত্যুর দিকে নেয়। উৎসবিমুখ হওয়াই সমস্ত অপরাধের মূল। ভগবানের থেকে আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকি, বিযুক্ত হ'য়ে থাকি, তখনই শয়তান সুযোগ পায় আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার। ঐটেই হ'লো দুঃখ-দুর্দ্দশার root-cause (মূল কারণ)। যখন আমরা complex (প্রবৃত্তি)-এর দ্বারা obsessed (অভিভুত) হই, প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে দুর্ব্বার ভোগাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার লালসা যখন prominent (প্রধান) হ'য়ে ওঠে আমাদের জীবনে, তখনই আমাদের শয়তানে পায়।

মিসেস এ্যালব্রেক—শয়তান কি একটা বাস্তব শক্তি? শয়তান কি ভগবানের মতো বাস্তব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God (ভগবান) যদি real force (বাস্তব শক্তি) হন, তবে তাঁর opposite (উল্টো) হিসাবে satan (শয়তান) unreal force (অবাস্তব শক্তি)। শয়তানের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। আমরাই তাকে অস্তিত্ব দান করি। আমরা আমল না দিলে, সে মাথা চাঁড়া দিতে পারে না। ও-দিকে বেশী খেয়াল না দিয়ে পরমপিতার দিকেই বেশী ক'রে নজর দিতে হয়। তাঁকে নিয়েই মত্ত থাকতে হয়। তাহ'লে শয়তান ফুরসুৎ পায় কম। তবে নিজেদের এতখানি জ্ঞান থাকা দরকার, যাতে আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মনে-মনে বলতাম—আমি রাজরাজেশ্বরের সন্তান। আমার আবার পাপ-তাপ কোথায়? আমি চির শুদ্ধ, সদানন্দময়। একজন বৈষ্ণবসাধু আমার মুখে ঐ কথা শুনে বললেন—দেখো অনুকূল! এসব কথা শুনতে ভাল। কিন্তু ঐ-সব বলতে বলতে অহংকার আসে। তা' থেকে হয় পতন। বরং ব'লো—আমি দীন, হীন, পাপী—আমাকে কেশে ধ'রে উদ্ধার কর। আমার মতো পাপীকে তুমি উদ্ধার না করলে আমার আর পথ নেই।·········সাধুর কথামতো ১৫ দিন ঐ-রকম করার পর আমার যে বুকখানা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ডগমগ করতো, সেই বুকখানা ভেঙ্গে গেল। সর্ব্বদা মনটা দুর্ব্বল লাগতো। ভাবতাম, মানুষ আমাকে কি মনে করে কি জানি? মেয়েদের দিকে সহজভাবে তাকাতে পারতাম না। মনে হত—হয়তো অপরাধ হ'তে পারে তাতে। দিন-দিন শুকিয়ে যেতে থাকলাম। সে কি দুঃখ? সে কি যন্ত্রণা? আমার একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠলো। একদিন বেলা-যায় এমন সময় নদীর কিনারায় গিয়ে কেঁদে উঠলাম। বললাম—'না, আমি পাপী নই, আমি দুর্ব্বল নই, হে পরমপিতা! আমি তোমার সন্তান, তোমার শক্তিতে আমি শক্তিমান, তোমার পুণ্যের জ্যোতিতে আমি জ্যোতিষ্মান' ইত্যাদি। এই কথা বলতে-বলতে মন আবার তাজা হ'য়ে উঠলো।······

যাকে স্বীকার করা যায়, যা' আরোপ করা যায়, তাই-ই পেয়ে বসে। শয়তানকে স্বীকার করবার, তার ভাব আরোপ করবার কোন প্রয়োজনই করে না।

এরপর মায়েরা বিদায় নিলেন। এখন বেশ রাত হয়েছে। শীতের রাত। ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর মায়েদের সাবধানে নিয়ে যেতে বললেন।

মায়েরা যাবার বেলায় মন্তব্য করলেন—ঠাকুর! আপনার স্নেহপ্রবণতা বড় উপভোগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন—একটু emotionally (আবেগ ভরে) কথা বললেই বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগে। ভালভাবে এসব কথা কইতে পারি না। এইভাবে কি ভাল লাগে?

এরপর বড়দা আসলেন। রামকানালীর জমি-সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। সম্প্রতি ফিলান্থ্রপি অফিস পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে বড়দার উপর। কিভাবে কি করছেন সেই-সম্বন্ধে তিনি মোটামুটি বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা শুনে খুব প্রীত হলেন। হাসতে-হাসতে বললেন—এক ঠেলায় সব ঠিক হ'য়ে যাবিনি।

২৪শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ৯।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আছেন। সুধাংশুদা (মৈত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বিজয়দা (রায়), বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), হরিপদদা (সাহা), খগেনদা (তপাদার), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), অশ্বিনীদা (দাস) প্রভৃতি কাছে আছেন।

রামকানালী-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, industrial colony (শিল্প উপনিবেশ), agricultural colony (কৃষি-উপনিবেশ) আলাদা-আলাদা দিকে করতে হবে।

এরপর কাজলভাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন—বাবা! দুপুরে মা এবং দেবুদার সঙ্গে সাইকেল নিয়ে রুচিদাদের বাড়ীতে যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যাবে তো? তবে তুমি তো খুব ভাল ক'রে সাইকেল চালান শেখনি—অনেক পাগল ড্রাইভার আছে, তারা সাইকেলের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দেয়। সেইদিন দেওঘর টাওয়ারের কাছে একজনের উপর চাপিয়ে দিল, তখনই তার হ'য়ে গেল। অনেক টমটমের ঘোড়াও বিশ্রী। সাইকেল দেখলে ক্ষেপে গিয়ে পা উঠিয়ে দেয়। যাহো'ক তুমি যদি সাইকেলে যেতে চাও, তবে তোমার সাইকেলের দুপাশেই যেন লোক থাকে।

কাজলভাই—তাহ'লে আমি মা ও দেবুদার সঙ্গে হেঁটে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোমাকে সবই বললাম। যে-ভাবে গেলে তোমার সুবিধা হয়, সেইভাবে যাবে।

ননীদা—আমাদের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তো আমাদের, কিন্তু পরমপিতার কি এ-ক্ষেত্রে কিছু করবার নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুম যেইস্যা রামকো, রাম তেইস্যা তুমকো! মনে কর এখন বাইরে বেশ রোদ আছে, শীতকালে রোদের মধ্যে বসলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। তুমি যদি রোদের মধ্যে না গিয়ে ঘরের মধ্যে ব'সে থাক আর সে ঘরের মধ্যে যদি রৌদ্র ঢোকার ব্যবস্থা না থাকে, তাহ'লে রোদে বসার আরামটা পাবে কি ক'রে? কিন্তু রোদ তো তোমাকে উত্তাপ দেবার জন্য তৈরী হ'য়েই আছে। তুমি যদি রোদের কাছে না যাও, রোদ কি করতে পারে বল? পরমপিতাও তেমনি তাঁর দয়া নিয়ে সর্ব্বদার তরে প্রস্তুত যাতে আমরা ভাল হই, সুখী হই। আমরা দয়া করে তাঁর সেই দয়াটুকু গ্রহণ করলেই হয়।

এরপর হাউজারম্যানদা, তাঁর মা, মিসেস এ্যালব্রেক এবং শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমেরিকার গ্রাম্য জীবন এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

হাউজারম্যানদার মা সেই-সম্বন্ধে গল্প ক'রে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের আগে কুলপতি ছিলেন, গ্রামাধিপতি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন highly experienced in the application of divine principles in different spheres of life (জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাগবত নীতি প্রয়োগে বিশেষ অভিজ্ঞ), সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের ছিল agriculture, arts and crafts (কৃষি, শিল্প) ইত্যাদি সম্বন্ধে practical knowledge (বাস্তব জ্ঞান)। Homely training (ঘরোয়া শিক্ষা) হ'তো বাড়ীতে-বাড়ীতে গ্রামে-গ্রামে। কুলপতি ও সমাজপতিরা দেখতেন যাতে একটা লোকও অকর্ম্মা ও অযোগ্য হ'য়ে না থাকে। প্রত্যেকটি মানুষের পিছনে লেগে থেকে, ভালবেসে, উৎসাহ দিয়ে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেককে goad (চালনা) ক'রে—সকলেরই efficiency (দক্ষতা) বাড়াবার চেষ্টা করতেন তাঁরা। তখন domestic scale-এ (পারিবারিক পর্য্যায়ে) প্রচুর production (উৎপাদন) হ'তো। আমরা আজ বড় বড় কলকারখানার সাহায্য ছাড়া বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারি না। কিন্তু home-scale-এ (পারিবারিক পর্য্যায়ে) কিভাবে নানারকম industry (শিল্প) grow করতে (বাড়তে) পারে, তা' না জানলে সার্থকতা হয় না। এই দিকে নজর দিলে মানুষগুলি ভাল থাকে।

হাউজারম্যানদার মা—আপনার একজন শিষ্য আমেরিকায় যাবেন ব'লে আমাকে বলছিলেন। ভারতীয় যুবকদের আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়ে শিক্ষা-লাভ করা সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। পরস্পরকে জানায়, বোঝায়, দেখাশোনায় আত্মীয়তা বাড়ে। এদেশ থেকে thousands (সহস্র-সহস্র) যায়, ও-সব দেশ থেকে thousands (সহস্র-সহস্র) আসে আমাদের দেশে তাই আমার ইচ্ছা। বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে সত্তাপোষণী লওয়াজিমা যেখান থেকে যত আহরণ করা যায়, ততই ভাল। তবে বিদেশ থেকে ঘুরে আসলে অনেক ছাত্রকে দেখা যায় আমাদের গরীবানা রকমের সঙ্গে যেন খাপ খাওয়াতে পারে না, সেটা কিন্তু ভাল না। সেই training (শিক্ষা)-ই ভাল training (শিক্ষা), যে training-এ (শিক্ষায়) মানুষ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা ক'রে কাজ হাঁসিল করতে পারে। অসুবিধার ভিতর সুবিধা কোথায়, তা' যে ধরতে পারে এবং অসুবিধাকে যে সুবিধায় পর্য্যবসিত করতে পারে, সে জীবনে ঠকে ও ঠেকে কম।

হাউজারম্যানদার মা—আপনাদের দেশে জমির ফলন বড় কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—We lack in service to man, to soil, to society (মানুষ, জমি এবং সমাজের প্রতি সেবায় আমাদের খাঁকতি আছে)। যাকেই পরিচর্য্যা না করা যায়, সেই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। যার সেবা পেতে চাই, তাকে এমনভাকে সেবা করতে হবে যাতে সে তাজা থাকে, চাঙ্গা থাকে। তাহ'লেই তার সামর্থ্য বাড়বে এবং সেবাও করতে পারবে ভাল ক'রে। সাধারণভাবে একথা সত্য হ'লেও, মানুষ যদি বিকৃত হয়, তাহ'লে সে সেবা পাওয়া সত্ত্বেও হয়তো সেবা নাও দিতে পারে। তাই, মানুষের জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা, যাতে সে বিকৃতি ও বিচ্যুতির হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠতে পারে।

মিসেস এ্যালব্রেক—গো-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আপনার কী মত? অকেজো অসংখ্য গরু থাকা কি ভাল? যদি খাদ্যাভাব হয়, তাহ'লে খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য গরুর প্রাণনাশ করা কি অন্যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরুকে খুব যত্ন করতে হবে এবং utilise (সদ্ব্যবহার) করতে হবে। গরুর প্রতি যত্ন থাকলে useless breeding (অকেজো গোজনন) checked (বাধাপ্রাপ্ত) না হ'য়েই পারে না। খাদ্যাভাব পূরণের জন্য গরু কেন কোন প্রাণীরই প্রাণনাশ হয়, তা' আমার ভাল লাগে না। আর তার দরকারও করে না। প্রাণী হত্যা ক'রে খাদ্যাভাব মেটাবার বুদ্ধি যতকাল আমাদের থাকবে, ততকাল খাদ্যাভাব মেটাবার সুষ্ঠুতর পন্থা আমরা উদ্ভাবন করতে পারব না। ও একটা crude idea (অপরিপক্ক ধারণা)। আর, আমার অভিজ্ঞতা এই যে আমিষাহার স্বাস্থ্যের পক্ষেও সাধারণতঃ ভাল নয়। Finer realisation (সূক্ষ্মতর অনুভূতি) যদি কেউ চায়, তাহ'লে আমিষাহার বজায় রেখে তা' একপ্রকার অসম্ভব।

এমন সময় চুনীদা (রায়চৌধুরী) ও পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করলেন—কেষ্টদা কী করে?

চুনীদা—পড়ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—পড়বারও পারে—এক জীবনে কত যে পড়লো কেষ্টদা !

হাউজারম্যানদার মা—এদেশে ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুর উপর যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, চোখের সামনে তা' দেখা যায় না। দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। আমার মনে হয় ঐরকম নৃশংস অত্যাচার করার থেকে তাদের মেরে ফেলা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ভয়ানক লাগে। মারার কথা আমি ভাবতে পারি না। বাঁচানর কথাই আমি ভাবি।

মিসেস এ্যালব্রেক—যুদ্ধে যারা মানুষ মারতে পারে, তারা পাপের ভয়ে রুগ্ন জীবহত্যা করতে পারে না—এর সামঞ্জস্য কোথায় ? রুগ্ন জীবকে হত্যা করলে তাকে তো কষ্ট থেকে বাঁচান হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence (অস্তিত্ব)-এর জন্য হিন্দু পাগল। অন্যের existence (অস্তিত্ব)-কে সে নিজের existence (অস্তিত্ব)-এর মতো মনে করে। মানুষ বৃদ্ধ বা রুগ্ন হ'লেও সে চায় না যে তাকে হত্যা ক'রে কষ্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া হো'ক। তখনও সে স্বস্তি চায়, সমাদর চায়, সুখের সঙ্গে বাঁচতে চায়। মানুষ যা চায়, অন্যান্য জীবও ঐ অবস্থায় তাই-ই চায়। দেখতে হবে আমরা কীভাবে তাকে তা' দিতে পারি। মানুষের মতো পশুরও খাদ্য, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হবে—যতটা যা' সম্ভব। তাই-ই পরমপিতার অভিপ্রেত। আর, হিন্দু যুদ্ধ করে জীবনের জন্য, এমনি সে যুদ্ধ চায় না। আত্মরক্ষা না করলে নিজ জীবনকে হিংসা করা হয়। অত বড় বিশ্রী হিংসা আর হয় না।

মিসেস এ্যালব্রেক—আমাদের বাঁচার পদ্ধতির সঙ্গেই তো জড়িয়ে আছে পশু-জগৎ বা উদ্ভিদ-জগৎকে হিংসা করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমরা বাঁচিয়ে বাঁচতে পারি। এই চেষ্টা থাকলে তার পন্থাও উত্তরোত্তর উদ্ভাবিত হ'তে থাকবে। আর, আমরা হিংসা করব সেই প্রবৃত্তিকে যা' existence (অস্তিত্ব)-কে hamper (ব্যাহত) করে।

মিসেস এ্যালব্রেক—মানুষ দোষকে দোষী থেকে আলাদা ক'রে দেখতে পারে না। দোষকে হিংসা করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দোষযুক্ত মানুষ ও পশু সবাইকেই মানুষ হিংসা করবে। দোষীকে ভালবেসে তার দোষটা অপসারণ করার চেষ্টা করার কথা আপনি যা বললেন, তা' সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে educate করতে (শিক্ষা দিতে) হবে।

মিসেস এ্যালব্রেক—মন্দিরে ছাগ বলি দেওয়া হয়, তা কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা ভাল নয়। শুনেছি এক সময় গরু, মানুষ প্রভৃতিও বলি দেওয়া হ'তো due to Dravidian influence (দ্রাবিড় প্রভাবের ফলে)। নরবলি তো আইনবিরুদ্ধ। আর, অনেক বিধিনিষেধের সৃষ্টি ক'রে গরুকে ঐ আওতা থেকে

রক্ষা করা হয়েছে। মানুষের বোধ যত বাড়বে, দেব-দেবীর সামনে পশুবলির প্রথা তত উঠে যাবে।

মিসেস এ্যালব্রেক—ভারতবর্ষে গরু খুব বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আগের থেকে গরুর সংখ্যা ক'মে গেছে। আগের মতো যত্নও নেওয়া হয় না।

হাউজারম্যানদার মা—যে-সব গরু আছে, তারও শতকরা প্রায় ৯০টি বাঁচার মতো অবস্থায় নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—People poor, education poorer (লোকেরা দরিদ্র, শিক্ষা দরিদ্রতর)। তবে মানুষের মধ্যে difficulty (অসুবিধা)-গুলি overcome (অতিক্রম) করবার চেষ্টা জাগছে। আস্তে-আস্তে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এমন কোন সমস্যা নেই, যার সমাধান মানুষ না করতে পারে। চাই বিহিত ইচ্ছা ও চেষ্টা।

হাউজারম্যানদার মা—যুদ্ধের সময় মানুষকে মারা যায়, ক্ষুধার সময় পশুকে মারা যায় না—এ কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন বিরুদ্ধ শক্তি যদি আমাদের existence (অস্তিত্ব) annihilate (নাশ) করতে বসে, তখন তা resist (প্রতিরোধ) করাই লাগে। Individual ও national plane-এ (ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্তরে) ধর্ম্মযুদ্ধের প্রয়োজন ঐভাবে আসে। অস্তিত্বকে বিনষ্ট হ'তে দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। আমরা নিজেরাও এমন কিছু করব না যাতে অস্তিত্ব বিনষ্ট হ'তে পারে, আবার অন্যকেও এমন কিছু করতে দেব না যাতে তারা আমাদের অস্তিত্বকে নাশ করতে পারে। পরিবেশের কেউও যদি এমনভাবে চলে যাতে তার নিজ অস্তিত্ব ও অপরের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'তে পারে সেখানেও তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে। আসুরিক বুদ্ধিকে ছলে-বলে-কৌশলে সংযত করাই লাগবে। প্রথমে বোঝাতে হবে, জোর-বলের আশ্রয় না নিয়ে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করতে হবে। এর কোনটাই যদি কাজে না লাগে তেমনতর গত্যন্তরহীন অবস্থায় শুভকামনা নিয়ে প্রয়োজনমতো বলপ্রয়োগ করতে হবে। কারও জীবন ধ্বংস হো'ক তা' আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু তার সত্তাধ্বংসী প্রবৃত্তি যাতে নিয়ন্ত্রিত বা নিরস্ত হয় তা' আমাদের কাম্য। যুদ্ধে লিপ্ত হলেও দেখা ভাল ক্ষতি ও ক্ষয়কে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাই আমি বলি, struggle to achieve good (মঙ্গলের জন্য সংগ্রাম) ভাল, কিন্তু luxury of destruction (ধ্বংসের বিলাস) ভাল নয়। যে পশু আমার সত্তায় আঘাত হানতে উদ্যত নয়, বরং যে আমার সত্তাকে পোষণ জোগায় বা জুগিয়েছে একদিন, তার জীবনহরণের কী অধিকার আছে আমার? সেও তো আমার মতো একটা জীব। মানুষ তো বাঘ-সিংহের খাদ্য। ঐ রকম কোন হিংস্র প্রাণী যদি আমাদের জীবন্ত দেহকে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণ হিসাবে utilise (ব্যবহার) করে, তাহ'লে তখন আমাদের কেমন লাগে?

মিসেস এ্যালব্রেক—স্বার্থপর মানুষের সর্ব্বদাই বিচারে ভুল হয়। তার স্বার্থ

সামান্য ব্যাহত হ'লেই, সে তার উপর এত বেশী গ্রুত্ব আরোপ করে যে তার কোন মাত্রাজ্ঞান থাকে না। স্বল্পতম স্বার্থনাশকে অনেকে জীবননাশের মতো গ্রুতর ব্যাপার ব'লে মনে করে। কিন্তু নিজের স্বার্থসাধনের জন্য অন্যের স্বার্থকে বিপন্ন করতে তার আটকায় না। অপরের অনেক ক্ষতি ক'রেও সে ব্ঝতে পারে না বা ব্ঝতে চায় না—কী এমন ক্ষতি সে করলো। স্বার্থপরতার দর্ন বেশীর ভাগ মান্ষেরই দৃষ্টি যেখানে এই রকম অন্ধ, সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তেই তো তারা দেখতে পাবে যে চতুর্দ্দিকে কেবল হিংসা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'য়ে রয়েছে। এবং সে হিংসাপ্রয়োগকে তারা ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত ব'লেই দাবী করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ধর্ম্ম নয়, তাকে ধর্ম্ম নাম দিলে তা ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়াবে না। যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। আমার বাঁচা-বাড়াটা যদি এমনভাবে অগ্রসর হয়, যার ভিতর-দিয়ে অপরের বাঁচা-বাড়াটা পরিপুষ্ট হ'য়ে চলে তাহ'লে সেখানেই ধর্ম্ম বজায় থাকে। সব সময় নজর রাখা লাগে পরিবেশের কাছ থেকে যা' আমি নিই বা পাই, তার তুলনায় পরিবেশের জন্য দেওয়া ও করাটা যেন আমার বেশী থাকে, বেশী যদি না হয় অন্ততঃ সমান-সমানও যেন হয়। আমার যোগ্যতা যদি বেশী নাও থাকে, তাও সাধ্যমতো আমার চেষ্টার ত্রুটি যেন না থাকে। এই দেওয়াটা, করাটা কিন্তু অনেকভাবে হয়। আমি অসুস্থ, আমাকে হয়তো একজন সেবা করছে। একটা চাউনির ভিতর-দিয়ে এমন কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি আমি তাকে দেখাতে পারি যে তাতেই হয়তো তার ব্ক ভ'রে যাবে তৃপ্তিতে। প্রত্যেকটা মান্ষ আমার মতোই ম্ল্যবান, আমার কাছে আমার জীবন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য যেমন প্রিয়, অপরের কাছেও তার জীবন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য তেমনি প্রিয়—এই কথা জপমন্ত্রের মতো স্মরণ রেখে চলা লাগবে। এমনতর চলনে অভ্যস্ত হওয়াই প্রকৃত education (শিক্ষা)। Properly educated (সমীচীনভাবে শিক্ষিত) হওয়া লাগবে, properly educated (সমীচীনভাবে শিক্ষিত) করা লাগবে।

মিসেস এ্যালব্রেক—দু'-চারজন হয়তো এ-শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে এ-শিক্ষা প্রসারলাভ করা কঠিন ও দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। যতদিন এ-শিক্ষা প্রসারলাভ না করে, ততদিন জগতে তাহ'লে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্বযুদ্ধই তো প্রবল হয়ে থাকবে। প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করবে। প্রতিক্রিয়ায় দুর্ব্বল সবল হ'য়ে উ'ঠে তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। তার আবার প্রতিক্রিয়া হবে। এইভাবে শান্তি তো দুর্লভ হ'য়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি মানুষ ঠিক হ'য়ে দাঁড়ালেই হয়। Government (সরকার) ও people (জনসাধারণ)-এর উচিত ঐ লোকগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ও সহযোগিতা দেওয়া। কতকগুলি মানুষ তৈরী হ'য়ে যদি ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাদের সঙ্গ-সাহচর্য্য যদি বহু মানুষ পায়, তবে education (শিক্ষা)-টা spread (বিস্তারলাভ) করে। প্রকৃত ঋত্বিক্ যাকে বলে, সেই-জাতীয় লোক যদি না বাড়ে,

তারা যদি সর্ব্বত্র ঘোরাফেরা না করে, তাহ'লে হবে না। উপযুক্ত ঋত্বিক্‌দের সংখ্যা ও তাদের কর্ম্মতৎপরতা এত বেশী হওয়া দরকার, যাতে প্রত্যেকটি individual (ব্যক্তি) তাদের নিকট-সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়।

হাউজারম্যানদার মা—যত সৎশিক্ষাই মানুষ পাক না কেন, পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত যেন কিছুতেই যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Education means to know how to think and how to do (শিক্ষা মানে কেমন ক'রে চিন্তা করতে হয় ও কাজ করতে হয়, তা' জানা)। Right thinking (ঠিক চিন্তা) যদি না আসে এবং চিন্তা-অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা যদি না হয়, তাহ'লে শিক্ষা হয় না। স্বার্থান্ধতা একটা wrong thinking (ভুল চিন্তা)-এর ফল। ঠিক চিন্তা ও ঠিক আচরণ যারা করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি তাদের সঙ্গ ও সেবা করা যায়, তবে ঠিক চিন্তা ও ঠিক আচরণ করবার tendency (প্রবণতা) মানুষের মধ্যে জাগতে পারে। বই আমাদের সে impulse (প্রেরণা) দিতে পারে না, যা' মানুষ, বিশেষ ক'রে, আচরণসিদ্ধ মানুষ দিতে পারে। মানুষকে এমনভাবে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে যাতে প্রত্যেকটি individual (ব্যক্তি), প্রত্যেকটি family (পরিবার), প্রত্যেকটি village (গ্রাম), প্রত্যেকটি district (জিলা), প্রত্যেকটি province (প্রদেশ), প্রত্যেকটি country (দেশ) অন্যান্য individual (ব্যক্তি), অন্যান্য family (পরিবার), অন্যান্য village (গ্রাম), অন্যান্য district (জিলা), অন্যান্য province (প্রদেশ) এবং অন্যান্য country (দেশ)-এর প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রস্তুত থাকে। এতে একটা material cementing of interests (বিভিন্ন স্বার্থের একটা বাস্তব সংযোগ ও বন্ধন সৃষ্টি) হয়। আমি ভাবি, আমরা ভারতবাসীরা যদি তেমন সামর্থ্য, সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের অধিকারী হ'তে পারি তাহ'লে আমাদের নজর রাখা উচিত হবে যাতে পৃথিবীর কোন দেশের লোক কষ্ট না পায়। যার হাতেই ক্ষমতা থাকুক, সে এইভাবে ক্ষমতার ব্যবহার করুক—এই আমার ইচ্ছা। যাকে Service (সেবা) দেব, তাকে আবার persuade ও convince করব (লওয়াব ও প্রত্যয়দীপ্ত ক'রে তুলব) যাতে সেও অপরের ভালোর জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাকেও আবার অনুরোধ করব যাতে সে সেবা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যের মধ্যেও পারিপার্শ্বিককে সেবা দেবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয়। পারস্পরিক সেবার এমন ঢেউ তুলে দিতে হবে যা' পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলকে embrace (আলিঙ্গন) করে। এই যদি করা যায়, তবে misery (দুঃখ) materially impossible (বাস্তবে অসম্ভব) হ'য়ে ওঠে। গ্রহ, নক্ষত্র ক্রমাগত ঘুরছে, কই তাদের মধ্যে তো clash (সংঘর্ষ) হয় না। তাদের প্রত্যেকের চলা প্রত্যেকের চলার সহায়ক ব'লে প্রত্যেকের সচল অস্তিত্ব ঠিক থাকে। অস্তিত্বকে বিপন্ন না ক'রে চিন্তার মধ্যে এইরকম একটা ধাঁচ আনা চাই যে অন্যের interest (স্বার্থ)-ই প্রথম। আমরা যদি

এইভাবে interest (স্বার্থ) consider (বিবেচনা) করতে অভ্যস্ত হতাম, তাহ'লে war (যুদ্ধ)-ই হ'তো না।

মিসেস এ্যালব্রেক—জ্যোতিষশাস্ত্রের উপযোগিতা কী আমাদের জীবনে ? অনেকে কোন কাজ আরম্ভ করার আগে জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে। এর গুরুত্ব কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত গ্রহের influence (প্রভাব) আছে পৃথিবী ও আমাদের উপর —যেমন চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়। বিশেষ-বিশেষ সময়ে বিশেষ-বিশেষ গ্রহের benign influence (শুভ-প্রভাব) থাকে বিশেষ-বিশেষ লোকের উপর, আবার কোন-কোন গ্রহের harmful influence (ক্ষতিকর প্রভাব)-ও থাকে। যেটা মঙ্গলকর তার সুযোগ নেওয়া ভাল এবং যেটা অমঙ্গলজনক তা' counteract (নিবারণ) করার ব্যবস্থা করা দরকার। বিহিত তপস্যায় মানুষ তার psychical level (মানসিক স্তর)-কে এমন height-এ (উচ্চতায়) তুলে নিতে পারে, যেখানে গ্রহেব অমঙ্গলজনক প্রভাব তার উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় না। অশুভ গ্রহ বা গেরো অর্থাৎ knot যদি মনের নাগাল না পায়, তাহ'লে বেশী ক্ষতি করতে পারে না। আর properly selected gems (সুনির্বাচিত রত্নাদি) অশুভ ফল অনেকখানি counteract (নিবারণ) করে। প্রত্যেক গ্রহ কতকগুলি ıay (রশ্মি) emıt (নির্গত) করে। সব রকম ray (রশ্মি) সবার পক্ষে ভাল হয় না। রত্নাদি ধারণ করলে unfavourable ray (অশুভ রশ্মি)-গুলি অনেকটা repelled (প্রতিহত) হ'তে পারে। সেগুলি শরীর-বিধানে প্রবেশ ক'রে মনকে আক্রমণ করতে পারে কম।

কেষ্টদা এসেছেন ইতিমধ্যে। তিনি বললেন—ভৃগুর কোষ্ঠী অসম্ভব মেলে।

হাউজারম্যানদার মা—জ্যোতিষের দিকে বেশী ঝুঁকলে মানুষ অদৃষ্টবাদী হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fatalist (অদৃষ্টবাদী) তখনই হই, যখন ıgnorant (অজ্ঞ) থাকি, জানি না, বুঝি না how to manipulate and achieve (কেমন ক'রে কোন্ নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে প্রাপ্তিতে পৌঁছাতে হয়)। জেনে বুঝেও যদি করণীয় না করি, তাতেও কিন্তু fatalism (অদৃষ্টবাদ)-এর প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একটা blow (আঘাত) আসলো, কেন আসলো জানতে পারলাম না, counteract (প্রতিরোধ) করতে পারলাম না, সেখানে হয় fatalism (অদৃষ্টবাদ)। গ্যাস ছাড়লো, mask (কৃত্রিম মুখাবরণ)-এর use (ব্যবহার) জানলাম না, সেখানে হয় fatalism (অদৃষ্টবাদ)। একটা-কিছু হবে জানলাম, antidote (প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা) সৃষ্টি করলাম, সেখানে fatalism (অদৃষ্টবাদ) হয় না। কিছুকে ignore (উপেক্ষা) না করা ভাল। খুঁজে দেখতে হয় তার মধ্যে কিছু আছে কি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Every country should prepare herself with every needful resource against the terrific emergencies of her sister-countries. Similarly every province, district or commu-

nity should be prepared for sister-provinces, districts or communities and this is the only material cementing interest that makes one another interested in progressive life and growth, making misery materially impossible. (আশপাশের অন্যান্য দেশের নিদারুণ সংকট মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসঙ্গতি-সহ প্রত্যেকটি দেশের প্রস্তুত থাকা উচিত। এইভাবে প্রত্যেকটি প্রদেশ, জিলা ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রদেশ, জিলা ও সম্প্রদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত এবং এই-ই একমাত্র বাস্তব স্বার্থ-সংযোজন যা পরস্পরকে প্রগতিমুখর জীবনবৃদ্ধিতে স্বার্থান্বিত ক'রে দুর্দ্দশাকে বাস্তবে অসম্ভব ক'রে তুলতে পারে)।

এরপর মায়েরা বিদায় নিলেন।

ননীদা—Do not tempt Lord (প্রভুকে প্রলুব্ধ করো না)—কথাটার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ওর মানে—ভগবানকে পরীক্ষা করতে যেও না। তাঁকে তোমার সর্ত্তাধীন ক'রে তোমার মনোমতো ক'রে পেতে চেও না। তাঁকে নিঃসর্ত্তে ভালবাস ও অনুসরণ কর। তাঁর মনোমতো হ'তে চেষ্টা কর। তাঁকে যদি তোমার ভ্রান্ত ইচ্ছা ও স্বার্থের অধীন ক'রে পেতে চাও, তাতে তোমার কোন লাভ নেই। তোমারই ক্ষতি তাতে সবচাইতে বেশী। তুমি জান না কিসে তোমার মঙ্গল। তোমার পাগল মন এক-এক সময়ে এক-এক রকম চাইবে, সেই সব চাওয়ার পূরণ ও তার ফলাফল তোমাকে কালে-কালে এমনভাবে বিপর্য্যস্ত ক'রে ফেলতে পারে যে তোমার পক্ষে তাল সামলানই দায় হবে। সুতরাং আবোল-তাবোল চেও না তাঁর কাছে। বরং তিনি কী চান, তাই বোঝ, তাই চাও করার ভিতর-দিয়ে। আর, তোমার নিজস্ব যদি কোন চাহিদা থাকে, তাও পেতে হবে করার ভিতর-দিয়ে। না ক'রে পাওয়ার বাহানা নিয়ে ভগবানের শক্তি পরীক্ষা করতে যেও না। এমনতর গান আছে—এবার যদি না তরাও তারা তোমার নাম আর কেউ লবে না। ও-সব ছেদো কথায় ভগবান ভোলেন না। ত্রাণ লাভ করতে গেলে তোমাকে বিধি-মাফিক তাই করতে হবে যাতে ত্রাণ লাভ হয়। তাঁর যা' করবার তিনি করতেই আছেন। যে করতে লাগে সে পদে-পদে তাঁর দয়া টের পায়। না করলে তাঁর দয়া বোধের মধ্যে আসে না। ভগবান মানুষের নিন্দাস্তুতির ধার ধারেন না। সক্রিয় ভক্তি, ভালবাসা ও আত্মনিয়ন্ত্রণই তাঁর অনুমোদন লাভ করে।

ননীদা—আমরা যখন অসম্ভাবে অভিভূত হই, ভগবান তখন কী করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mercy (দয়া) ততই ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে to maintain our existence (আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে)। একটা ছেলে বেয়াড়াই যদি হ'য়ে যায়, কিছুতেই না ফেরে, বাপ তখন ভাবে—বেঁচে থাক, বেঘোরে যেন না পড়ে। সে আশা ছাড়ে না, ভাবে—বেঁচে থাকলে একদিন নিজের ভুল বুঝবে, একদিন সে ভাল হবে। সাধারণ পিতার যদি এতখানি দরদ থাকে, তবে পরমপিতার কতখানি দরদ তা চিন্তা

ক'রে দেখলেই পার। অসৎ-অভিভূতির ফলে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। অস্তিত্বের মায়ায় মানুষ তখন ফিরতে চায়। কিন্তু এ-পথে বড় কষ্ট। ভগবান এমনই কল করেছেন যে ভাল না হ'লে সুখ পাওয়ার জো নেই। এই বুঝটা যাদের ঠিক থাকে তারা পার পেয়ে যায়।

ননীদা—সমস্ত ভাবই ভগবান থেকে এসেছে। তাহ'লে ভগবত্তা বলতে ভাল-মন্দ দু'টোকেই বুঝায় কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবত্তা বলতে মন্দটা বুঝায় না। মন্দ বা শয়তান ভগবত্তারই opposite pole (বিপরীত প্রান্ত)। যেমন অন্ধকার না থাকলে আলোর existence (অস্তিত্ব) বোঝা যায় না, পাপ না থাকলে পুণ্যের বোধ আসে না, এও তাই। ভগবানই বাস্তব, শয়তান মানে ভগবদ্বিমুখতা। যে যতখানি ভগবান-সর্ব্বস্ব, সে ততখানি শয়তানের আধিপত্য-মুক্ত। ভগবানের সাথে যুক্ত থেকে তাঁর পথে চলতে থাকলেই শয়তানকে শয়তান ব'লে, মন্দকে মন্দ ব'লে চেনা যায় ও অতিক্রম করা যায়। ভাল-মন্দের বিভেদ করতে পারাটা এবং মন্দকে অতিক্রম করতে পারাটাই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব যদি না থাকতো, তাহ'লে আমাদের বোধ, জ্ঞান ও উপলব্ধিও অগ্রসর হ'তে পারত না। সে হিসাবে মন্দও মন্দ নয় তার কাছে যে মন্দকে অতিক্রম করতে পেরেছে অর্থাৎ মন্দকেও সত্তাপোষণী ক'রে নিতে পেরেছে।

এরপর স্থানীয় দু'জন ভদ্রলোক আসলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—আমাদের বাড়ীতে একটা কুয়ো করছি, কিন্তু কুয়োটা খুঁড়তে বড় অসুবিধা হ'চ্ছে। যাঁরা এ-সব বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁরা সবরকমে চেষ্টা করা সত্ত্বেও হ'য়ে উঠছে না। তাই আপনার কাছে এসেছি যদি আপনাদের মতো মানুষের দয়ায় কিছু সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া।

ভদ্রলোক—তাহ'লেও আপনাদের বৈশিষ্ট্য আছে। আপনাদের উপর তাঁর বিশেষ দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর দয়া সকলের উপরই আছে। আমরা তাঁর দয়ার দিকে যত এগুই তত তাঁর দয়া উপলব্ধি করি। পরমপিতার দয়ায় আপনার কুয়োয় এখন জল আসলে হয়। তবে ভাল ইঞ্জিনীয়ার ডেকে দেখান মন্দ নয়! যে ব্যাপারে বিহিত যা', সে-ব্যাপারে তা' যথাযথভাবে করলে তাঁর দয়ার দিকে এগোন হয়।

এরপর ভদ্রলোকরা বিদায় নিলেন।

২৫শে পৌষ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১০।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আছেন। রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), মহিমদা (দে), হরেনদা (বসু), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), লক্ষ্মীদা (দলুই), নগেনভাই (দে) প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

কি-ভাবে লিখলে লেখা কার্য্যকরী হয়, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন কিছু লিখে একটা লেখাপড়া না-জানা মেয়েছেলেকে প'ড়ে শোনাতে হয়। দেখতে হয়, সে স্বচ্ছন্দে বোঝে কিনা, তার ভাল লাগে কিনা। আবার প'ড়ে শোনাতে হয় সহৃদয় সমঝদার লোককে। Cruel critic (নিষ্ঠুর সমালোচক) যা'রা তাদেরও দেখাতে হয়। আবার শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিভিন্ন পেশাওয়ালা ও বিভিন্ন ধরনের লোকের দঙ্গলের সামনেও প'ড়ে শোনাতে হয়। সব রকমের শ্রোতা যদি বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাহ'লে বোঝা যাবে যে লেখা ঠিক হয়েছে। সলীল গতিতে লিখতে হয়, যাতে লেখা মানুষের মনকে স্পর্শ করে। মানুষ primarily sentimental (প্রথমতঃ ভাবানুকম্পিতাপ্রবণ), then rational (তারপর যুক্তি-প্রবণ)। Sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-ই মানুষকে guide (পরিচালনা) করে। তাই যা'-কিছু লেখ, তা' মানুষের sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-কে appeal ও elate (আবেদনের ভিতর-দিয়ে উদ্দীপ্ত) করা চাই। Rationally adjust (যুক্তিপূর্ণভাবে বিন্যস্ত) ক'রে sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-কে যাতে appeal ও elate (আবেদন ও উদ্দীপনাদীপ্ত) করে তেমনভাবে লিখতে হয়। এর সঙ্গে চাই facts from common life (সাধারণ জীবনের তথ্য)। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে যদি কোন-কিছু বুঝতে পারে, সে বুঝ সহজে তার মাথা থেকে যায় না। লেখা ও বলার রকমই এমনতর হওয়া চাই যাতে তা' মানুষকে মঙ্গলকর চলনায় প্রবৃত্ত ক'রে তোলে। লেখা ও বলার সার্থকতা সেখানেই। চরিত্র চুইয়ে যে-কথা বেরোয় তাই-ই মানুষকে নাড়া দেয়। এইভাবে লিখতে ও বলতে পারলে দেখবে তার ফলে মানুষের ক্ষমতা বেড়ে গেছে। ক্ষমতা বাড়ানই ধর্ম্মদান। আমরা যাই করি, তার ভিতর-দিয়ে অন্যকে ability (যোগ্যতা) impart (সঞ্চারিত) ক'রে চলব।

একটা ভাল বিদেশী সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী বিক্রী হবে ব'লে সংবাদ পাওয়া গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীদাকে বললেন—

তুই যদি একটা সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী করতে পারিস ভাল হয়। আমার ইচ্ছা সৎসঙ্গের থাকবে major share (বেশীর ভাগ অংশ), তোরও থাকবে অনেকটা। তুই responsibility (দায়িত্ব) নিয়ে manage (পরিচালনা) করবি। আমাদের দোয়াড়ে supply (যোগান) দিবি, বাইরে business (ব্যবসা)-ও করবি। সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী হ'য়ে গেলে তারপর গ্লাস ফ্যাক্টরী করতে ইচ্ছা করে।

লক্ষ্মীদা—সিমেণ্ট-ফ্যাক্টরী বিরাট ব্যাপার। অতো বড় ব্যাপারে হাত দিতে আমার সাহস হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—দূর বেটা! ঘাবড়াস্ ক্যা?

শ্রীশ্রীঠাকুরের মনোমদ স্ফূর্ত্তিযুক্ত ভঙ্গী দেখে সকলে হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে বেরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে কাঠের কাজ দেখতে আসলেন।

মনোহরদাকে (সরকার) জিজ্ঞাসা করলেন—চৌকী কবে হবি রে ?

মনোহরদা—দেখি যদি আজকের মধ্যে শেষ ক'রে দিতে পারি। আরো কিছু যন্ত্রপাতি হ'লে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী-কী জিনিস লাগবি তার একটা লিষ্টি ক'রে প্রফুল্লর কাছে দিস। (প্রফুল্লকে বললেন)—তুই আমাকে মনে করিয়ে দিবি। কলকাতায় যাওয়ার কাউকে পেলে ব'লে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর উত্তরদিকের বারান্দায় এসে বসলেন।

কিছুক্ষণ পরে পরিবারবর্গসহ বিধুবাবু (সেনগুপ্ত) রিখিয়া থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে আসলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রাজেনদা (মজুমদার), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), ডাক্তার কালীদা (সেন) প্রভৃতি অনেকে সঙ্গে-সঙ্গে আসলেন।

বিধুবাবু প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—শান্তি কবে আসবে ? আপনার কী মনে হয় ? কতদিনে বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চালগুলি সুস্থ চাল নয়। যখন যা' করা উচিত, তা' করা হয় না, যখন যেভাবে চলা উচিত তখন সেভাবে চলা হয় না।

বিধুবাবু—কী করা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি জিনিস আছে, কইলে ভাল হয় না। কাগজে এমন অনেক জিনিস বেরিয়ে যায়, যা' বেরিয়ে যাওয়া উচিত নয়। আমরা স্বাধীন হ'লেও অনেক-গুলি ইংরেজ অফিসারকে কাজ দিয়ে এদেশে রাখা অসম্ভব ছিল না। তাতে যা' ক্ষতি হ'তো তা' more than compensated (পূরণের চাইতে বেশী) হ'য়ে যেতো। ইংরেজরা যদি বুঝতো যে ভারতের সঙ্গে এখনও তাদের স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত আছে, তাহ'লে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে ভারতের ক্ষতি করবার প্রবৃত্তি তাদের অতো উগ্র হ'য়ে উঠতো না। জানেন তো ওরা এদেশ অধিকার করবার পর হিন্দুদের দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম্মের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কিভাবে তাদের আস্থা অর্জ্জন করেছিল। আর আমার মনে হয়, Division of India (ভারত-বিভাগ) accept করা (মেনে নেওয়া)-ই ভাল হয়নি। তা' আমাদের পক্ষেও না, ওদের পক্ষেও না এবং সকলেই তা' বুঝতে পারবে দিনে-দিনে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের প্রধানদের অনেকে আজকাল প্রতিলোম বিয়ে support (সমর্থন) করছে। তা' কি ঠিক ? এতে কিন্তু ধ'রে দাঁড়াবার মতো আর কিছু থাকবে না। মানুষের রক্তে যদি গোল ঢোকে, তবে গুণসম্পদও ঐ সঙ্গে-সঙ্গে নষ্ট হবে। সে-গুণ গজিয়ে তোলার কোন পথ থাকবে না। প্রতিলোম-সংস্রব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাই ওতে বিপর্য্যয়ী ফল হয়। কিন্তু অনুলোম ঠিকভাবে হ'লে তাতে কখনও ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। অনুলোমে বাইরের অনেক-কিছু সমাজদেহে

absorbed হ'য়ে (মিশে) যায়, বিষ্ণুশরীরে গুপ্ত হ'য়ে যায়। এই process of assimilation (আত্মীকরণের পদ্ধতি) ছাড়া সমাজ বৃদ্ধির পথে চলতে পারে না।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—আমরা যে আজ বর্ণাশ্রম মানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' মানব কেন ? তাহ'লে জাহান্নমে যাব কি ক'রে ভাল করে? বর্ণাশ্রমের বিধান যে সব দিক দিয়ে কত কার্য্যকরী, তা' যতই ভাবা যায়, ততই বিস্মিত হ'তে হয়। বর্ণাশ্রমী সমাজে division of labour (শ্রমবিভাগ) এমন ছিল যে unemployment (বেকারত্ব) ব'লে কোন জিনিস ছিল না। এ যে একটা কত বড় achievement (কৃতিত্ব) তা' ভেবে কুল করা যায় না। সমাজের সব মানুষকে স্ব-স্ব যোগ্যতা ও গুণ অনুযায়ী যদি thoroughly engaged (পূর্ণভাবে কর্ম্মনিযুক্ত) না করা যায়, তাহ'লে সমূহ বিপদের কথা। তা' থেকে বহু অশান্তি, অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা দেয় সমাজে। প্রত্যেকে যদি profitably engaged (লাভজনকভাবে কর্ম্মব্যাপৃত) হয় according to his taste and temperament (তার রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী), তাহ'লে social adjustment (সামাজিক বিজ্ঞান) অনেক সহজ হ'য়ে আসে। কেউ তখন নিজেকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত ব'লে মনে করে না। এ এক অসম্ভব জিনিস। পৃথিবীতে যেমন আর চাণক্য, কালিদাস ও অশোক জন্মায় না, এও যেন তেমনি। আজকের সমাজটা এমন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে মানুষ যেন কিছুতেই শিষ্ট পরিতৃপ্তবোধে উপনীত হ'তে পারছে না। বর্ণাশ্রমের ব্যত্যয়ে অনেক কিছুর ব্যত্যয় ঘটে যাচ্ছে। বর্ণাশ্রমের মতো অমনতর beautiful socialistic system (সুন্দর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) রাশিয়াও করতে পারেনি। সেখানে ব্যক্তিকে তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে হারাতে হয়েছে।…… বর্ণাশ্রমে রাজা হ'লো executive head (শাসনতান্ত্রিক প্রধান)। তাঁকে মেনে চলতে হ'তো Cabinet-কে (মন্ত্রিসভাকে)। Cabinet-এর (মন্ত্রিসভার) আবার মেনে চলতে হ'তো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনুশাসন মেনে চলার ফলে সমাজ স্বতঃই উদ্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে চলতো। এই উদ্বর্দ্ধনী আবেগ না থাকলেই মানুষ ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে।

বিধুবাবুর জামাতা—আজকাল তো militant socialism (সংগ্রামী সমাজতন্ত্র) এসে পড়েছে সর্ব্বত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যা' ছিল, তাই মেজে-ঘসে ঠিক ক'রে নিলেই হয়। আগে কী ছিল, কীভাবে apply (প্রয়োগ) করা হয়েছিল, তা' না জানলে হবে না। আমরা যদি এক, অদ্বিতীয়কে মানি, পূরয়মাণ পূর্ব্বতন ঋষি-মহাপুরুষদের মানি, বর্ণাশ্রম মানি, পিতৃপুরুষকে মানি, এবং বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে অনুসরণ ক'রে চলি, তাহ'লে আমাদের আর কোন ভয়-ভাবনা নেই! শুধু এইটুকুর উপর যদি দাঁড়ান যায়, তাহ'লে ভারত জগতের গুরুর আসনে আসীন হ'তে পারে।

তার মানে ভারত নিজের সর্ব্ববিধ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ক'রে জগতের পথপ্রদর্শক হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

বিধুবাবু—দেশের স্বাধীনতাকে কায়েম করার ব্যাপারে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ও উন্নয়ন-মূলক কাজ দুটিরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ-দুটির মধ্যে কোনটার উপর এখন বেশী গুরুত্ব দেওয়া দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোনটাকে ignore (উপেক্ষা) করলেই চলবে না। সর্ব্বপ্রকার বিপদের জন্য এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হ'বে, যাতে কোন বিপদই আমাদের ঘায়েল করতে না পারে। আর চাই diplomatic manipulation (কূটনৈতিক পরিচালনা)। এমন চালে চলা লাগে যাতে যে-কোন দেশই যেন বুঝতে পারে যে ভারতের ক্ষতি করতে গেলে তাকে অন্য শক্তিমান দেশগুলি ছেড়ে কথা কইবে না। সঙ্গে-সঙ্গে চাই দেশে-বিদেশে ভারতের সমাধানী কৃষ্টি-সম্পর্কে প্রবল যাজন, যাতে সারা দেশের লোক উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ওঠে এবং সারা জগৎ ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে ওঠে। এমন একটা climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি করতে হয় যে জগৎ যেন ভারতকে তার অস্তিত্বের ধারক, পালক ও রক্ষক ব'লে ভাবতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। অবশ্য আমাদেরও বাস্তবে হ'য়ে ওঠা লাগবে তাই। শিশুকাল থেকে এই স্বপ্নই দেখে আসছি আমি। আমি বলছি—সে-ক্ষমতা আছেও আপনাদের। শুধু চাই তাকে উসকে দেওয়া, জাগিয়ে তোলা। আমার মনে হয়, দু-চারখানা কাগজ পেলে একলাই পচাল পাড়তাম। মূল কথাগুলি ফেনায়ে-ফেনায়ে নানাভাবে ব'লে মাতিয়ে তুলতাম সারা দেশ। দেশের মধ্যে ভাল ক'রে চারাতে পারলে, বিদেশে চারান কঠিন হ'তো না। কাগজও নেই। অন্ততঃ একপাতা ক'রেও যদি পেতাম। Common people are foolish and forgetful (সাধারণ মানুষ নির্ব্বোধ ও ভ্রান্তিপ্রবণ)। বার-বার push (ঠেলা) দেওয়া লাগবে। একই জিনিস নানাভাবে পরিবেষণ করা লাগবে। কখনও রাঙ্গভোগ, কখনও কমলাভোগ, কখনও বাদশাভোগ। রকমারি রকমে, যাতে প্রত্যেকের রুচি ও পছন্দ ধরে। করতে পারলেই হয়। আমাদের এই যারা আমেরিকান আছে, তারা আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম বোধ করে। আমাদের পরিবেষণ ঠিক হ'লে সবাই আপন বোধ ক'রে মিশে যাবে—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের যাজনের ধারা ঠিক নয়। শুনেছি ওরা যীশুকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যান্য মহাপুরুষদের খাটো করতে চেষ্টা করে। ওতে কিন্তু ফল হয় উল্টো। যীশুর প্রতি শ্রদ্ধারই খাঁকতি হয়। যীশুরই অপ্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তিনি নিজে কত স্পষ্ট-ভাবে ব'লে গেলেন—I am come to fulfil and not to destroy (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে আসিনি), কিন্তু আমরা কি সে-সব কথায় কান দিই? পূর্ব্বতনের পরিপূরণ যে-পরবর্ত্তীর মধ্যে আমরা পাই, তাঁকে মানতে কারও আটকায় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান, মুসলমান যে যাই হো'ক প্রত্যেকের যাতে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা বাড়ে, সেইভাবে বোল তোলা লাগবে, আর ধরিয়ে দিতে হবে যে

মূলতঃ সবাই এক, কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নয়, পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে ছাড়া কারও স্থিতি কায়েম হবার নয়। অপরকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করলেই নিজ অস্তিত্ব বরবাদ হ'তে বসবে। এমনতর সঙ্গতিশীল বোধের থেকেই গজাবে assimilation (আত্মীকরণ) ও integration (সংহতি)। আমরা বলি 'সর্ব্ব-দেবময়ো গুরুঃ।' অর্থাৎ বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের মধ্যে পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ জীয়ন্ত ও জাগ্রত হ'য়ে থাকেন। সবার সব রকম traits-এর (গুণাবলীর) manifestation (প্রকাশই) তাঁর মধ্যে থাকে, তদতিরিক্ত অনেক-কিছুও থাকে যুগ-প্রয়োজন-অনুযায়ী। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। যার যেমন বৈশিষ্ট্য, যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী সে সেইভাবেই তাঁকে দেখে, সেইভাবেই তাঁকে পায়। তিনি যেন অফুরন্ত। তিনি যে কি বটেন এবং কি নন, তা' জায় ক'রে বলা যায় না। ব্রহ্মের যেমন ইতি অর্থাৎ শেষ নেই, তাঁরও তেমনি। তাঁকে ধ'রেই সব Community (সম্প্রদায়) unified (ঐক্যবদ্ধ) হ'তে পারে।

এরপর বিধুবাবু প্রভৃতি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। যাবার আগে তিনি বললেন—আমি ভেবে দেখি, আপনার ভাবধারা পত্রিকায় প্রচার করা সম্বন্ধে কি করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন।

স্বস্ত্যয়নী পালনের সুফল-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

মেদিনীপুরের ভূপেশদা (রায়) বললেন—স্বস্ত্যয়নী করা যে খুব ভাল তা বুঝি। কিন্তু আর্থিক অনটনই অসুবিধার সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্ত্যয়নীর principle (নীতি) ক'টা follow (অনুসরণ) করলে, তাই-ই স্বস্ত্যয়নী চালাবার সামর্থ্য জুগিয়ে দেবে, ওই-ই ঠেলে তুলবে তোমাকে। যে-কারণে অনটন আসে, সেই কারণের নিরসন করবার জন্যেই স্বস্ত্যয়নীর নিয়মগুলি পালা লাগে। শুধু অর্ঘ্যনিবেদন কিন্তু স্বস্ত্যয়নী নয়। ওটা হ'লো স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নিয়মের অন্যতম। একসঙ্গে পাঁচটি নিয়ম যথাসাধ্য পালন করলেই স্বস্ত্যয়নী পালন করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে লক্ষ্মীদাকে (দলুই) বললেন—দীক্ষিতের সংখ্যা যদি আশানুরূপ বেড়ে যায়, তারা যদি ভালভাবে organised ও integrated (সংগঠিত ও সংহত) হয়, তাদের দিয়ে বড়-বড় Industry (শিল্প) start (চালু) করা শক্ত কাজ কিছু নয়। সবকিছু নির্ভর করে ভাল-ভাল কর্ম্মী পাওয়ার উপর। সাধারণ মানুষগুলিকে দিয়ে অসাধারণ বড়-বড় কাজ করিয়ে নেওয়া যায় যদি তাদের পিছনে উপযুক্ত মাহুত থাকে। আর ঋত্বিক্‌রা হ'লো সেই মাহুত। ঋত্বিক্ জাগলে সব জাগবে। তাদের self-interest (আত্মস্বার্থ) হওয়া চাই লোক-উন্নয়ন। ছেলেপেলের জন্য বাপে যেমন করে, যজমান ও জনসাধারণের জন্য তাদের তেমনি করা চাই। ঐ ফন্দী-ফিকির নিয়ে ঘুরবে তারা। ভাল ক'রে লাগলে মানুষগুলিকে তাজা, তরতরে ক'রে তুলতে ক'দিন লাগে ? আমি আগের মতো খাটতে পারি না। আশ্রমে এক সময় এমন

দিন গেছে সারা আশ্রম যেন কর্ম্মমুখর, আনন্দমাতাল হ'য়ে থাকতো। কাউকে অবসন্ন হ'য়ে থাকবার অবকাশ দিতাম না। আজ তারাই হয়তো উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবে নিথর হ'য়ে আছে। সবই করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্র যদি strong (সবল) না হয়, ভুল চালের ফলে নেতারা যদি disaster (বিপর্য্যয়) invite (আমন্ত্রণ) করেন, তাহ'লে খুবই মুশকিলের কথা। তাতে মানুষের স্থিতিটাই নড়বড়ে হ'য়ে পড়ে। নেতা যদি দূরদর্শী না হন, তাঁর যদি সব দিকে সম্যক নজর না থাকে, তাহ'লে ভাল করতে গিয়েও তিনি অনেক সময় খারাপ ক'রে বসতে পারেন। ভবিষ্যতে কী-কী অসুবিধা আসতে পারে তার প্রতিকারের জন্য এখন থেকে কী-কী প্রস্তুতির প্রয়োজন, আজকের চলাটা ৪০।৫০ বা ১০০ বৎসর পরে দেশকে কোথায় দাঁড় করাতে পারে, সেটা যদি নেতা বোধিদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে না পারেন তবে তার নেতৃত্ব একটা বিড়ম্বনা। সেইজন্য নেতার উচিত দ্রষ্টাপুরুষের দ্বারা নীত হওয়া।

সুধাংশুদা (মৈত্র) সবুজ পাতার মতো রং-এর একটা পোকা দেখাতে নিয়ে আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে বললেন—বিষাক্ত পোকা, ফেলে দাও। দেখ প্রকৃতির কেমন লীলা। Camouflage (ছদ্মবেশ) ক'রে দিয়েছে বোঝবার জো নেই।

প্রফুল্ল—ওতে ওর না হয় সুবিধা হ'লো, মানুষের পক্ষে তো অসুবিধা। মানুষ চিনতে ও বুঝতে না পারার দরুন পোকাগুলি অক্ষত অবস্থায় থেকে আপন খুশিমতো মানুষের ক্ষতি সাধন করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তো জানি না ওকে দিয়ে মানুষের কী উপকার হ'তে পারে।

শরৎদা (হালদার)—জোঁককে দিয়ে মানুষের কি উপকার হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে রক্তমোক্ষণ দরকার, সেখানে চাকুর খোঁচা বেঁচে যায়। আর, জোঁক নাকি সাধারণতঃ দুষ্টরক্তই খোঁজে। ঢের আছে, আমরা বুঝি কতটুকু, জানি কতটুকু, আমাদের জ্ঞান কতটুকু ? প্রকৃতির পরিকল্পনার মধ্যেই আছে জীবকল্যাণ। কোন্‌টাকে কীভাবে কল্যাণকর ক'রে তোলা যায়, সেইটে আবিষ্কার করা ও সেই পথে চলাই একাধারে বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

স্বাধীনতা-সম্পর্কে কথা উঠলো।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকটা individual (ব্যক্তি)-ই যদি liberty (স্বাধীনতা) না পেল অর্থাৎ বৃদ্ধির পথে চলার সুযোগ না পেল, তবে সে liberty (স্বাধীনতা)-র কোন দাম নেই। আপনারা যারা ঋত্বিক্‌, তাদের কাজ হ'লো প্রত্যেকটি individual (ব্যক্তি)-র উপর attention (নজর) দিয়ে, তাকে প্রয়োজনমতো service (সেবা) দিয়ে বৃদ্ধির পথে চলন্ত করে দেওয়া।

২৬শে পৌষ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১১।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলঘরে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা

(হালদার), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), লক্ষ্মীদা (দলুই), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) এবং বোসমা, নন্দীমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যখন ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও আদর্শের বিরোধ। হয়, তখনই তারা সাম্প্রদায়িক বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যতই ঈশ্বরমুখী হয়, ততই সে সকলকে আপনবোধে ভালবাসে ও সেবা করে। কারণ, সে জানে যে সেও ঈশ্বরের এবং সকলেই ঈশ্বরের। ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রতিটি জীবকে সে কখনও ভাল না বেসে পারে না। পিতৃভক্ত সন্তান কি কখনও অন্যান্য ভাইদের ভাল না বেসে পারে ?

Contentious communal difference is the hellish distance from prophets, God and dharma but service and spiritual kinship are near to them.

(বিবদমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রেরিতপুরুষ, ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম থেকে নারকীয় দূরত্ব সূচিত করে কিন্তু পারস্পরিক সেবা ও আত্মিক সম্বন্ধ ঐ সবের সঙ্গে নৈকট্যের পরিচয় দেয়।)

তারপর বললেন—

All the prophets of the past converge and awaken in that of the present. Love to Him is love to all in the worship of God.

(অতীতের সমস্ত প্রেরিতপুরুষ বর্ত্তমানের প্রেরিতপুরুষে কেন্দ্রীভূত ও জাগ্রত হন। তাঁর প্রতি ভালবাসা মানে পূর্ব্বতন প্রেরিতপুরুষগণের প্রতি ভালবাসা, যা' ঈশ্বরোপাসনায় সার্থকতা লাভ করে।)

পরে ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বললেন—'বাসুদেব সর্ব্বমিতি' যে বোঝেনি, ভগবান synthetically (সংশ্লেষণ-সহকারে) তার কাছে আবির্ভূত হননি। জীবন্ত মহাপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে উপলব্ধিটা যখন মূর্ত্তিমান হ'য়ে ওঠে, তখন তা' নিজ অস্তিত্বের মতো সত্য ও বাস্তব হ'য়ে ওঠে। তার ভিতর-দিয়েই গজায় নিনড় নিষ্ঠা ও প্রত্যয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় একখানি চেয়ারে ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ চারিদিকে ঘিরে বসেছেন।

নবদীক্ষিত একটি ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কীভাবে চলব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে চলবে। এর তিনটে factor (উপাদান) আছে। একটা হ'লো যজন অর্থাৎ জপধ্যান ইত্যাদির বিধান যা দীক্ষার সময় পেয়েছ তা' নিত্য নিয়মিতভাবে নিজে practice (অনুশীলন) করা। আর-একটা হ'লো যাজন অর্থাৎ পরিবেশকে ইষ্টী-চলনে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা। পরিবেশ যদি ইষ্ট-মুখর হ'য়ে ওঠে, তাতে তোমারই লাভ। তাতে তুমি উন্নত প্রেরণা পাবে তাদের কাছ থেকে। যাজনে মানুষকে মুগ্ধ করতে গেলে চাই তাদের প্রতি সেবা ও সদ্ব্যবহার। অন্যের সঙ্গে যত

ভাল ব্যবহার করা যায়, ততই নিজের সত্তা সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। এতেই জীবন উপভোগে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। এর সঙ্গে আছে ইষ্টভৃতি—রোজ নিজে অন্নজল গ্রহণ করার আগে যথাশক্তি ইষ্টকে নিবেদন করা। এমনতর করার ভিতর-দিয়ে ইষ্টের উপর টান বাড়ে। ইষ্টটান যত বাড়ে ততই প্রবৃত্তির টান সুনিয়ন্ত্রিত ও সত্তাসঙ্গত হ'য়ে ওঠে। মনে রাখবে—উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন, চলা-ফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ। জানবে তোমার জীবন তোমার ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য। তাঁর মনোমত ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তোলার মধ্যেই আছে তোমার জীবনের সার্থকতা। এইভাবে খুব চালাও। অতটুকু practice (অনুশীলন) নিয়ে যদি চলতে পার unrepelling adherence (অচ্যুত অনুরাগ) নিয়ে, কোথা দিয়ে যে কি হবে বলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—ইষ্টায়নী, ঋত্বিকী, আনন্দবাজার সব দিকেই নজর দিয়ে চলবে। সব-কিছু গ'ড়ে তুলতে অজচ্ছল টাকা লাগবে।

হাউজারম্যানদা ও তাঁর মা আসলেন।

মা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হিটলার এক সময় আমেরিকানদের সম্বন্ধে বলেছিল যে আমেরিকানরা এত বেশী আরামপ্রিয় হ'য়ে গেছে যে তারা কোন যুদ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু তার সে-কথা মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জীবনে contraction (সঙ্কোচ)-এর period (সময়) আসে, সেটা extreme-এ (চরমে) গেলে, তখন আবার expansion (বিস্তার)-এর period (সময়) আসে।

হাউজারম্যানদা—যারা কেবল expansion (বিস্তার)-এর পথে চলে, তাদের কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Progress (উন্নতি)-এর মধ্যেও ওঠাপড়া থাকে ঢেউয়ের মতো।

হাউজারম্যানদা—প্রতিবারের নিম্নগতি কি পূর্ব্বের নিম্নগতির থেকে নিম্নতর হয় না তার থেকে উচ্চতর হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের adherence (নিষ্ঠা) ঠিক থাকে, তাদের সাময়িক নিম্নগতির মধ্যেও একটা ক্রমোর্দ্ধতার tendency (প্রবণতা) থাকে, তারা নামতে না নামতেই ওঠার দিকে হাত বাড়ায়। তাদের নিষ্ঠা তাদের বেশী নীচে নামতে দেয় না। তারা সত্বর সচেতন হ'য়ে জোর effort (চেষ্টা) ক'রে balance (সমতা) regain (পুনরায় লাভ) করে। ঐ effort (চেষ্টা) অনেক সময় তাদের higher pitch-এ (উচ্চতর স্তরে) উপনীত ক'রে দেয়। Accidental elevation (হঠাৎ উন্নয়ন) হয় যাদের, তাদের হয়তো খুব উন্নতি হ'লো, আবার চরম পতন হ'লো। Egoistic (অহংকেন্দ্রিক) উন্নতির ফল প্রায়ই এমনতর হয়। যেমন হিটলার।

হাউজারম্যানদার মা—অনেকে এতখানি নেমে যায় যে চেষ্টা সত্ত্বেও উঠতে পারে না, তখন অন্যকে দায়ী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যকে দায়ী না ক'রে নিজের দোষ আবিষ্কার ক'রে সংশোধন করলে কাজ হয়। কিন্তু egoistic obsession (অহংকেন্দ্রিক অভিভূতি) থাকলে প্রায়ই সে-দিকে নজর যায় না।

প্রফুল্ল—Contraction (সংকোচন)-এর পর expansion (বিস্তার) না হ'য়ে annihilation (নিধন)-ও তো হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তাদেরই বেশী হয়, যাদের শ্রেয় কাউকে ধরা না থাকে।

কেষ্টদা—Extinction (বিনাশ) হ'লেও পরজন্মে আবার expansion (বিস্তার) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যদি আমরা পরজন্মে বিশ্বাস করি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের হঠাৎ একবার খুব কাসি আসলো। কাসির পর জল খেলেন। তারপর বললেন—মনে হচ্ছিল চারিদিক যেন আলোয়-আলোময় হ'য়ে গেছে। যেন সূর্য্যালোকে ঝলমল বেলা দশটা। খুব lovingly (প্রীতির সঙ্গে) নাম করলে চোখের এমন অবস্থা হয় যে সহজেই সবসময় light (আলো) দেখা যায়। একে endowment (বিভূতি) বা vision (দর্শন) বলে। স্পেন্সারের এ জিনিস হ'য়েছিল।

কেষ্টদা—সে সেই অবস্থায় রাত্রে অন্ধকারে ঘড়ি দেখতো স্পষ্ট।

হাউজারম্যানদার মা—ধ্যান-ধারণা কখন কিভাবে করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Do meditate mantra dawn and night, do repeat holy name mentally and meaningfully in all the movements of your daily life, do materialise the direction of your master in due time—that is tapa—the only way to achievement.

(উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।)

হাউজারম্যানদার মা—সব সময় নাম করলে কাজে ব্যাঘাত হ'তে পারে তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন কাজ করতে-করতে গুন-গুন ক'রে গান গাইছে, শিস দিচ্ছে মনের আনন্দে, তাতে কি কাজের ব্যাঘাত হয়? ওতে বরং কাজ ভাল হয়।

হাউজারম্যানদার মা—Worth-while work is worship (হিতকর কাজই পূজা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Work that fulfils Godhood is worship. Love with-

out service is ever sterile. (যে কাজ ঈশ্বরকে পূরণ করে, তাই-ই পূজা। সেবাহীন ভালবাসা সর্ব্বদা বন্ধ্যা।)

আগের প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে কেষ্টদা বললেন—মাকে ভালবাসলে দেখতে পাই মা'র সম্বন্ধে আকুল চিন্তা ও তাঁর প্রীতিজনক কর্ম্ম আপনা থেকেই আসে।

হাউজারম্যানদার মা—মা'র চিন্তা করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না, সমাজের সেবা করলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র চিন্তা আকুলভাবে না করলে, তাঁকে খুশি করবার ধান্ধা না থাকলে he may choose whisky to be his better mother (সে হয়তো হুইস্কিকে তার মা'র থেকে প্রিয়তর ব'লে পছন্দ করতে পারে), তখন কার সেবা কে করে? শ্রেয়ের প্রতি অনুরাগে তাঁতে সক্রিয়ভাবে আবদ্ধ হ'য়ে না থাকলে, passion (প্রবৃত্তি) আমাদের অনুরাগকে আত্মসাৎ ক'রে কোথায় টেনে নিয়ে যায়, তা ঠিক পাওয়া যায় না। ঐ রকম বেহাতি চরিত্র নিয়ে লোকের সেবা করতে গেলে লোক-সেবার অছিলায় নিজের অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির সেবাই মুখ্য হ'য়ে ওঠে।

এরপর কুটির-শিল্পের প্রয়োজনীয়তার বিষয় কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে বললেন—আপনি একজন cottage-industry-expert (কুটির-শিল্প-কুশলী) আমাদের দিতে পারেন?

হাউজারম্যানদার মা—আমার জানা নেই, তবে মিস সাইক্‌স এ-বিষয়ে হয়তো সাহায্য করতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় প্রত্যেক family-তে (পরিবারে) cottage-industry (কুটির-শিল্প) থাকা ভাল। এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকেরই তাতে সাধ্য ও সুযোগমতো অংশগ্রহণ করা ভাল। এতে idle brain (অলস মস্তিষ্ক) থাকে না, প্রত্যেকে efficient (দক্ষ) হয়, normally educated (সহজভাবে শিক্ষিত) হয়, built from within (ভিতর থেকে গঠিত) হয়।

হাউজারম্যানদার মা—যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্য্যন্ত হাতের সুন্দর-সুন্দর কাজ দিয়ে যদি সুরু করা যায়, তাহ'লে কেমন হয়? তাতে কিছু-কিছু লোকের অন্ন-সংস্থানও হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছা আছে। বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম্ম হাতে-কলমে জানে ও শেখাতে পারে এইরকম একজন মানুষ পেলে সুবিধা হয়। প্রত্যেকটা family-তে (পরিবারে) ছোটখাট workshop (কারখানা), laboratory (গবেষণাগার), লাইব্রেরী, sick-room (রোগীর ঘর), cottage-industry (কুটির-শিল্প), horticulture-garden (ফুলফল তরিতরকারীর বাগান) থাকলে জন্মের সাথে-সাথে normally (সহজভাবে) educated (শিক্ষিত) হবার chance (সুযোগ) থাকে সকলের। উঠতে-বসতে খেলতে-খেলতেই কত জিনিস শিখে যায়। মাথাটাও ঘোরে চারিদিকে, একটা-না-একটা কিছু ক'রে খেতে পারে।

হাউজারম্যানদার মা—বই বাঁধা, নকসা আঁকা ইত্যাদি শেখান যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঢের আছে। অনেক কিছুই শেখান যায়। আর আমি ভাবি village-professors and not college professors are to educate people in different arts from one village to another (কলেজের অধ্যাপককে নয় গ্রাম্য আচার্য্যমণ্ডলীকে গ্রামে-গ্রামে লোকদের নানা শিল্প শেখাতে হবে)। তাঁরা গ্রামে-গ্রামে বাড়ীতে-বাড়ীতে ঘুরবেন এবং পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী মানুষগুলিকে নানা কাজ শেখাবেন। House-physician (গৃহ-চিকিৎসক)-এর উপর যেমন পরিবারের লোকের চিকিৎসার দায়িত্ব থাকে, এদের উপর তেমনি ভার থাকবে প্রত্যেক পরিবারের লোকের মধ্যে বাস্তব কর্ম্মদক্ষতা সৃষ্টির। প্রত্যেক পরিবার থেকেই তাঁদের ভরণপোষণের জন্য কিছু-কিছু দিতে হবে, যাতে তাঁদের জীবন-চলনার পক্ষে কোন অসুবিধা না হয়। পরিবারগুলির স্বতঃস্বেচ্ছ দানের উপর যদি তাঁদের ভরণপোষণ নির্ভর করে, তাহ'লে ঐ আচার্য্যদের স্বার্থই হবে তাদের উচ্ছল ক'রে তোলা, আবার পরিবারগুলিও কিছু-কিছু খরচ করার দরুন শিক্ষাগ্রহণে actively interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) হবে। এতে উভয়তঃই ভাল হবে। তা না হ'য়ে এরা যদি সরকারী চাকুরে হয়, তাহ'লে কিন্তু পরস্পর অতখানি আগ্রহশীল হবে না। আপনি কী বলেন, ঐভাবে যদি নিজেদের চেষ্টায় ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে ভাল হবে না ?

হাউজারম্যানদার মা—খুব ভাল হবে। আর-একটা কথা আমার মনে হয়, অন্যান্য জনকল্যাণকর সংস্থা যে-সব এদেশে আছে তাদের সঙ্গে সৎসঙ্গের খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। পারস্পরিক সহযোগিতায় অনেক কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিরোধ থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এমন kinship (আত্মীয়তা) establish (স্থাপন) করা চাই, যাতে কেউ কাউকে পর মনে করতে না পারে। আমি বুঝি, সকলের স্বার্থই আমার স্বার্থ, সকলের ভালই আমার ভাল।

হাউজারম্যানদার মা—আমি বিশ্বাস করি, এদিকে যে আশ্রম গ'ড়ে উঠবে, তা পাবনা আশ্রমের মতো কর্ম্ম ও কৃষ্টির সমন্বয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে উঠবে। পাবনা আশ্রমে যেমনটি ছিল, তার মধ্যে ভারতের বহু সমস্যার সমাধান নিহিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বললেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন।

মা এই কথা শুনে যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। পরে গভীর আবেগভরে বললেন—ভগবান আপনার সহায়।

এরপর ও'রা বিদায় নিলেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—দুটো কথা মনে রাখবি। বেছে-বেছে আট-দশ হাজার সৎসঙ্গীর একটা লিস্ট করবি যারা আমি চাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ industrial ও

agricultural move (শিল্প ও কৃষি-প্রচেষ্টা)-এর জন্য দশ টাকা থেকে ত্রিশ টাকা দিতে পারে। কতদিনে কি করা যাবে, তা' বলতে পারি না, তবে প্রস্তুত থাকা লাগে। আর, প্রত্যেক ঋত্বিক্-অধিবেশনের সময় যাতে খুব বেশি সংখ্যক লোক এখানে আসে লোককে ব'লে ও কর্ম্মীদের কাছে চিঠিপত্র লিখে তার ব্যবস্থা করবি।

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ! তবে ঋত্বিক্-অধিবেশনের সময় বহু লোক আনার কথা যে বলছেন, তাতে একটু অসুবিধা আছে। বহু লোক আসলে তাদের একটু স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-ব্যবস্থা যতদূর যা' সম্ভব করা লাগবে। আর, তোমাদের দরদ, আত্মীয়তা ও আপ্যায়না এমন হওয়া লাগে যাতে মানুষ অসুবিধাকে অসুবিধা ব'লেই মনে না করতে পারে।

প্রফুল্ল—আপনি যে সব কাজ করতে বলেন, তাতে অনেকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন এবং বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন লোকের উপর দিয়ে সেইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে হ'চ্ছে কিনা তা দেখার লোক থাকা প্রয়োজন। কর্ত্তা-ব্যক্তি যাঁরা, যাঁদের হাতে আর্থিক ক্ষমতা আছে, তাঁরা এদিকে নজর দিলেই সব কাজ সুশৃংখলভাবে হ'তে পারে। অবশ্য আমাদেরও ত্রুটি আছে। আমরা সবাই তেমন দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য নই। আবার, কেউ কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে কাজ না করলেও, কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুবিধা কর্ত্তৃপক্ষের নেই। তাই ঢিলেঢালা রকমে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ করাতে হয় মানুষকে উৎসাহ দিয়ে, স্ফূর্ত্তি দিয়ে, তারিফ করে। ব্যক্তিগতভাবে সহকর্ম্মীদের ভালবেসে ও সেবা দিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে এমন হৃদ্যমধুর সম্পর্ক পাতাতে হয় যে ঐ ভালবাসার জোরেই যেন আগ্রহদীপ্ত সক্রিয় সহযোগিতা অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। প্রত্যাশা বা ভয় থেকে মানুষ যে কাজ করে, সে-কাজের মধ্যে মানুষ কখনও প্রাণ ঢেলে দেয় না, কিন্তু ভালবাসা থেকে মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে মানুষ মন-প্রাণ-সত্তা ঢেলে দেয়। তার ধুনই আলাদা, রকমই আলাদা। সে-কাজে বগবগানি থাকে না, অনুযোগ থাকে না, অভিযোগ থাকে না, লোকদেখান ভাব থাকে না, কথায়-কথায় ক্লান্তি ও অবসাদ থাকে না। সে-কাজের সর্ব্বাঙ্গে তৃপ্তির তরতরে স্রোত। মানুষ যে কতখানি পারে তা' বোঝাই যায় না যত সময় সে ভালবাসার টানে কাজ না করে। আশ্রমে তো একসময় মানুষ একবেলা খেয়ে দিন-রাত খেটেছে, আর আনন্দে টগবগ করেছে।

২৭শে পৌষ, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১২।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলঘরে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), হরেনদা (বসু), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শরৎদা—'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'—কথাটি কি সব গুরুর বেলায় খাটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Prophet (প্রেরিতপুরুষ) বা সদ্গুরুর বেলায় ও-কথা খাটে।

তাঁকেই ওখানে mean (সূচিত) করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ বর্ত্তমান মহাপুরুষের মধ্যেই পূর্ব্বতন প্রত্যেকে জাগ্রত ও কেন্দ্রীভূত হন। ঐটে হ'লো test (পরখ)। তিনি কখনও কোন বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ পূর্ব্বতন মহাপুরুষকে অস্বীকার করেন না। বরং প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হন। তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন প্রত্যেক মহাপুরুষের trait (গুণ)-ই খুঁজে দেখলে পাওয়া যায়। ও বস্তুই আলাদা।

শরৎদা—প্রেরিত পুরুষ বা অবতার মহাপুরুষ সম্বন্ধে একটা definition (সংজ্ঞা) সুস্পষ্টভাবে ইংরাজীতে দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ওগুলির উপর আমার কোন control (দখল) নেই। বোধ হয় আপনারাই করান, পরমপিতার দয়া, আমি কিছু জানি না।

শরৎদা—কাল হাদীসে পড়ছিলাম বন্ধু করতে গেলে বংশ দেখে করা উচিৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই নাকি? কথাটা নোট ক'রে (টুকে) রাখবেন। ভাল ক'রে খুঁজে দেখেন, সবারই এক কথা। যদি বিয়ে-থাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-আচরণে গোল না ঢোকে তাহ'লে বংশের ধারা সন্তান-সন্ততির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেই। বিয়ে বড় কঠিন ব্যাপার, সবর্ণ বিয়ে হ'লেই যে সব সময় সন্তান ভাল হবে, তার কোন মানে নেই। স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গতি থাকা চাই। স্বামী হয়তো খুব ভাল, কিন্তু স্ত্রী হয়তো বিরুদ্ধ প্র. ়তর, স্বামীকে ভাল ক'রে ধ'রে উঠতে পারে না, এ-সব জায়গায় সন্তানের প্রকৃতি গোলমেলে হওয়া সম্ভব। কতকটা অব্যবস্থ ধরণের হয়। কখনও ভাল, কখনও খারাপ। একটা সাম্যসঙ্গত ধাঁজ একটানাভাবে চলে না।

হরেনদা—একটা বইয়ে পড়েছিলাম, আগে প্রত্যেক বর্ণ থেকে minister (মন্ত্রী) নেওয়া হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ও-থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলাম, তখন মন্ত্রিসভায় অন্ততঃ পাঁচজন থাকতেন। চার বর্ণের চারজন এবং উপরে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ একজন।

কেষ্টদা—বর্ত্তমান যুগে চতুরাশ্রম প্রথা কী-ভাবে চালু করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তারপর গার্হস্থ্য আশ্রম, পরবর্ত্তীকালে একটা বয়সের পর সংসারের ভার ছেলেপেলের উপর দিয়ে লোকসেবা ও তপস্যার দিকে ঝুঁকে পড়লে হয়। প্রথমে দীক্ষিতের সংখ্যা খুব বাড়াতে হয় আর এমন একটা climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি করতে হয় যাতে লোকে কৃষ্টির প্রতি খুব অনুরক্ত হয়। কোটি-কোটি লোকে যদি এইভাবে ভাবিত হয়, তখন দেখবেন সমাজ ও রাষ্ট্রও আপন স্বার্থেই কল্যাণকর প্রথাগুলি স্বাভাবিকভাবে adopt (গ্রহণ) করবে। কিছুই চাপিয়ে দিতে হবে না উপর থেকে।

কেষ্টদা—বানপ্রস্থী মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বানপ্রস্থী মানে bigger (বৃহত্তর) গৃহস্থ। প্রত্যেক গৃহস্থের যাতে সব রকমে ভাল হয়, তাই দেখাই তার কাজ। আগে গ্রামের মাতব্বরদের দেখতাম প্রত্যেক বাড়ীতে-বাড়ীতে যেয়ে খোঁজ-খবর নিতেন, বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন, বিপদে-আপদে

সকলকে দেখতেন-শুনতেন। উঠোনে হয়তো একটা লাউগাছ আছে, গোড়াটায় পোকা ধরেছে, গোয়ালে একটা গরু হয়তো খুব হাগছে—এইসব জিনিসের প্রতিকার কিসে হয়, তখন-তখনই ব'লে দিতেন। একজনের একটা মেয়ে হয়তো বড় হয়েছে, নিজেই পাত্রের সন্ধান ক'রে বিয়ের যোগাযোগ ক'রে দিতেন। নজর না দিতেন এমন দিক ছিল না। কোথাও হয়তো দুই ভাইয়ে একটা মামলা হবার উপক্রম। নিজেই মধ্যস্থ হ'য়ে মিটমাট ও মিলমিশ ক'রে দিতেন। বাড়ী-বাড়ী টহল দিতেন আর যেখানে যেমন প্রয়োজন তাই করতেন। বৃহত্তর পরিবেশের এমনতর সেবা-পরিচর্য্যা যেমন দরকার তেমনি দরকার ব্যক্তিগত সাধন-তপস্যা। তপশ্চর্য্যায় মানুষ নির্ম্মলচরিত্র হয়। মানুষের চাল-চলন-চরিত্র যত সাফ হয়, প্রবৃত্তি-অভিভূতিমুক্ত হয়, ততই তাদের দৃষ্টান্তে মানুষ উপকৃত হয়। একজন প্রকৃত সৎমানুষের সঙ্গ-সাহচর্য্যলাভ করাও মহাভাগ্যের কথা। তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টির আলোয় অনেক অন্ধকার কেটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তিলক, ভগবানদাস, মালব্যজী প্রভৃতির কথা যেমন শুনি, তাতে আমার এঁদের প্রতি খুব শ্রদ্ধা হয়। এঁরা সব দিকপাল, কিন্তু কৃষ্টিকে ভোলেননি। নিজ কৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা না থাকলে মানুষের চরিত্র মহৎ হয় না। নিজের কৃষ্টিকে যে শ্রদ্ধা করে সে অপরের কৃষ্টিকেও শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না। আর, কৃষ্টি-সম্বন্ধে শুধু intellectual (বুদ্ধিগত) বুঝ থাকলে চরিত্রের উপর তার ছাপ পড়ে না। আচরণীয় যা' তা' নিত্য শ্রদ্ধাভরে আচরণ করা চাই। তাতেই বুঝ প্রত্যয়ে পরিণত হয়, কথার দাম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে শরৎদাকে বললেন—ঋত্বিকী ২৫০ জনকে দিয়ে তাড়াতাড়ি সই ক'রে ফেলেন। ঋত্বিকী complete (পূর্ণ) হ'লে ভাল-ভাল ঋত্বিক্‌দের বাড়ীতে Special upto-date well-equiped guest-house (আধুনিকভাবে সুসজ্জিত বিশেষ অতিথিশালা) রাখতে হয়। যেমন আপনার বাড়ীতে হয়তো চারজন guest (অতিথি)-এর ব্যবস্থা হ'লো, অন্যান্য বাড়ীতেও যেখানে যেমন সম্ভব ব্যবস্থা থাকলো। এতে লোকগুলি আপনাদের সান্নিধ্যে থেকে যাজিত, আপ্যায়িত ও সম্বুদ্ধ হবার সুযোগ পায়। তবে Special-guest (বিশেষ অতিথি)-দের ঘর এবং আত্মীয়দের জন্য ঘর আলাদা রাখতে হয়।

প্রফুল্ল—বাইরের একজন প্রখ্যাত কর্ম্মী এখানে সৎসঙ্গে এসে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে adjusted complex-এর (নিয়ন্ত্রিত বৃত্তির) activity (কর্ম্ম), আর বাইরে বহুস্থানে disintegrated complex-এর (বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তির) activity (কর্ম্ম)। প্রবৃত্তির উন্মোচনায় একটা মানুষের ভীমকর্ম্মা হ'তে আটকায় না। তাতে ভিতরের কাম-কামনা ও দুর্ব্বলতার সায় থাকে। তাই মানুষ যেন উড়ে চলে। কিন্তু যেখানে নিজ খেয়াল-খুশিকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে অস্বীকার ক'রে প্রবৃত্তিপরায়ণ মনের কাছে ভাল লাগে না এমনতর কাজ

করতে হয় আর-একজনের খুশির দিকে চেয়ে—তখন সেখানেই লাগে প্রকৃত will-power (ইচ্ছাশক্তি)। নিজেকে শাসন করতে যে প্রস্তুত থাকে, তার কিন্তু তত অসুবিধা হয় না। সে ভাবে—আমি তো জানি না কিসে আমার মঙ্গল, তাই ঠাকুর যা' পছন্দ করেন, তা' আমি করবই, তাতে আমার যত কষ্টই হো'ক। একজন যদি অনেক বড়-বড় কাজও করে অথচ প্রকৃত গুরু ব'লে তার সামনে কেউ না থাকেন এবং থাকলেও তাঁকে অনুসরণ না করে, তাহ'লে ঐ-সব কাজের ভিতর-দিয়ে তার character-এর (চরিত্রের) কিন্তু বিশেষ evolution (বিবর্ত্তন) হয় না। মানুষ তার pet weakness (প্রিয় দুর্ব্বলতা)-গুলির গায় হাত না দিয়ে, সেগুলি পুষে রেখে চলতে চায়। কিন্তু critical moment-এ (সংকটজনক সময়ে) এগুলি যে কী সর্ব্বনাশ ঘটাতে পারে তা' সে জানে না। সদ্‌গুরুর দরবারে ঐ সব ধামাচাপা দেওয়া ব্যাপার চলে না। তাঁর কাজ হ'লো মানুষকে সুস্থ ক'রে তোলা, স্বাভাবিক ক'রে তোলা, দুর্ব্বলতামুক্ত ক'রে তোলা। তা' করতে যা' করা লাগে, তাই তিনি করেন। তাঁর আদত কাজ হ'লো ঐ adjustment of complexes (প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ)। অবশ্য, তিনি যতই করুন মানুষের যদি আত্মসংশোধনের আগ্রহ ও চেষ্টা না থাকে, তাঁর একার চেষ্টায় বিশেষ কিছু হয় না। আর, এখানে adjusted complex (নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি) না হ'লে mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য) নিয়ে move-ই করতে (অগ্রসরই হ'তে) পারে না। যার যতটুকুই হো'ক ক্রমাগত self-adjustment (আত্মনিয়ন্ত্রণ)-এর রকমে চলা চাই। নইলে তার যত গুণপনাই থাক, সে এখানে পাত্তা পাবে না।

প্রফুল্ল—কারও যদি কোন master-passion (প্রভু-প্রবৃত্তি) থাকে, তাতে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'তে পারে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়, তবে passion (প্রবৃত্তি)-টা যতদিন surrenderd (নিবেদিত) না হয়, ততদিন তুমি তার above-এ (উপরে) থাকতে পার না। Superior Beloved (প্রেষ্ঠ)-ই যদি তোমার master-passion (প্রভু-প্রবৃত্তি) হন, তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করাই যদি তোমার libidoic urge (সৌরত-সম্বেগ) হয়, তাহ'লে তুমি বেঁচে গেলে। প্রবৃত্তিগুলিকে কাবেজে আনা তখন তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না, অবশ্য যদি নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে থাক।

শরৎদা—ইংরাজীতে একটা কথা আছে, Expediency is the life of politics (সুবিধা ও উপযোগিতাই রাজনীতির প্রাণ), কথাটা ঠিক কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Principle (আদর্শ) ঠিক থাকবেই, পরিবেষণে expediency (সুবিধা ও উপযোগিতা)-র কথা বিবেচনা করা চলতে পারে। মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য যদি ঠিক না থাকে এবং মানুষ যদি সুবিধাবাদীর মতো গড়িয়ে চলতে থাকে, তাহ'লে সে গড়াতে-গড়াতে যে কোথায় যেয়ে ঠেকবে, তার ঠিক থাকবে না।

কালিদাসদা—রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকে কোন আদর্শের ধার ধারে না, বলে—দেশের কল্যাণই আমাদের লক্ষ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ না থাকলে অকল্যাণ বেড়ে যায়। কল্যাণ কাকে বলে সেটাই তুমি জানলে না। আর তুমি কল্যাণ করবে! এইসব রাজনৈতিক আন্দোলন আর শিবাজীর রাজনৈতিক আন্দোলন—এ দুইয়ের মধ্যে ঢের ফারাক। শিবাজীর সব শৌর্য্য, বীর্য্য, চাতুর্য্যের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল গুরু রামদাসকে পূরণ করা। পরে যখন রাজা হ'লেন, রাজ্য দিয়ে দিলেন গুরুকে। গুরু আবার শিবাজীর উপর ভার দিলেন তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্য চালাতে। শিবাজী গৈরিক পতাকাকে গুরুর প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর হ'য়ে রাজ্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। অনাসক্তি আর কাকে বলে? রাজা না সন্ন্যাসী বোঝা যায় না, অথচ রাজকার্য্যে এতটুকু অবহেলা নেই। এমনতর না হ'লে মানুষ passion (প্রবৃত্তি)-এর above-এ (ঊর্দ্ধে) থেকে ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারে না। ক্ষমতা পাওয়ার আগ পর্য্যন্ত মানুষ তপস্বীর মতো থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়ে তপস্বীর মতো চলে কয়জন? তখনও যদি তপস্বীর মতো চলে, তবে বোঝা যায় মানুষটা খাঁটি। আদর্শ না থাকলে এবং তীব্র আদর্শানুরাগ না থাকলে এটা সম্ভব হয় না।

কালিদাসদা—আপনি শ্রেষ্ঠের প্রতি অনুরাগের কথা বলেন, কিন্তু নিকৃষ্ট কারও প্রতি যদি কারও সত্যিকার টান হয়, তাহ'লে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'স্বাতীনক্ষত্রের জল পাত্র বিশেষে ফল।' Superior Beloved (শ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠ) হ'লে rational adjustment (যৌক্তিক বিন্যাস) পর্য্যায়ক্রমে বেড়ে চলে, কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে সেটা এমনভাবে ঠিক থাকে যে কোন-কিছুই ignored (উপেক্ষিত) হয় না, অথচ imbalance (সাম্যহারা রকম)-ও আসে না। কিন্তু তা' না হ'য়ে wife (স্ত্রী) বা sexual urge (যৌন সম্বেগ) prominent (প্রধান) হ'লে আর-সব adjusted (বিন্যস্ত) হয় সেই অনুযায়ী। সেইটেই প্রধান—তদনুপাতিক আর সব। এতে অনেক সত্তাপোষণী সম্পদ্ হারাতে হয়। নজরই থাকে না সে সব দিকে। কামের কথা বললাম, লোভ হ'লেও ঐ রকম হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন—'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন'। ত্রিগুণও বন্ধন, ত্রিগুণের উপরে উঠতে হবে, একমাত্র ইষ্টকে নিয়েই থাকতে হবে—পরিবেশের সেবাকে সাথীয়া ক'রে। শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।' গুরুর সঙ্গে অদ্বৈত চালাতে গেলে হবে না। তিনি প্রথম এবং প্রধান, তারপর আর যা'-কিছু। এমন হ'লে passion (প্রবৃত্তি) আর mislead (বিপথে চালিত) করতে পারে না।

শরৎদা—ছোট ভাইয়ের বড় ভাইয়ের প্রতি মনোভাব ও ছেলের বাবার প্রতি মনোভাব—সাধারণতঃ এই দুই মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুগত ছেলের বাপের উপর কিছুটা surrender (আত্মসমর্পণ)-এর ভাব থাকে। ছোট ভাইয়ের বড় ভাইয়ের উপর শ্রদ্ধা থাকলেও similar (একরকমের) ব'লে বোধ থাকে। তাই surrender (আত্মসমর্পণ)-এর ভাব আসা কঠিন হয়।

ভাইয়ের denial attitude, ingratitude (অস্বীকার করার মনোভাব, অকৃতজ্ঞতা) খুব কষ্টদায়ক লাগে, ছেলের চাইতেও বেশী লাগে। বড়ভাই আমার সরিক এমনতর বোধ থাকায়, তার সম্পর্কে কিছুটা inferiority (হীনম্মন্যতা) থাকে। তার দ্বারা উপকৃত হ'লেও সেটা স্বীকার করতে যেন বাধে। সবাই একরকম নয়। তাই generalise করা (সাধারণভাবে বলা) যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলঘরে বিছানায় ব'সে আছেন। আশেপাশে অনেকে আছেন।

এমন সময় দুর্গানাথদা (সান্যাল) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বসেন দুর্গানাথদা। শীতের মধ্যে আসতে কষ্ট হ'লো না তো ?

দুর্গানাথদা—বেলা থাকতে আসছি। এখন চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে চ'লে যাব।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুর্গানাথদা অসময়ে আমাদের যেভাবে রক্ষা করেছে, সে-কথা আমি ভুলতে পারি না। সুদে-আসলে মডেল কোম্পানীতে বাবার দু'হাজার টাকার উপর দেনার দায়ে আমাদের বিষয়-সম্পত্তি যেতে বসেছিল, সেই সময়ে দুর্গানাথদার দানে আমরা উদ্ধার পেয়েছিলাম। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়—আমি দুর্গানাথদার জন্য বিশেষ-কিছু করতে পারিনি।

দুর্গানাথদা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন—'দয়াল। ও-কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমার তো কিছুই নেই, সকলে মিলে আপনারটা খেয়েই তো বেঁচে আছি।

এরপর পরিবেশটা কেমন ভাবগম্ভীর হ'য়ে উঠলো, কারও মুখে কোন কথাবার্ত্তা নেই।

একটু পরে হেমপ্রভা-মা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কী খাব রে ?

হেমপ্রভা-মা—আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি খাব, আমি বললে কি ভাল হয় ? তুই বললে কেমন মিষ্টি হয়।

এরপর হেমপ্রভা-মা ছোটমাসীমার (মায়া দেবী) সঙ্গে ঐ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে ঘরে চ'লে গেলেন।

২৮শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ১৩।১।৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় এসে বসেছেন। বড়দা, মণি লাহিড়ীদা, মাণিকদা (মৈত্র) প্রভৃতি কাছে আছেন।

লাহিড়ীদা, মাণিকদা প্রভৃতি কৃষ্ণনগর থাকবেন, না অন্য কোথাও থাকবেন সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে বললেন—আমার কথা হ'চ্ছে, যাকে follow (অনুসরণ) করব, তাকে আমরণ follow (অনুসরণ) করব। কখনও রাম, কখনও রহিম—এমনতর রকম ভাল নয়।

রেঙ্গুনের এক দাদা বললেন—চাকরী ভাল লাগে না, ওতে বড় হীনত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে স্কুলমাষ্টারের মতো হয়, একদিক ছাড়া অন্য সব দিক die out

করে (বিলুপ্ত হ'য়ে যায়)। কিন্তু যারা স্বাধীন ব্যবসায় করে, তাদের পথ খোলা থাকে, মাথা খোলা থাকে, ability (যোগ্যতা) বাড়ে। চাকরী এমন বিশ্রী জিনিস যে এক পুরুষ চাকরী করলেও পুরুষানুক্রমে চাকরীর tendency (ঝোঁক) আসে। বি-এ পাশ রিক্সাওয়ালা দেখেছিলাম কলকাতায়। জিজ্ঞাসা করায় বলল—'ঠাকুরদাদা, বাবা, কাকা সবাই চাকরে। তাদের দশা দেখে মনে হ'লো, অন্য যা'-কিছু পারি করব, কিন্তু চাকরীর মধ্যে কিছুতেই ঢুকব না। আর কোন সুবিধা না পেয়ে শেষটা এই করছি।' মুখে কিছু বললাম না, মনে-মনে ভাবলাম—পূর্ব্বপুরুষের চাকরীর পাপে আজ তুমি রিক্সাওয়ালা হয়েছ, যাহোক এটা তবু স্বাধীন ব্যবসায়ের অন্তর্গত, এতে তুমি উন্নতির পথ পেলেও পেতে পার।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি কোন লোককে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোক আপনজন ব'লে মনে ক'রে সমর্থন করে, তাহ'লে বুঝতে হবে সে সমাজের একজন শিষ্ট স্বাভাবিক প্রতিনিধি। গণতন্ত্র এবং নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে এমন লোক আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। যে-লোক যত বেশী লোকের স্বার্থকে নির্ব্বিরোধভাবে পক্ষপাতশূন্য রকমে পূরণ করতে পারে, সে-লোক তত ক্ষমতাবান এইটে ধ'রে নিতে হবে। যাদের মধ্যে ক্রূর শত্রুতা বিদ্যমান, তারাও স্বার্থসংঘাতের সময় অমনতর লোকের বিচার-বিবেচনা ও সমাধান মেনে নিতে আগ্রহশীল হয়। কোন লোক যদি খেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে বিশেষ কতকগুলি লোককে পছন্দ করে এবং বিশেষ কতকগুলি লোকের উপর বিরূপ হয়, তার ঐ প্রকৃতি তাকে এমনতর অভিভূত ও সংকীর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ক'রে তোলে যে, সে নিরপেক্ষভাবে কোন বিরোধ মেটাতে পারে না। সে কোন-না-কোন পক্ষের সঙ্গে identified হ'য়ে (মিশে) যায়, তাই তাদের দোষত্রুটি কিছু থাকলে তাও সংশোধন করতে পারে না, অন্য পক্ষের উপরও সুবিচার করতে পারে না। অনেকে লোকের বৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে popular (জনপ্রিয়) হ'তে যায়, তাতে আশু কিছুটা কৃতকার্য্যতা আসলেও পরে তাদের ঐ-সব লোকের খপ্পরে প'ড়ে যেতে হয়। মানুষের বৃত্তির ক্ষুধার কি কোন শেষ আছে ? যে তার খোরাক জোগায়, সে যদি কোনদিন অপরাগ হয়, তখন লোকের ঐ বৃত্তিক্ষুধা ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাকেই খেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়। ধর, একজনকে তুমি ক্রমাগত টাকা দাও, অথচ সে কিছু করে না তোমার জন্য। এতে প্রথমে জন্মাবে প্রত্যাশা। পরে প্রত্যাশা দাবীতে পরিণত হবে। আর, ঐ দাবী যদি তুমি কোনদিন পূরণ করতে না পার তোমার নিন্দামন্দ তো সে করবেই, এমন-কি তোমার প্রাণও বিপন্ন হ'য়ে যেতে পারে তার হাতে। বাইরের লোকের কথা ছেড়ে দিলাম। এমন-কি পরিবারের লোকের চাহিদা মেটাতে গেলেও হিসাব ক'রে মেটাতে হয়। যখন দেখলাম চাহিদা খেয়ালী রকম ধরছে, তখন হাত টান দিতে হয়। আবার, যখন প্রত্যাশা করছে না, তখন হয়তো হাউশ ক'রে কিছু দিতে হয়। পরিবারের লোক পরস্পর পরস্পরের জন্য যাতে ত্যাগ স্বীকার করতে শেখে তেমনভাবে প্রত্যেককে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়। স্বার্থান্ধ ভোগপ্রবণতার প্রশ্রয় দিলেই মানুষকে জাহান্নমে দেওয়া হয়।

সুধাংশুদা (মৈত্র) আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—আমি ভাবি village-professors (গ্রাম্য আচার্য্যগণ) যদি থাকে আর তারা যদি গ্রামে-গ্রামে বাড়ীতে-বাড়ীতে গিয়ে মানুষগুলিকে উপার্জ্জনী কর্ম্মদক্ষতায় দক্ষ ক'রে তোলে, তাহ'লে দেশের লোকের দারিদ্র্য দূর করার একটা বাস্তব ব্যবস্থা হয়। শুধু কাজ শেখালেই হয় না, সঙ্গে-সঙ্গে দরকার হয় লোকের ভিতর সদ্‌গুণ গজিয়ে তোলা। তার জন্য দরকার ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করা। যে-কোন মানুষের পক্ষে যে-কোন কাজের পক্ষে এটা হ'লো prime necessity (প্রাথমিক প্রয়োজন)। ওর উপর দাঁড়িয়ে যেখানে যে-ব্যাপারে যা' করণীয় তা' করতে হবে। প্রত্যেকটা বাড়ীতে নানারকম কর্ম্মের ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রত্যেকটা বাড়ীতে থাকবে কামারশালা, কাঠের কাজ, ছোটখাটো কারখানা, ল্যাবরেটরি, কুটির-শিল্প, গোপালন-ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, কৃষিক্ষেত্র, ঢেকী, জাঁতা, চরকা, তাঁত, রোগীর জন্য আলাদা ঘর, রোগী-শুশ্রূষা শিক্ষার ব্যবস্থা। খাদ্য-বিজ্ঞান, টোটকা চিকিৎসা, প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগী-শুশ্রূষা ইত্যাদি সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েদের বিশেষ ক'রে মেয়েদের শিক্ষিত ক'রে তোলা দরকার। ঐ যে বললাম village-professor (গ্রাম্য আচার্য্য)-এর কথা। সে হবে চৌকষ লোক। তার সব কাজ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা চাই। সে ঝোঁক বুঝে-বুঝে প্রত্যেককে হাতে-কলমে কর্ম্মদক্ষ ক'রে তুলবে। আর, সঙ্গে-সঙ্গে গজিয়ে তুলবে আত্মবিশ্বাস। যে যে কাজই করুক না কেন তা' শুধু গতানুগতিকভাবে করবে না। তার মধ্যে একটু উদ্ভাবনী এৎফাঁকী বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে হবে, যাতে নূতন-নূতন experiment (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) ক'রে শেখা ও করাটাকে ক্রমোন্নত ক'রে তোলার আগ্রহ হয়। Active inquisitive urge (সক্রিয় অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ আকূতি) ও serving zeal (সেবাপরায়ণতার উদ্যম) যদি থাকে তাহ'লে efficiency ও enjoyment (দক্ষতা ও আনন্দ) দুই-ই এগিয়ে চলে। তোমরা যদি এদিকে মাথা দাও, তাহ'লে কাজের কাজ হয়।

রাজেনদা (মজুমদার) ও প্রকাশদা (বসু) আসলেন। একটা কাজের ব্যাপারে তাঁদের যা' করণীয় ছিল, সময়মতো তাঁরা তা' করতে না পারায় শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখিত হন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বল তো কী করলে ঠিক হ'তো ?

উভয়ে তখন বললেন—আমরা একে অপরের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত রয়েছি, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখিনি তিনি তা' করছেন কিনা। যে-কোন একজন তৎপর হ'য়ে খোঁজখবর নিয়ে কাজটা সময়মতো করলেই হ'তো। যাহোক, এখন যা' করা সম্ভব, তা' আমরা উভয়েই মিলিতভাবে দায়িত্বসহকারে করব। সত্যিই আমাদের দোষ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের ত্রুটি যখন ধরতে পেরেছ, তখন আর ভাবনা কি ? নিজেদের ভুল যারা বুঝতে পারে ও সারার চেষ্টা করে, তাদের ভুল ক্রমেই সারে।

২৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ১৪।১।৪৮)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। কাছে ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), কালীদা (সেন) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন।

কাজলভাইয়ের কবচটা ছিঁড়ে গিয়েছে। তিনি কালীদাসীমার কাছে সেটা রেখে চ'লে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওটা এখনই তো ঠিক ক'রে প'রে ফেলা ভাল। যখন যা' করবার, তৎক্ষণাৎ তা' করা ভাল। তাতে বহু ঝামেলা কমে, জ্ঞান বাড়ে। কোন কাজ ফেলে রাখলে পরে অনেক অসুবিধা হ'তে পারে। ধর, আলগা কবচটা যদি কোনভাবে হারিয়ে যায়, তখন কি করবে? তুমি বরং তাড়াতাড়ি ক'রে তোমার মা'র কাছ থেকে একটু সুতো নিয়ে আস।

কাজলভাই সুতো নিয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কাছে দাও। তোমার কবচটাও আন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই কাজলভাইকে কবচটা পরিয়ে দিলেন। কাজল কবচ প'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে খেলতে চ'লে গেলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—লিখবি নাকি? এই ব'লে ইংবেজীতে বললেন—Nature is ordained to resist and rule evil and nurture existence to exist (প্রকৃতির বিধান হ'লো অসৎকে নিরোধ ও শাসন করা এবং অস্তিত্বকে টিকে থাকতে পোষণ দেওয়া)।

প্রশ্ন উঠলো—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি বহু প্রকারের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে, সেগুলি তো অস্তিত্বের পক্ষে সব সময় কল্যাণকর নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিসাব ক'রে দেখ গিয়ে যে-সব জিনিসকে অকল্যাণকর ব'লে মনে করছ, সেগুলি শুধু অকল্যাণকর নয়, ও-গুলির মধ্যেও কল্যাণের উপাদান রয়েছে ঢের। তা'ছাড়া, মনুষ্য-প্রকৃতিও প্রকৃতির অন্তর্গত। তার সব সময় চেষ্টা রয়েছে বাধাকে বাধ্য ক'রে সত্তাকে সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন করার। মানুষের এই প্রকৃতিগত প্রবণতাই হ'লো ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। এই স্বাভাবিক প্রকৃতি যত সতেজ থাকে ততই অমঙ্গলকর যা' তার মাঙ্গলিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। এতেই balance (সমতা) ঠিক থাকে। মানুষ প্রকৃতির দাস হয় না, প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে শেখে। এইভাবেই তার অজ্ঞতা দূর হয়, শক্তি ও জ্ঞানেব পাল্লা যায় বেড়ে। মানুষের যদি চিন্তা না করতে হ'তো, চেষ্টা না করতে হ'তো, নূতন-নূতন সমস্যার সমাধান না করতে হ'তো, তাহ'লে মানুষ এগুতে পারত না। পরমপিতার বিধানের মধ্যে সব দিক adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা আছে। আমরা তখনই তার মধ্যে ত্রুটি দেখি যখন মানুষ হিসাবে আমাদের যা' করণীয় ও সাধনীয় তা' না করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাদরে ডাকলেন—ও কালীষষ্ঠি!

কালীষষ্ঠীমা—আজ্ঞে কন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ পৌষ-সংক্রান্তির দিন, বাড়ীতে কী-কী পিঠে করলু?

কালীষষ্ঠীমা লম্বা এক ফিরিস্তি দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই কেঁকালে কি হয়? তোর ক্ষ্যামতা কিন্তু আগের মতোই আছে।

কালীষষ্ঠীমা—ঠাকুর! আপনার দয়ায় রতবল কম ছিল না। মনে আশাও ছিল অনেক। কিন্তু পাকিস্তান হ'য়ে যেন আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা আর ক'স না। দিগগজরা মিলে যে কী বুঝলো আর কী করলো তা' আমি আজও ঠাওর পাই না। দুঃখের পচাল প'ড়ে কি হবি? আবার স্ফূর্ত্তি ক'রে লাগ্।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে গিয়ে বসলেন। হাউজারম্যানদার মা আসলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মন্ত্র কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Mantra is a formulated clue, meditating on which leads to the unfoldment of the cause (মন্ত্র মানে এমনতর সূত্রীকৃত সংকেত, যার ধ্যান কারণকে উদ্ঘাটিত করে)। মন্ত্রের উদ্গাতার প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে অনুরাগভরে নিয়মিত মন্ত্রসাধন করলে wealth of perception (বোধবিভূতি) বেড়ে চলে।

হাউজারম্যানদার মা—বহুপ্রকারের মন্ত্র তো ভারতে প্রচলিত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বীজমন্ত্র শব্দতত্ত্বের ব্যাপার। এক-এক বীজ বোধভূমির এক-একটা স্তরকে represent (সূচিত) করে। তাই বহু মন্ত্র থাকা স্বাভাবিক। কোন স্থূল স্তরের মন্ত্র বা নামকে চরম মনে ক'রে তাতে আটকে থাকলে মানুষের progress (উন্নতি) blocked (রুদ্ধ) হ'য়ে যায়। সেইজন্য যুগ-পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করার কথা অত ক'রে বলে। কারণ, He is the most evolved person in evolution (বিবর্ত্তনের রাজ্যে তিনিই সবচাইতে বিবর্ত্তিত পুরুষ। তিনি যে holy name (সৎনাম) নিয়ে আসেন, তার মধ্যে অন্য সব নাম নিহিত থাকে। তাই ঐ নাম গ্রহণ ক'রে যদি বিহিতভাবে অনুশীলন করা যায়, তা' খুব effective (কার্য্যকরী) হয়।

মা—ওঁ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাও একটা নাম। I think from 'Om' comes 'Amen' (আমার মনে হয় ওঁ থেকে এ্যামেন কথাটি এসেছে)

শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার এখানে কোন অসুবিধা হ'চ্ছে না তো?

মা—না, এখানে মনে হ'চ্ছে আমি নিজ বাড়ীতেই আছি। আমার খুব ভাল লাগছে।

এরপর মা বিদায় নিলেন।

২রা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ১৬।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), অরুণভাই (জোয়ার্দ্দার) প্রভৃতি কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরেজীতে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন।

Let everyone out of an urge to fulfil his Lord be conversantly conscious of his neighbour, province, country and sister-countries and willingly serve them daily with his daily-earnings as his own with every good wish—that is the blessed way to make all adequately inter-interested with every nurture of progressive prosperity.

(প্রত্যেকে প্রেষ্ঠপূরণী আকূতি থেকে তার প্রতিবেশী, প্রদেশ, দেশ ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশ সমন্ধে পরিচিত ও সচেতন হো'ক এবং তার দৈনন্দিন উপার্জ্জন দিয়ে আগ্রহ ও শুভেচ্ছা-সহকারে আপনজনের মতো তাদের প্রতিদিন সেবা করুক—এটাই হ'লো প্রগতিমুখর সমৃদ্ধির পরিপোষণাসহ সকলকে পর্য্যাপ্তভাবে পারস্পরিক স্বার্থে স্বার্থান্বিত ক'রে তোলার আশিস্‌পূত পন্থা)।

কেষ্টদা—মানুষ পারিপার্শ্বিকের ও বৃহত্তর পরিবেশের সেবার কথাটা বোঝে, কিন্তু এর ভিতর আপনি কেন যে ইষ্টার্থপূরণের কথা বলেন সে-কথাটা সকলে ভাল ক'রে ধরতে পারে না। অনেকে মনে করে, ওটা একটা অবান্তর ব্যাপার, ধর্ম্মজগতের একটা চাপান কথা, যার কোন বাস্তব উপযোগিতা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাই হ'লো fundamental (মূল) কথা। ওখানে না দাঁড়ালে আপনার সত্তার স্থিতি কোথায়? পরিবেশ তার নিজ প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে আপনাকে কোথায় কোন্ ভাগাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে সাবাড় ক'রে দেবে, তা' আপনি ঠিক পাবেন না। সত্তাপোষণী সেবা আপনি দিতে পারবেন না যদি আপনার ইষ্টার্থপূরণী ধান্ধা ও দাঁড়া না থাকে। পরিবেশ তখন আপনার সেবাপ্রাণতাকে কাজে লাগাবে তাদের প্রবৃত্তিপোষণার্থে। আপনি বোকা ব'নে যাবেন। ঢের করবেন, কিন্তু কোন মানুষ আপনার asset (সম্পদ্) হবে না। তারাও আপনার বৃত্তিতে তেল মালিশ করার জন্য আপনাকে খুব বাহবা দেবে আর আপনিও তাদের বাহবা পাওয়ার লোভে তাদের আবোল-তাবোল চাহিদা মিটিয়ে চলতে চেষ্টা করবেন। শেষটা আপনার প্রাণের উপর দিয়ে উঠে যাবে। আপনি যখন তাদের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন না, তখন তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে। লাভের মধ্যে লাভ হবে এই। 'পুরস্কার বারাঙ্গনা তিরস্কার।' ফলকথা, মানুষকে সেবা করা হয় তখনই যখনই তার ভিতর যোগ্যতা ও আত্মশক্তির উদ্বোধন ক'রে দেওয়া হয়। ইষ্টানুগ সেবার ভিতর-দিয়েই তা' সম্ভব হয়। ইষ্টানুগ সেবার অঙ্গই হ'লো বহিরঙ্গ সেবার সঙ্গে-সঙ্গে তার ভিতরটা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা, যাতে সে শুধু নিজের স্বার্থ

ও প্রবৃত্তি নিয়ে বিব্রত না থাকে এবং নিজের ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে কাজে লাগাবার তাগিদ বোধ করে। এরজন্য তার ভিতর ইষ্টপ্রাণতা সঞ্চারিত ক'রে তার সত্তায় হাত দিতে হয়। ঐটুকু না করলে সব ব্যর্থ। আমি বলি বাপ-মার প্রতি ভক্তি খুব বড় জিনিস। কিন্তু তাও যদি ইষ্টানুগ পরিণতি লাভ না করে, তাও ব্যভিচারী ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। একটা মালা গাঁথলেন কিন্তু মালার দু'টো দিক যদি একসঙ্গে বেঁধে না দেন, তা' কারও গলায় পরাতে পারেন না। মালা হয়েও তা' মালার কাজ করে না। সেবা বা ভক্তিও তেমনি আলগা ব্যাপার হ'য়ে যায় যদি তা' ইষ্টবাঁধনে বাঁধা না পড়ে। তা' কোন সার্থকতা লাভ করে না। তা'ছাড়া ইষ্টপ্রাণতা না থাকলে মানুষগুলি গুচ্ছ বেঁধে ওঠে না। Inter-interested (পরস্পর-স্বার্থান্বিত) হয় না।

কেষ্টদা—সে তো হ'লো, কিন্তু আপনি এখন যে লেখাটা দিলেন, সেটা বাস্তবায়িত ক'রে তোলার পথ কী? প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে কতখানিই বা করতে পারে পরিবেশ, প্রদেশ, দেশ ও অন্যান্য দেশের জন্য? একটা সাধারণ লোকের আয় কত যে সে এতজনের সেবার জন্য বাস্তবে কিছু করবে? প্রদেশ, দেশ বা বহির্দ্দেশের সঙ্গে ব্যক্তির যোগসূত্রই বা কোথায়? এই কাজ করতে গেলে যে বিপুল সাংগঠনিক আয়োজন দরকার, তারই বা ব্যবস্থা কিভাবে হবে? আপনার অনেক কথা তাই আমাদের কাছে দার্শনিক তত্ত্বের মতো হ'য়ে থাকে। সেগুলির বাস্তব প্রয়োগ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট দায়িত্বসহকারে সচেতন ও সক্রিয় হই না। অথচ আপনি সব সময় চান নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ ও আচরণ। আপনার ভাবা, কওয়া ও করা সমানতালে চলে, আমাদের ধ্যানও কম, করাও নগণ্য, অথচ তোতাপাখীর মতো আপনার কথাগুলি আওড়াই। আমাদের চলন প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের যাজনকে বিদ্রূপ করে। এ বড় সঙ্গীন অবস্থা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Attainable (অধিগম্য) যা' তা' আমরা হয়তো এখনই attain (লাভ) না করতে পারি, কিন্তু আপনার মতো sincere effort (আন্তরিক চেষ্টা) যাদের আছে, তারা এগিয়ে চলবেই। আপনাদের দেখে আবার অনেকে শিখবে। এ-ছাড়া উপায় নেই। আমি বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছি, এখন যে-ক্ষেত্রে যতটুকু ফল ফলতে পারে, সে-ক্ষেত্রে ততটুকু ফলই ফলবে। তবে আমার কথাগুলি থেকে যাচ্ছে, সেগুলি গ্রহণ ক'রে ফলিয়ে তুলবার মতো লোক যত জন্ম নেবে, ততই পৃথিবীর চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু আপনি আমি হয়তো তা' দেখতে পাব না। এ-সব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি তাই কার্পণ্য না ক'রে পরমপিতা যা' যোগাচ্ছেন তা' অকাতরে দিয়ে যাচ্ছি। পরমপিতার দয়ায় এগুলি ফলপ্রসূ হবেই, যেখানে যখন যেমন ক'রে যতটুকু হ'তে পারে, ততটুকুই। কতকগুলি মানুষ যে এ-সবের অপব্যবহার না করবে, তাও নয়। তার উপর মানুষের হাত নেই। তবে positive (ইতিবাচক) করা যত বাড়বে, ততই মানুষ উপকৃত হবে। আজকের লেখাটা বাস্তবে প্রয়োগ করার উপায় হ'লো, ইষ্টভৃতির সব ক'টা factor (দিক) যাতে প্রত্যেকে ভাল ক'রে observe (পালন)

করে, সেইভাবে সকলকে প্রবুদ্ধ করা। তার মধ্যে ভ্রাতৃভোজ্যের কথাও আছে, বৃহত্তর পরিবেশের সেবার কথাও আছে। এইটের range (সীমা) যদি বেড়ে চলে, একদিন সারা জগৎকেই আলিঙ্গন করা যায়। ব্যক্তির সামর্থ্য হয়তো সীমিত কিন্তু সেই সীমাই প্রসারিত হ'য়ে চলে যদি তার active love ও vision (সক্রিয় প্রীতি ও দূরদৃষ্টি) enlarged (বিস্তৃত) হয় out of love for the Guru (গুরুর প্রতি অনুরাগের দরুন)। আপনি স্পেন্সার, হাউজারম্যান, মা ইত্যাদিকে যে ভালবাসেন, তাদের জন্য যে করেন, এর ভিতর-দিয়ে কিন্তু আপনার আমেরিকা ও আমেরিক্যানদের প্রতি ভালবাসা বাড়ে। মনে হয় আমেরিকা আমার আত্মীয়ের দেশ, আমেরিক্যানরা আমার আত্মীয়ের স্বজাতি। শুধু আমেরিকা বা আমেরিক্যান ব'লে কথা নয়, সব দেশ ও সব জাতি সম্বন্ধে এই কথা। বিভিন্ন প্রদেশের সৎসঙ্গীদের আপনারা ভালবাসেন, তাদের সঙ্গে আপনাদের প্রীতিপূর্ণ দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক আছে। এতে প্রাদেশিকতা আপনাদের মধ্যে স্থান পায় না। মুসলমান, খ্রীষ্টান সৎসঙ্গীদের প্রতি আপনাদের ভালবাসা ও সেবা অবাধ ও উন্মুক্ত। তার দরুন সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণতা আপনাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আপনারা যা' করতে সুরু করেছেন, তা' যদি যথাযথভাবে এগিয়ে চলে, কালে-কালে তার ফলে world united states (বিশ্ব যুক্ত-রাষ্ট্র) গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছেলেবেলা থেকে ছেলে-মেয়েদের দিয়ে দেওয়াবার অভ্যাস করিয়ে দিতে হয়। তারা ইষ্টকে দেবে, বাবা-মাকে দেবে, ভাই-বোনকে দেবে, অপরকে দেবে, সকলকে সাধ্যমতো সেবা করবে, অপরকে সমীচীন প্রশংসা করবে, সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। এই সবে যত অভ্যস্ত হবে, ততই জীবনে রস পাবে। তাতে সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ চলনের পথে বজ্রকপাট প'ড়ে যাবে। আমরা nurture (পোষণ) দিতে জানি না, তাই তারা বিকৃত পথে পা বাড়ায়।

প্রফুল্ল—কারও জন্মগত সংস্কার যদি খারাপ হয়, সৎশিক্ষা দিলেও সে কি তা' গ্রহণ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ভাল হওয়ার ইচ্ছা প্রায় সবারই আছে, কিন্তু প্রায় মানুষই সময়-সময় prey (শিকার) হয় to their weakness (তাদের দুর্ব্বলতার)। তাই, ভাল প্রবণতাগুলিকে নিদারুণভাবে বাড়িয়ে তুলতে হয় এবং মানুষকে তদনুগ অনুশীলনে engaged (ব্যাপৃত) রাখতে হয় constantly (সর্ব্বদা)। এতে একটা selfsatisfaction ও social approbation (আত্মপ্রশংসা ও সামাজিক প্রশংসা) আসে, মানুষ সেটা maintain (রক্ষা) করার জন্য weakness (দুর্ব্বলতা) avoid (পরিহার) করতে চেষ্টা করে। তবে এহ বাহ্য। ইষ্টকে যখন কেউ ভালবাসে, তখন তিনি যা পছন্দ করেন না তা' সে করতে চায় না। Weakness (দুর্ব্বলতা) বলে—কর্ না ক্যান্? কি হবে ওতে? Sentiment (ভাবানুকম্পিতা) বলে, তিনি এত ভালবাসেন অথচ তাঁর অনীপ্সিত কাজ করব? একটা দ্বন্দ্ব চলে ভিতরে।

ইষ্টনিষ্ঠা যদি প্রবলতর হয়, তাহ'লে সদ্বুদ্ধিই জয়ী হয়। এইভাবেই আসে adjustment (নিয়ন্ত্রণ)।

৩রা মাঘ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৭।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে তক্তপোষের উপর বিছানায় একটা চাদর গায় দিয়ে ব'সে আছেন। বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি কাছে আছেন। এমন সময় হাউজারম্যানদা ও তাঁর মা আসলেন। শিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

হাউজারম্যানদা—ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় কী-ভাবে নির্দ্ধারিত ও নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সবার জন্য অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত। তদুপরি যার যে-বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক, তার সে-বিষয় ভাল ক'রে পড়া উচিত। মানুষ যাই পড়ুক, সে-সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বোধ ও চিন্তাশক্তি যাতে গজায় এবং সেই জ্ঞানকে যাতে practical life-এ (বাস্তব জীবনে) apply (প্রয়োগ) করতে পারে তার ব্যবস্থা করা লাগে। নইলে জানাটা assimilated (আত্মীকৃত) হয় না, জানাটা একটা ভারস্বরূপ হ'য়ে থাকে। জানার অহঙ্কার সৃষ্টি হয় কিন্তু জানাটা সত্তাসঙ্গত হ'য়ে life (জীবন)-কে enrich (সমৃদ্ধ) করে না। তা' হ'তে গেলে চাই আদর্শপূরণী আকুতি। তখন শেখাগুলি তাঁর ও পরিবেশের সেবার উপকরণে পরিণত হয়। এতে গজায় আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রত্যয়। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে পরের চাকর হবার জন্য লালায়িত হয় না। লোকমুখে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনেছি তাতে আমার খুব ভাল লাগে। সেখানকার ছাত্ররা আচার্য্য-সন্নিধানে থেকে যে বোধ, জ্ঞান, দক্ষতা ও চারিত্র্য অর্জ্জন করত, তাতে শুধু তাদের জীবন সার্থক হ'ত না, কর্ম্মক্ষেত্রে তারা যে-সব জায়গায় থাকত তাদের মাধ্যমে জনসাধারণও একটা উন্নত প্রেরণা পেত এবং নানাভাবে উপকৃত হ'ত। নালন্দা একটা দেখবার মতো জায়গা, মহাপবিত্র তীর্থ। যাওয়া ভাল, দেখা ভাল।

হাউজারম্যানদা—এত উন্নত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হ'য়ে গেল কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—History (ইতিহাস) কী বলে, তা আমি জানি না। কিন্তু আমার একটা ধারণা, মানুষ যতই উন্নতিলাভ করুক eugenic adjustment (সুপ্রজননের ব্যবস্থা) যদি correctly maintained (ঠিকভাবে রক্ষিত) না হয়, তবে উন্নতিকে ধ'রে রাখা যায় না। বৌদ্ধ-যুগে এই দিকটা ignored (উপেক্ষিত) হয়েছিল ব'লে মনে হয়। আর, ভারতের উপর বহিঃশত্রুর অত্যাচার, অনাচারও নিতান্ত কম হয়নি। সে-সবগুলি প্রতিরোধ করার মতো শক্তিও ভারতের ছিল। কিন্তু শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে integration (সংহতি) না থাকায়, unity (ঐক্য) না থাকায়, পারস্পরিক শত্রুতা থাকায়, প্রত্যেকেরই বিধ্বস্তির পথ উন্মুক্ত হয়েছে। রাজশক্তির বিপর্য্যয়ে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলিও বিপন্ন হয়েছে। তাই জনকল্যাণ যারা চায়

তাদের চাই সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা। ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শপ্রাণতা, শক্তি, সংহতি, অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতি, শিক্ষা, সুজনন, আর্থিক উন্নতি, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, রাষ্ট্র, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, কূটনীতি ইত্যাদি যা'-যা' প্রয়োজন, সব দিকে সমান তালে সমীচীন নজর রেখে চললে, তবেই কালের প্রভাব অতিক্রম করা যায়।

হাউজারম্যানদা—যে-যুগে যে-প্রগতি হয়, তার প্রভাব অতিক্রম করতে চেষ্টা করা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সে-দিক দিয়ে কালের প্রভাব অতিক্রম করার কথা বলিনি। লোকে বলে, কাল-প্রভাবে অনেক ভাল জিনিস destroyed (ধ্বংসপ্রাপ্ত) হ'য়ে যায়। আমার ধারণা, ভাল জিনিসকে কেমন ক'রে যুগোপযোগীভাবে ধ'রে রাখতে হয় তার বিধি যদি আমরা জানি ও অনুসরণ ক'রে চলি, তাহ'লে সময়ের ব্যবধানে ভালটা annihilated (নষ্ট) না হ'য়ে evolved (বিবর্ত্তিত) হ'য়ে আরো ভাল হবে। সন্তশাস্ত্রে Satanic force (শাতনী শক্তি)-কে কাল ব'লে বর্ণনা করে। শাতন মানেই হ'লো অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা। এই-ই মানুষের কাল। কালের এক মানে যম অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা। অর্থাৎ, কোন সৎ-সংস্থার পরিচালক ও অনুগামীরা যদি অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার পথে গা ঢেলে দেয়, তবে তারা নিজেরাও যেমন মরে ঐ সংস্থাকেও তেমনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এটা কাল বা সময়ের ফল নয়, বিধির অবমাননারূপ Satanic obsession-এর (শাতনী অভিভূতির) ফল। কোন ভাল জিনিসই দীর্ঘদিন টিকবে না, এটা ধ'রে নেওয়া একপ্রকারের fatalism (অদৃষ্টবাদ)।

হাউজারম্যানদার মা—কোন ছেলেকে কলেজে ভর্ত্তি করতে গেলে কোন্ রকম কলেজে ভর্ত্তি করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideal staff (আদর্শ অধ্যাপকমণ্ডলী) যেখানে আছেন, সেখানে দেওয়া উচিত। প্রকৃত আদর্শপ্রাণ, জ্ঞানতপস্বী লোকেরা যেখানে পড়ান, সেখানে স্বতঃই একটা উন্নত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাঁদের আদর্শপ্রাণতা, তাঁদের জ্ঞানপিপাসা, তাঁদের inquisitive urge (অনুসন্ধিৎসু আকুতি) অজ্ঞাতসারে ছাত্রদের মধ্যে চারিয়ে যায়। বড়-বড় দালানকোঠা, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম একটা জায়গায় না থাকলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু জ্ঞানচর্চ্চায় বাস্তবভাবে ব্রতী, তজ্জাতীয় অনুশীলন যাদের নেশার মতো পেয়ে বসেছে, এমনতর শিক্ষাসাধক শিক্ষক যদি কোন শিক্ষালয়ে থাকেন, তাহ'লে তাতেই সেই শিক্ষালয় প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে। শিক্ষালয়ের প্রাণ হ'চ্ছে শিক্ষকগণের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, তাঁদের অতন্দ্র আদর্শাভিধ্যায়না। অমনতর যাঁরা, তাঁদের ছাত্রদের মৌখিক উপদেশ বিশেষ দেওয়া লাগে না। তাঁদের জীবন ও চলন দেখে ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হয়।

হাউজারম্যানদার মা—বড় কলেজ বা স্কুলগুলি সাধারণতঃ ছোট কলেজ বা স্কুল থেকে ভাল মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ছোট-ছোট well-equipped (সুসজ্জিত) কলেজ নিয়ে একটা বড় কলেজ হয়, সেটা ভাল। একেবারে ছোটও ভাল নয়, খুব বড়ও ভাল

নয়, ছোটগুলিকে দিয়ে বড় করা ভাল। তাতে ছোট কলেজের intimacy (অন্তরঙ্গতা) spread করে (ব্যাপ্ত হয়) বড় কলেজে। আমি যেমন বলেছি—village (গ্রাম)-এর মতো জায়গায় Professor of Chemistry (রসায়নের অধ্যাপক) থাকবেন with household laboratory (পারিবারিক গবেষণাগারসহ), Professor of Physics (পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক) থাকবেন with household laboratory (পারিবারিক গবেষণাগারসহ), Professor of Industry (শিল্পের অধ্যাপক) থাকবেন with necessary equipments (প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহ)। এক-একজন অধ্যাপকের বাড়ীতে গিয়ে ছেলেরা শিখবে homely way-তে (ঘরোয়াভাবে)। এইভাবে এক-একটা কলেজের অনেকগুলি centre (কেন্দ্র) থাকবে বিভিন্ন প্রফেসারের বাড়ীতে ছড়িয়ে। ছাত্ররা আবার মাঝে-মাঝে মিলিত হবে central college-এ (কেন্দ্রীয় কলেজে)। সেখানে কয়েকটা compulsory subject (অবশ্য পাঠ্য-বিষয়) পড়ান হবে এমনভাবে, যাতে তা' দিয়ে বিভিন্ন special subject (বিশেষ বিষয়) meaningfully explained ও fulfilled (সার্থকভাবে ব্যাখ্যাত ও পরিপূরিত) হয়। আমি যা' বললাম, তার ভিতর-দিয়ে আমার idea (ধারণা) হয়তো ভাল ক'রে প্রকাশ পেল না। তবে আমার intention (উদ্দেশ্য)-টা যদি আপনারা ধরতে পারেন, তাহ'লে detailed adjustment (খুঁটিনাটি ব্যবস্থা) স্থান-কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন যেখানে যেমন ক'রে নেবার তা' নিতে পারবেন।

কথাপ্রসঙ্গে মা আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে গল্প ক'রে শোনালেন। এরপর ওরা বিদায় নিলেন।

এরপর রাজেনদা (মজুমদার) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ইংরেজীতে ইষ্টায়নী বই ছাপাবার কথা ছিল। ছাপান হ'য়ে গেছে তো ?

রাজেনদা—ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'চ্ছে কিরে ? কইতে পারলি না হ'য়ে গেছে ? গড়িমসি দেখলে আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। আমরা অনেক করি, কিন্তু গতি শ্লথ হ'লে করাগুলি ক্ষতিকেই উপার্জ্জন করে।

রাজেনদা—আজ নিজেদের প্রেস তো নেই। পর-মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়। তাদের পাঁচজনের পাঁচ রকম কাজ হাতে থাকে। কথাও ঠিক রাখে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব তো জানা কথা। এরই ভিতর-দিয়ে সময়-মতো যদি কাজ হাঁসিল ক'রে নিতে পার, তাহলেই না তুমি দক্ষ !

ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব মধুর ভঙ্গীতে হাসছেন। রাজেনদার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণকাড়া ভঙ্গীতে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি কাম বাগায়ে ফ্যালো গা।

যেন একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার বিজলী-ঝলক ঝিলিক দিয়ে গেল তাঁর কথাগুলির ভিতর-দিয়ে।

৪ঠা মাঘ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৮।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় এসে বসেছেন। বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), দেবেনদা (রায়) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে আছেন। বীরেনদা একখানি কবিরাজী বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। পড়ার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি রোগীর যে-যে লক্ষণের কথা বললেন তাতে মনে হয় ঐ জিনিস suitable (উপযোগী) হ'তে পারে। তবে আমার মনে হয়, প্রথমে একখানা চিঠি লিখে জানা ভাল—রোগীর ঘুম কেমন হয়, খাওয়ায় রুচি আছে কিনা, প্রস্রাব যেমন হবার তা' হয় কিনা, কোন্ ধরণের অস্বস্তি বোধ করে, সাময়িক আরাম পায় কিসে, মেজাজ খিট-খিটে হয়েছে কিনা ইত্যাদি। প্রত্যেকটা রোগীই কিন্তু স্বতন্ত্র। দূর থেকে কোন direction (নির্দ্দেশ) দিতে গেলে আগে complete picture (সম্পূর্ণ চিত্র)-টা পাওয়া দরকার।

বীরেনদা—ওদের বিশ্বাস আপনি মুখ দিয়ে কিছু ব'লে দিলে তাতেই অব্যর্থ কাজ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, সমীচীনভাবে চিন্তা ও বিবেচনা ক'রে নির্ভুল direction (নির্দ্দেশ) যদি দেওয়া যায়, তাতে অব্যর্থ কাজ হ'তে পারে। এবং যেই সে direction (নির্দ্দেশ) দিক, তাতেই কাজ হবে। Science is science (বিজ্ঞান বিজ্ঞান)। যেখানে যা' করা বিহিত, সেখানে তা' বিহিতভাবে করলে বিহিত ফল লাভ অনিবার্য্য। আমার intuition-এ (অন্তর্দৃষ্টিতে) যদি কিছু appear-ও করে (আবির্ভূতও হয়) তখনও আমার ইচ্ছা করে যে আপনাদের খাটিয়ে নিয়ে আপনাদের দিয়ে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কিভাবে। আপনাদের knowledge (জ্ঞান) না বাড়লে, experience (অভিজ্ঞতা) না বাড়লে, power of judgement (বিবেচনাশক্তি) না বাড়লে আমার লাভ কী? আমার ইচ্ছা করে যে আপনারা flawlessly (নির্ভুলভাবে) scientific investigation (বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান) করতে শেখেন। আপনাদের আওতায় এই tradition (ঐতিহ্য) চারিয়ে যাক ভাল ক'রে। তাতে অজ্ঞতার অপনোদন হবে। লোকে ভাল থাকবে। সাধন-ভজন ও scientific investigation (বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান) যদি একসঙ্গে চালিয়ে যান, তবে আপনাদের ভিতরও intuition (অন্তর্দৃষ্টি) grow করবে (গজাবে)। তখনও কিন্তু আপনারা লক্ষ্য রাখবেন scientific approach ও interpretation (বৈজ্ঞানিক অভিগমন ও ব্যাখ্যা) যাতে অব্যাহত থাকে। নইলে লোকে আপনাদের দেবতাজ্ঞানে সম্মান করতে পারে, কিন্তু আদতে তাদের ignorant (অজ্ঞ) চলনের গায় হাত দেওয়া হবে না, তাই তাদের স্থায়ী উপকারও করা হবে না।

এমন সময় সুরেনদা (পাল) আসলেন।

তিনি বললেন—গীতার নবম অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।

—এর তাৎপর্য্য কী? এখানে কার্য্যকারণ সম্পর্কটা কী? জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কী? বাস্তব জগতে যা ঘটে তার মধ্যে এর প্রকাশ কী ক'রে বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর বাংলা মানেটা কী বলুন তো?

সুরেনদা—আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর-সহ সব-কিছু সৃষ্টি করে, হে কুন্তি-পুত্র! এই কারণে জগৎ বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মানে তো খুব স্পষ্ট। মূল কথা হ'লো এই যে পুরুষের সত্তাই প্রকৃতির প্রবর্ত্তনায় নানাভাবে বিসৃষ্ট হয়। প্রসব করে স্ত্রী। স্বামীই প্রসূত হয় স্ত্রীতে স্ত্রীর ভাবমাফিক, তাই স্ত্রীকে বলে জায়া, স্বামীই যেন স্ত্রীতে জন্মগ্রহণ করে। একই স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন সন্তানের মধ্যে যে পার্থক্য হয়, তা' সংঘটিত হয় সৃজন-মুহূর্ত্তে নারীর মনোভাবের পার্থক্যের দরুন। বিপরিবর্ত্ততে মানে বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। রতিকালে মায়ের ভাবভূমি, চিন্তা ও চেতনা যেমনতর থাকে তেমনতর বিশিষ্টতাসম্পন্ন সন্তান আবির্ভূত হয়। তাই নিয়ম আছে, যখন-তখন যে-সে ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত হওয়া ঠিক নয়। তাতে সন্তান ভাল হয় না। স্ত্রী যখন সদ্ভাবে ভাবিত থাকে, তার শরীর-মন যখন সুস্থ ও দীপ্ত থাকে ও সে যখন আগ্রহের সঙ্গে স্বামীকে কামনা করে, তখনই উপগত হওয়া উচিত। অন্যথা নয়। স্বভাবতঃ স্বামীর মন থাকবে ইষ্টমুখী, উদ্দামতা নিয়ে বিভোর। স্ত্রী যখন পবিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিয়ে তাকে চাইবে, তখন যদি মিলন ঘটে শুভ সম্বেগের উচ্ছলতার ভিতর-দিয়ে, তখন উন্নত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন সন্তানের আগমনই আশা করা যায়। সন্তানের জন্মদান একটা পরম পবিত্র কাজ। এর জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সাধনা ও সংযম চাই। নইলে পশু-মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্তান জন্মাবে। সুপ্রজনন হ'তে গেলে আবার চাই সুবিবাহ। সঙ্গতিশীল সমীচীন বিবাহ না হ'লে সুসন্তানের জন্ম সুদূরপরাহত। আমাদের দেশে এই fundamental (মৌলিক) দিকটির উপর ঋষিরা খুবই নজর দিয়েছিলেন। তাই আমাদের দেশে সাধারণতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানুষের অভাব হ'তো না। আজ মানুষই খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কারণ বিবাহে গণ্ডগোল। আর, বিয়ে ঠিকমতো হ'লেও স্বামী-স্ত্রীর তপস্যাপরায়ণতা ও বিহিত চলনের অভাবে প্রবৃত্তিপরায়ণ, শ্রদ্ধা-হীন, রুগ্ন, দুর্ব্বল, স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা, ক্ষীণমস্তিষ্ক, প্রতিভাহীন মানুষের আমদানী হ'চ্ছে বেশী ক'রে। এর মধ্যে যোগেযাগে কালে-ভদ্রে ছিটকে-ছুটকে কিছু-কিছু ভাল লোক জন্ম নিচ্ছে, তাই তাদের দৌলতে সমাজ টিকে আছে। নইলে আর বাঁচার পথ ছিল না। বাপ-মা উভয়েরই ভাল হওয়া চাই। বাবা কয়, তার মানে যিনি

বপন করেছেন। তোমার বাবা কে ? তার মানে তুমি যে উৎপন্ন হয়েছ, এই উৎপাদনের বীজ বপন-কর্ত্তা কে ? মা মানে পরিমাপিত ক'রে দেন যিনি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর টান ও গুণগ্রহণমুখরতার তান যখন যেমনতর থাকে, তখন সে তেমনতর ততটুকুই মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারে স্বামীকে তার সন্ততিতে। ঐ টান ও গুণগ্রহণমুখরতার উন্মুখতাই হ'লো measuring agents (পরিমাপনী শক্তি)।

বেলা পড়ে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে গোলতাঁবুতে এসে বিছানায় বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দেবেন (দেবেন মজুমদারদা টি-বি-তে ভুগছেন, মাঝে আরোগ্য-ভবনে ছিলেন) না আসা পর্য্যন্ত ওর বউ কি-ভাবে ঘুরত, মুখের দিকে চাওয়া যেত না, চোখে-মুখে একটা অসহায় ভাব লক্ষ্য করতাম। দেবেন আসতেই কিন্তু ওর চেহারা অনেকখানি বদলে গেছে, যেন হারান মানুষ ফিরে পেয়েছে, সব সময়ই assist (সাহায্য) করছে। দেখে ভাল লাগে। মেয়েরা যদি বুদ্ধিমতী ও শুভদায়িনী হয়, তাহ'লে অতি ভাল, আর বিপরীত হ'লে বিপজ্জনক। পুরুষ তাকে avoid (পরিহার) ক'রেই চলতে চায়, কাছে আসলে বোধ করে যেন একটা ভাল্লুক আসছে। পুরুষ মানুষ বাইরের জগতে অনেক যুঝতে পারে, কিন্তু ঘরে এসে সে মমতার আশ্রয় চায়। সেখানে যদি সে ক্রমাগত আঘাত পায় তাহ'লে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। উৎসাহ-উদ্দীপনা নিভে যায়। ভালভাবে কাজকর্ম্ম করতে পারে না। স্বাস্থ্য ও আয়ুতেও ভাটা ধরে। যে বিবাহ করে অথচ ভাগ্যে লক্ষ্মী বউ না জোটে, অলক্ষ্মী তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে চায়। কিন্তু অটুট ইষ্টনিষ্ঠ যে, পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তাকে কাবু করতে পারে কমই।

প্রফুল্ল—স্বামী যদি হৃদয়হীন, প্রীতিহীন ও বদমেজাজী হয়, তাহ'লে স্ত্রীরও তো ঐ একই দশা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামী যদি অমনতর হয়ও, আর স্ত্রী যদি একটু সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তাকে কিছুদিন সেবা দিয়ে চলে, দেখা যায় স্বামী অন্যের সঙ্গে যেমনতর ব্যবহারই করুক, আস্তে-আস্তে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত সদয় হ'য়ে ওঠে। পুরুষের মুখে হামেশা স্ত্রীর প্রশংসা শোনা যায়। তারা অনেক অল্পতেই খুশি হয়। কিন্তু মেয়েরা যদি নিজেদের থেকে স্বামীকে ভাল না বাসে এবং ঐ ভালবাসা ও আত্মত্যাগের মধ্যেই যে সুখ, তা' যদি উপলব্ধি করতে না পারে, তবে পুরুষের লাখ করা, লাখ ভাল ব্যবহারও তাদের খুশি করতে পারে না। যখনই তাদের বিশেষ কোন চাহিদার পূরণ না হয়, তখনই অনুযোগ-অভিযোগ বিলাপ সুরু ক'রে দেয়। তাই ব'লে আমি একথা বলছি না যে দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পুরুষের কোন দোষ নেই এবং পুরুষের দোষ থাকলে তা' সমর্থনীয়। আমার বক্তব্য হ'চ্ছে, স্বামী ছুটবে তার আদর্শপানে—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও বৃহত্তর পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে, যেখানে যা' করণীয় তা' উপেক্ষা না ক'রে, এবং স্ত্রী ছুটবে স্বামীর পিছনে তাকে তোষণ-পোষণ জুগিয়ে। এমনতর যদি চলে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সহজ ও প্রাণদ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু স্ত্রী যদি চায় যে

স্বামী তাকে তোয়াজ ক'রে চলুক, তার খেয়াল-খুশি তামিল করতেই তার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করুক, সে অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী কেউই সুখী হ'তে পারে না। অনেক সংসারে দেখা যায় স্বামী যেন শুধু যোগানদার, স্ত্রী ছেলেপেলেসহ আপন-আপন খেয়ালে চলে, মা নিজেও খেয়ালী এবং ছেলে-মেয়েদেরও খেয়ালের প্রশ্রয় দিয়ে চলে। আর, প্রত্যেকের খেয়ালের খোরপোষ জোগাবার দায়িত্ব হ'লো পুরুষ মানুষটার। যেখানে সে অপরাগ, সেখানে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত থাকে না। এইভাবে চ'লে স্ত্রী কলে-কৌশলে স্বামীকে জব্দ করতে চায়। ভাবে, তার দলে তার হাতে তো তার ছেলে-মেয়েরা আছে, তার ভাবনা কী? কিন্তু পরে সে দেখতে পায়, যে সন্তান-সন্ততিকে সে ঐভাবে প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করেছে, তারা বড় হ'য়ে প্রথমেই মাকে অবজ্ঞা করতে সুরু করেছে। বাপ তো আগেই বাতিল হয়েছে। এখন তারা বেপরোয়া। তখন স্ত্রী দেখতে পায় স্বামী ছাড়া তার আশ্রয় কোথাও নেই। এত সব কান্ডের পর স্ত্রী স্বামীর দিকে ঝুঁকলে, প্রায়ই দেখা যায়, স্বামী কিন্তু তাকে অনাদর করে না। অনেককে দেখেছি জীবদ্দশায় স্বামীকে যন্ত্রণা দেয়। স্বামী মরে গেলে স্বামীর ফটো পুজো করে। এর মধ্যে ভক্তি কতখানি আছে, তা' আমি বুঝতে পারি না। ভক্তি-ভালবাসা থাকলে সেখানে বাস্তব সহন, বহন, সেবা, আত্মত্যাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকবেই।

আজ সকালে একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অপ্রীতিকর ব্যবহার করাতে তার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গিয়েছিল। এখনও সেই ঝোঁকটা আছে। এখন প্রস্রাব করতে যাওয়ার সময় ট'লে প'ড়ে যাচ্ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমার এখন দরকার তোয়াজী কথা, তোয়াজী ব্যবহার। তা' বেশ nervine (স্নায়ুর পক্ষে পুষ্টিকর) হয়। Hope and success (আশা ও সাফল্য)-এর report (সংবাদ) পেলে ভাল থাকি। Any conflict, any clashing, any thrashing (যে-কোন দ্বন্দ্ব, যে-কোন সংঘাত, যে-কোন আঘাত) অসহ্য লাগে। কিন্তু আমার অবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের সামলিয়ে চলতে গেলে আমার উপর যতটুকু দরদ ও নিজেদের উপর যতটুকু এখতিয়ার থাকা দরকার তাই বা ক'জনের আছে?

কথাগুলি বড় করুণকণ্ঠে বললেন ঠাকুর।

৭ই মাঘ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ২১।১।৪৮)

বেলা ১১টা আন্দাজ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে এসেছেন। কাছে আছেন প্যারীদা (নন্দী), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), সরোজিনীমা, কালিদাসীমা প্রভৃতি। একজন লোকের কথা উঠলো, সে ক্রমাগত গুরু বদলায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—এটা হল আধ্যাত্মিক ব্যভিচার। যে গুরু দেখলাম, তাঁর কাছেই দীক্ষা নিলাম, এতে নিষ্ঠা ব'লে কিছু থাকে না, integration (সংহতি) ব'লে কিছু থাকে না। গুরুকরণ করবার আগে বরং বিচার-বিবেচনা করা ভাল, কিন্তু কাউকে গুরু ব'লে গ্রহণ করবার পর তাঁকে ত্যাগ করা ভাল নয়।

প্রফুল্ল—তাহ'লে এ-কথা বলা হয় কেন যে সদ্‌গুরুকে গ্রহণ করায় গুরুত্যাগ হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু মানে তিনি যাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান অন্যান্য গুরুদেব fulfilment (পরিপূরণ থাকে)। তাই তাঁকে গ্রহণ করায় কাঁরও প্রতি শ্রদ্ধা ব্যাহত হয় না। তিনি কারও ভাবে ব্যাঘাত করেন না। তিনি শ্রদ্ধাভক্তির furtherance (অগ্রগতি) ঘটিয়ে মানুষকে highest realisation-এর (সর্ব্বোচ্চ অনুভূতির) পথে পরিচালিত করেন। তাঁকে পেলে কিন্তু তাঁকে ত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও দীক্ষা নেওয়া চলে না।

এরপর মানসিক ব্যভিচার সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গুরুনির্দ্দেশিত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অবহেলা ক'বে অনেকে নিজের খেয়াল-খুশি মতো তথাকথিত সৎকাজ করে বেড়ায়। হয়তো তীর্থ ক'রে বেড়াচ্ছে, কোথাও মহোৎসবে মেতে যাচ্ছে, কারও বাজার-হাট ক'বে দিচ্ছে, কিন্তু গুরু যা'-যা' করতে বলেছেন, তা' বিস্মরণ হ'য়ে গেছে। এগুলি মানসিক ব্যাভিচারের মধ্যে পড়ে। গুরুকে ত্যাগ করেনি বা সে কথাও ভাবে না, কিন্তু গুরুর নির্দেশগুলি পালন করতে গিয়ে যারা অবান্তর উপপথে বিভ্রান্ত হ'য়ে চলে, তারাও এই দলে পড়ে। বীরেন বিশ্বাসের মতো সৎলোক কম আছে। কিন্তু তার উপর depend (নির্ভর) করা মুশকিল। হয়তো তাকে বলা হ'লো—কলকাতা থেকে একটা ওষুধ কিনে নিয়ে কালই ফেরা চাই। সে বের হবে ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু মাঝ রাস্তায় আরো কতজনের কত ব্যাপারে যে জড়িয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। এবং এর কোনটাই তার নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, প্রত্যেকের ভাল যাতে হয়, তাই করাই তাব উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে আবোল-তাবোল অনেক কিছু করতে গিয়ে তার মূল কাজটাই সে ভুলে গেছে। উপযুক্ত সময়েব মধ্যে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সে কিছুতেই উদ্‌যাপন করতে পারবে না। আমি দেখেছি আমার নির্দ্দেশ যারা যথাসময়ে কাঁটায়-কাঁটায় পালন ক'রে চলে—হাজারো টানে বিক্ষিপ্ত না হ'য়ে, তারা কিন্তু অনেক অবান্তর জটিলতা ও দুর্ভোগ থেকে বেঁচে যায়। পরমপিতাকে নিয়ে thoroughly engaged (পরিপূর্ণভাবে ব্যাপৃত) থাকাই নিয়তির নিগ্রহ যথাসম্ভব অতিক্রম করবার একমাত্র পথ।

৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২২।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলঘরে ব'সে আছেন। প্যারীদা (নন্দী), কালীদা (সেন) প্রভৃতি কাছে আছেন।

একটি মা স্বামীর বিরুদ্ধে প্রায়ই অনুযোগ, অভিযোগ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বলেন—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ক ও ব্যবহার যদি প্রীতিপ্রদ ও আনন্দদায়ক না হয়, তাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য অনুরাগ যদি না থাকে, তবে বিষয়বিত্ত ভোগের উপকরণ নাম-কাম যতই থাক না কেন, তাদের জীবন কখনও সুখী

হয় না। দাম্পত্যজীবনে toleration (সহনশীলতা) ও sympathy (সহানুভূতি) একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের মন-মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। সেইজন্য পরস্পর-পরস্পরের মেজাজ একটু ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য সহকারে বুঝে চললে অনেক ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। মেয়েদের মাথায় এইটে ভাল ক'রে ঢুকিয়ে দিতে হয় যে তার সুখ নির্ভর করে স্বামীকে সুখী করার উপর। মেয়েরা শ্রদ্ধা, স্তুতি, নতি, আদর, সোহাগ, সেবা, সহ্য-ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ইত্যাদির ধার না ধেরে অনুযোগ-অভিযোগ, মান-অভিমান, দাবী-দাওয়া, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে যদি স্বামীকে কাবেজে আনতে চায়, তাহ'লে তারা ঠকে। ঐ মায়ের পেটে যে ছেলে হয়, সেও অবাধ্য হয়। Noble family-র (মহৎ পরিবারের) male and female-এর (পুরুষ ও নারীর) লক্ষণই হ'লো অপরকে তার due (ন্যায্য প্রাপ্য) দিয়ে চলা। এতেই সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

প্রফুল্ল—আমি অপরের প্রতি আমার কর্ত্তব্য করা সত্ত্বেও সে যদি আমার প্রতি তার কর্ত্তব্য না ক'রে অবিচার করে, সেখানে আমার করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে তোমার উচিত তোমার কর্ত্তব্য ক'রে যাওয়া। প্রীতি ও ধৈর্য্য-সহকারে তুমি যদি অপরের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য ক'রে যাও, একদিন হয়তো তার চেতনা জাগতে পারে।

প্রফুল্ল—ধরুন, একজন মনিব এবং আর একজন তার অধীনস্থ কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারী তার যোগ্যতা ও শ্রম দিয়ে মনিবকে উজ্জ্বল ক'রে তোলা সত্ত্বেও, মনিব যদি তাকে উপযুক্ত বেতন না দেয়, এবং তার ফলে কর্ম্মচারীর অস্তিত্ব যদি বিপন্ন হয়, তখন সেই কর্ম্মচারীর কী করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনিবকে তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজনের কথা ভাল ক'রে বোঝান উচিত। তাতেও যদি কিছুতেই না বোঝে, তাহ'লে তার স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত। মনিবরা যে কর্ম্মচারীদের প্রতি সব সময় সুবিচার করে না, তার একটা কারণ হ'লো যে, তারা জানে যে একজন কর্ম্মচারী চ'লে গেলেও ঐ ধরণের কর্ম্মচারী তারা অনেক পাবে। আমি বলি—দেশে এমন ব্যবস্থা হো'ক যাতে বেশীর ভাগ মানুষের পেটের ভাতের জন্য পরের চাকরী করা না লাগে। চাকরী করা ও চাকরী খোঁজার লোক যদি ক'মে যায়, তাহ'লে কোন মানুষ বা কোন সংস্থাই কর্ম্মচারীদের প্রতি অবিচার করতে সাহস পাবে না। অবশ্য, কতকগুলি সংস্থা চালাতে গেলে লোকনিয়োগের দরকার হবেই। সে-সব জায়গায় এমন আইন থাকা উচিত যাতে employer (নিয়োগকর্ত্তা) বা employee (কর্ম্মচারী) কেউ কাউকে অসুবিধায় ফেলতে না পারে। আইনের চাইতে বড় জিনিস লোকশিক্ষা। অপরকে বাঁচার উপযোগী সেবা দিয়ে তবে নিজে বাঁচতে হবে—এই কথাটা সবার মজ্জাগত ক'রে দিতে হবে। আর, এমনতর চলনই ধর্ম্ম। জনমত এমন ক'রে গঠন করতে হবে যাতে ধর্ম্মের এই তাৎপর্য্যকে যারা উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে, তারা যতই হোমরা-চোমরা হো'ক, সমাজে কোন

মর্য্যাদার আসন না পায়। সুস্থ লোকমতের চাপ ব্যক্তির চলবার নিয়ন্ত্রণে অনেকখানি সহায়তা করে। তবে এ-ব্যাপারে সব চাইতে কার্য্যকরী জিনিস হ'লো ব্যক্তির অকপট ইষ্টানুরাগ।

কালীদা—বংশানুক্রমিক ধারা কি পরিবর্ত্তন করা যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ধারণা মূল-ধারার পরিবর্ত্তন হয় না, তবে তার উন্নতি বা অবনতি হ'তে পারে। একই কুমড়োর বীজ এক জমিতে পুঁতে দশ-সেরী কুমড়ো হ'তে পারে, আবার উপযুক্ত জমিতে না পুঁতলে সেখানকার কুমড়ো কুকড়েও যেতে পারে। তাই compatible marriage (সঙ্গতিশীল বিবাহ) একান্ত প্রয়োজন। Bio-vigoured seed (জীবনদীপ্ত বীজ) পড়া চাই proper bio-eagered soil-এ (উপযুক্ত জীবন্ত আগ্রহদীপ্ত মাটিতে)। পুরুষের যদি থাকে শ্রেয়পূরণী নেশা, তাহ'লে তার অন্তর্নিহিত বীজ-সত্তা একটা জীবন্তজেল্লায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, আবার নারীরও পূরণপ্রবণ সমবিপরীতসত্তারূপ স্বামীর প্রতি যদি আগ্রহ-মদির টান থাকে, তবে তার শরীর, মন ও ডিম্বকোষের মধ্যেও জেগে ওঠে একটা আমন্ত্রণী গ্রহণোন্মুখ আকুলতা। ঐ অবস্থায় সে স্বামীর বীজসত্তাকে সাদরে ধারণ ক'রে পূর্ণভাবে পোষণ দিতে পারে। পিতার বীজসত্তায় যে সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তার অনেকখানিই এতে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হ'তে পারে। জন্মের পর তাকে যদি সব দিক থেকে ঠিকমতো nurture ও education (পোষণ ও শিক্ষা) না দেওয়া যায়, তাহ'লে কিন্তু হয় না। সন্তান হ'লো পিতার বীজসত্তার দেহায়িত রূপ। মা হ'লো ঐ বীজসত্তার আশ্রয়দাত্রী ও পোষণদাত্রী। বিয়ে যদি ঠিকমতো না হয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর মনোবৃত্ত্যনুসারিণী না হয় তাহ'লে সে স্বামীর finer traits (সূক্ষ্মতর গুণ)-গুলির carrier (বাহক) স্বরূপ gene (জনি)-গুলিকে ভাল ক'রে nurture (পোষণ) দিতে পারে না। পিতা তো বীজ উপ্ত ক'রে খালাস। কিন্তু মা'র দীর্ঘদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে হয়। সন্তান গর্ভে থাকার সময় মা'র অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হয়। তার ঐ সময়ের শরীর-মনের অবস্থা ও চিন্তাধারা সন্তানের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই, তার সুস্থতা, সন্তোষ, প্রসন্নতা, পবিত্রতা, মানসিক শান্তি ও সামঞ্জস্য ইত্যাদির প্রতি পরিবারের সকলেরই সমবেতভাবে নজর রাখা উচিত। ঐ সময় তার ঘৃণা, বিরক্তি, ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি যত কম উদ্রিক্ত হয় ততই ভাল। ভাল বসন, ভূষণ, রুচিকর খাদ্যাদি দিতে হয়, যাতে স্বাভাবিক ইচ্ছার অবদমন না হয়। হৃদ্য-ব্যবহার করতে হয়। কুলাচার ও কুলসংস্কৃতি অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করতে হয়। বংশের গৌববগাথা তার সামনে তুলে ধরতে হয়। ভাল-ভাল বই পড়তে দিতে হয়। মহৎ ভাবের উদ্দীপনা হয় এমনতর কাহিনী শোনাতে হয়, অভিনয় দেখাতে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। জীবনটা যেন তখন তার কাছে লোভনীয় ও উপভোগ্য মনে হয়। এতে সন্তানের will to live

(বাঁচার ইচ্ছা) vigorous (প্রবল) হ'য়ে ওঠে এবং resistance-power (প্রতিরোধ ক্ষমতা) বেড়ে যায়।

প্রফুল্ল—এই resistance-power (প্রতিরোধ ক্ষমতা) কি শুধু physical (শারীরিক) না physical (শারীরিক) ও mental (মানসিক) দুই-ই। আমি এ-কথাটা জিজ্ঞাসা করছি এইজন্য যে, একজনের হয়তো রোগ প্রতিরোধক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি নৈরাশ্য, বাধা, বিঘ্ন, ব্যর্থতা, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অপ্রীতি, নিন্দা, গ্লানি, অপমান, দুর্ব্যবহার ইত্যাদির সম্মুখীন হ'লে মনমরা হ'য়ে হাল ছেড়ে দেয়, তাহ'লেও তো সে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বাঁচাটা তখনই জোরালো হয় যখন প্রেষ্ঠ-প্রীণনই তার বাঁচার মূল উদ্দেশ্য হয়। ঐ অকাট্য নেশা যাকে পেয়ে বসে, কোন প্রতিকূলতাই তাকে কাবু করতে পারে না। সে কেবল এৎফাক্ খোঁজে কেমন ক'রে বাধাকে বাধ্য ক'রে জীবনবল্লভের মুখে হাসি ফোটান যায়। অন্য কোন চিন্তা তাকে অভিভূত করতে পারে না, পাড়ু করতে পারে না, কাবু করতে পারে না। তার সে সময় কোথায়? তার তো কেবল নিরাকরণী চেষ্টা, যা নিরাকরণ করা সম্ভব নয়, তা' সে উপেক্ষা করে বা সহানুভূতির সঙ্গে সয়ে-বয়ে চলে। তাই, বাপ-মা যদি অমনতর শ্রেয়-ঝোঁকা হয়, তাদের সন্তানও সাধারণতঃ শ্রেয়-ঝোঁকা হবে ব'লে আশা করা যায়। ঐ শ্রেয়-ঝোঁকা রকমই জোগায় mental resistance-power (মানসিক প্রতিরোধক্ষমতা), যা' থাকলে temptation or terror (প্রলোভন বা ভয়) কিছুই মানুষকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না। তার দুর্ধর্ষ-সংবেগের কাছে প্রতিকূলতার পাহাড় গুঁড়ো-গুঁড়ো ছাতু-ছাতু হ'য়ে যায়। আর, বাস্তবে তা' না হ'লেও মন তার কখনও পরাজয় মানে না। সে ক'রেই চলে, এগিয়েই চলে—পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে। তা'ও যদি না পায়, সে একলাই এগিয়ে চলে বুক-ভরা তৃপ্তি নিয়ে। লোকে যদি তাকে অবজ্ঞা করে, সে তাদের ক্ষমার চক্ষেই দেখে, আর, অমনতর অজ্ঞ ও রিক্ত যারা তাদের জন্য আন্তরিকভাবে পরমপিতার চরণে প্রার্থনা জানায়। যীশু যেমন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় বলেছিলেন—'পিতা! তুমি এদেব ক্ষমা করো, কারণ, এরা জানে না, এবা কি করছে।'

কালীদা—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হ'লো কি ক'রে এইটে প্রজননের নীতির দিক-দিয়ে বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অনেক রকম হতে পারে, হরিণ যেমন জিরাফে পরিণত হয় আগ্রহ ও চেষ্টার ভিতর-দিয়ে, দৈত্যের মধ্যেও যে দেবভাব আদৌ থাকে না, তা' কিন্তু নয়। হয়তো সেটা নিস্তেজ থাকে। কিন্তু সেটা জাগান যায় উপযুক্ত impulse (প্রেরণা) দিয়ে। প্রহ্লাদের মা হয়তো শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভিতর-দিয়ে হিরণ্যকশিপুর সুপ্ত দেবভাবটাকে উদ্দীপ্ত ক'রে দিতে পেরেছিল, আর তারই ফলে তার পেটে জন্ম সম্ভব হয়েছিল প্রহ্লাদের। আমি তাই বলি—মানুষের ভিতর খারাপ যে-সব রকম আছে, তা' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, খোঁচাখুঁচি না ক'রে, তার ভাল দিকটাকেই বড় ক'রে দেখে

সেইটাকেই বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা ভাল। তাতে সবারই লাভ। বিশেষতঃ, কোন স্ত্রী যদি ভাল ছেলের মা হ'তে চায়, দোষদর্শন ত্যাগ ক'রে তাকে স্বামীর প্রতি সশ্রদ্ধ হতেই হবে।

১০ই মাঘ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৪।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে একখানি চেয়ারে ব'সে আছেন। আশে-পাশে অনেকেই আছেন।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ না ক'রে reform (সংস্কার) করা ভাল। জমিদারদের কাজ হবে প্রজাদের দেখাশুনা করা ও তাদের সব দিক দিয়ে উন্নতি যাতে হয় তাই করা। জমিদারদের উচিত জমিদারীর আয় থেকে যথাসম্ভব কম নিজেদের জন্য নেওয়া এবং বাদবাকী প্রজাদের কল্যাণের জন্য জনহিতকর কাজে ব্যয় করা। এর জন্য একটি জমিদারী পরিচালনী পরিষদ সৃষ্টি করা ভাল। সেই পরিষদের মধ্যে জমিদারও যেমন থাকবে তেমনি থাকবে প্রজাদের নির্ব্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধি। তারা স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝে যা'-যা' করবার করবে। বিপদ-আপদের জন্য প্রত্যেক জমিদারীর মধ্যে থাকবে ধর্ম্মগোলা ও সাহায্য-তহবিল, সেখান থেকে লোককে প্রয়োজনমতো সাহায্য করতে হবে। কৃষি, শিল্প, বিশেষতঃ কৃষিভিত্তিক কুটির-শিল্পের উপর জোর দিয়ে প্রত্যেকের economic improvement (অর্থনৈতিক উন্নতি) যাতে হয় তার ব্যবস্থা করবে ঐ পরিষদ। সবরকম production (উৎপাদন) এস্তার ক'রে তুলতে হবে। সেগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও ক'রে দিতে হবে ঐ পরিষদকে। যাতে লোকেরা ন্যায্য দাম পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক পরিবারের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শিল্প নির্ব্বাচন ক'রে দিয়ে সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। একটা লোকও যেন বেকার বা দরিদ্র না থাকে কোন জমিদারীর মধ্যে। জমিদারী-পরিচালনী পরিষদকে সরকারের সবরকমে সাহায্য করতে হবে। স্থানীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধেও তাদেব দায়িত্ব থাকবে। সরকারের যা' করণীয় তার অনেকখানিই এরা করবে। এইরকম ব্যবস্থা যদি থাকে তাহ'লে disciplined efficient administration (সুশৃঙ্খল, দক্ষ প্রশাসন)-সম্বন্ধে স্থানীয় কতগুলি লোক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিপর্য্যয় দেখা দিলেও এরা তার আঘাত অনেকখানি সামলে নিয়ে জনসাধারণকে অনেকখানি নিরাপত্তা দিতে পারবে। মানুষেব সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উপেক্ষা ক'রে একটা উপর থেকে চাপান যান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে মানুষ খুব স্বস্তি পায় ব'লে আমার মনে হয় না। সে-দিক থেকে জমিদারী-পরিষদ স্থানীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দরদী অভিভাবকের মতো সবার সুখ-দুঃখের সাথী হ'য়ে যদি সকলকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতে বদ্ধ-পরিকর হয়, তাহ'লে কাজ অনেক ভাল হবে। জমিদারী পরিষদের লোকগুলি যদি ভাল হয় এবং তারা

যদি জনসাধারণের ভালবাসা অর্জ্জন করতে পারে, তবে ঐ সাধারণ লোকেরা তাদের খুশি করার তাগিদে নিজেদের যোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করবে। এই psychological factor (মনস্তাত্ত্বিক দিক)-কে বাদ দিলে, মানুষের উন্নতিসাধনের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। শ্রেয়ের প্রতি ভালবাসা না জাগলে মানুষের প্রাণশক্তি জাগে না। তাই সব platform (মঞ্চ) থেকেই চাই ইষ্ট-সঞ্চারণা।

একটি দাদা কাতরভাবে বললেন—দয়াল! আমার ছেলেটির কঠিন ফাঁড়া আছে। আপনি যদি দয়া ক'রে রক্ষা করেন তাহ'লেই সে রেহাই পেতে পারে। জ্যোতিষীরা বলছেন—সদ্‌গুরুর দয়ায় সবই সম্ভব। আমারও সেই বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া ছাড়া কিছু হয় না। খুব নাম করা লাগে। আর স্বস্ত্যয়নীর চরণামৃত রোজ খাওয়ান ভাল। নিষ্ঠা-সহকারে স্বস্ত্যয়নীর নীতিগুলি পালন করতে হয়। আর, মন্ত্রপাঠ ক'রে স্বস্ত্যয়নীর অর্ঘ্য নিবেদনের সময় ফুল ও জল নিবেদন করতে হয়। ঐ জলই স্বস্ত্যয়নীর চরণামৃত। স্বস্ত্যয়নীর মতো এত powerful (শক্তিমান) আর কিছু দেখি না। স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতির যতগুলি যতখানি যে পালন করবে, তার strength (শক্তি)-ও হবে ততখানি। দুনিয়ার সব কিছু এর মধ্যে রয়ে গেছে। যে যতখানি পালন করবে, সে ততটা বুঝবে। মনুতে আছে—

"ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরম্॥"

স্বস্ত্যয়নী পরমপিতার দান। এত পরিষ্কার ক'রে আগে কোথাও দেওয়া ছিল না। বিধিগুলি একত্র মালাকারে গেঁথে পরমপিতা এবার আমাদের সবার সামনে রক্ষাকবচ হিসাবে উপহার দিয়েছেন। অনেকেই ভাল ক'রে করে না, তাই এর মহিমাও উপলব্ধি করতে পারে না।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত)—আমরা যদি স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতিই প্রতিদিন যথাসম্ভব পালন করে চলি তাহ'লে তার ফল কী হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কোন বিপর্য্যয়ই তোমার চলনাকে ব্যাহত করতে পারবে না, তোমার নিয়ন্ত্রণের গুণে খারাপটাও তোমার মঙ্গলের কারণ হ'য়ে উঠবে। মানুষের উপর তোমার influence (প্রভাব), তোমার activity (কর্ম্ম), তোমার income (আয়) বেড়েই চলবে। এর মধ্যে অলৌকিকতা কিছু নেই। নিত্য কল্যাণের সাধনা যদি কর এবং যে-সব ছেদা দিয়ে সাধনার ফল হুড়-হুড় ক'রে বেরিয়ে যায়, সে-সব ছেদাগুলি যদি বন্ধ কর, তবে একটা accumulated result (সঞ্চিত ফল) তো হবেই।·········একেবারে অশৈলি কাণ্ড। এমনতর আর দেখিনি। কাঁটায়-কাঁটায় স্বস্ত্যয়নীর পথ বেয়ে চললে উন্নতি তোমার মুঠোর মধ্যে। ফরমুলায় ফেলে অঙ্ক ঠিকমতো করলে উত্তর মিলতে বাধ্য।

যজ্ঞেশ্বরদা—কেউ যদি কোন একটি নিয়ম পালন করতে না পারে, তাহ'লে কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-গুলির সব ঘাট বান্ধা আছে। সবগুলি একসঙ্গে জড়ান। কোন

একটা নিয়ম পালন না করলে অন্য নিয়মগুলিও ঠিকভাবে পালন করা যাবে না। গড়ে অতোখানি খাঁকতি থেকে যাবে। গোড়ায় উল্টো ভাবনার প্রশ্রয় দিতে নেই। তাহ'লে পরে আর পারা যায় না। ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা কি পাঁচসিকে রোখ রাখতে হয় সবগুলি নিখুঁতভাবে করবার। তাতেও দেখা যায় ক্রমে-ক্রমে খানিকটা ঢিলে হ'য়ে আসে। অত্যন্ত রোখ ও সদাজাগ্রত নিরখ-পরখ না থাকলে সৎচলন অভ্যাসে রপ্ত হয় না। নিজের বিচ্যুতিকে কখনও ক্ষমা করতে হয় না। ফিঙ্গে হ'য়ে লেগে থাকলে চলনার বকম ফিরাতে কয়দিন লাগে? সদভ্যাস পাকা হ'য়ে গেলে আজীবন তার সুফল ভোগ করা যায়। এ যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী।

মদনদা (দাস)—একজন যদি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করে, অথচ go-between-এর (দ্বন্দ্বীবৃত্তির) প্রশ্রয় দেয়, তার ফল কী হ'বে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি অর্থাৎ কথা বা দায়িত্বের খেলাপ) dangerous (সাংঘাতিক) জিনিস। ওটা একেবারে ঘুনপোকার মতো ভিতর থেকে খেয়ে ফেলে। কোন চেষ্টার পূর্ণ ফল দিতে দেয় না। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করছ, Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) ও আছে, তাতে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নীর ফল পাবে, কিন্তু Go-between-এ (দ্বন্দ্বীবৃত্তিতে) অনেকখানি নষ্ট ক'রে দেবে। ষোল-আনার জায়গায় হয়তো সাত-আনা ফল পাবে। আর, আমার মনে হয় go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) পুষে রাখলে, স্বস্ত্যয়নীর নীতিও লঙ্ঘন করা হয়। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) অস্তিত্বের প্রতিকূল একটা জটিল প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে যদি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার অনুগামী ক'রে নিয়ন্ত্রিত করা না হয়, তাহ'লে স্বস্ত্যয়নী পালনেই ত্রুটি থেকে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

বিধির নীতি পালবি যেমন
যতটা বা যতটুকু,
কেটে-ছেটে সব মিলিয়ে
পাবিও ফল ততটুকু।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—লিখলি নাকি?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ!

এরপর ছড়াটা প'ড়ে শোনান হ'লো।

প্রফুল্ল—আপনার এই ছড়াটা কি জীবনের সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অনেক সময় তো দেখা যায় যে মানুষ ঠিকমতো চলা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে অনেক কষ্ট পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বত্র এ একেবারে নিক্তির ওজনে ঠিক। তোমার বর্ত্তমান অবস্থাকে যদি তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে পার, তাহ'লে তা' থেকে তুমি ঠিক পাবে তোমার অতীতের করাটা ও চলাটা কতখানি ঠিক বা বেঠিক হয়েছে, আবার,

বর্ত্তমান চলাটা ও করাটা যদি ঠিকভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করতে পার, তা' থেকে মালুম হবে তোমার ভবিষ্যৎ কী রূপ নিতে পারে। অতীতের উপর হয়তো আমাদের হাত নেই, কিন্তু অতীতের ভাল-মন্দ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে আমরা যদি বর্ত্তমানের চলনাকে সংশোধন করি, তাহ'লে উন্নতি অবধারিত। অবশ্য, অকাম যে যা' করেছে, তার ফল যখন যার যেমন প্রাপ্য তখন তাকে তেমন পেতেই হবে। পরিবেশের প্রতিকূলতার দরুন কষ্ট পাওয়ার কথা যেটা বলছ, সেটাও কর্ম্মফল। ঠিকমতো চলার মধ্যে পড়ে পরিবেশসহ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা। যাজন ও ধর্ম্মদান তাই আমাদের নিত্য কর্ম্ম। ওটা ignore (উপেক্ষা) করলে ফল ভাল হয় না।

প্রফুল্ল— যতই সেবা ও যাজন করা যাক, মানুষকে দীক্ষিত করা যাক, মানুষের জন্মগত প্রকৃতি কিছুতেই বদলায় ব'লে তো মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-ক্ষেত্রে যতখানি সম্ভব, সে-ক্ষেত্রে ততখানি চেষ্টা করতে হবে। আর, বেয়াড়া যারা তাদের সয়ে বয়ে নিতে হবে, tactfully (কৌশলে) resist (প্রতিরোধ)-ও করতে হবে—obsessed (অভিভূত) না হ'য়ে। পরিবেশ ভাল হ'লে চলনাটা সুখময় হয়। আর, পরিবেশ যদি খারাপ হয় তার ইষ্টানুগ সহন, বহন, নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ করতে গিয়ে কষ্ট হলেও মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। সেটাও indirectly (পরোক্ষে) সুখের কারণ হয়। ইষ্টকেন্দ্রিক যে তার সার্থকতার পথ সবদিক দিয়েই খোলা। তবে তাকে কষ্ট ও অতন্দ্র চেষ্টার জন্য রাজী থাকতে হবে। পরিবেশ অনিয়ন্ত্রিত চলনায় চলছে সেই নজির দেখিয়ে কেউ যদি নিজের চলনা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে চেষ্টা না করে, তার চাইতে বড় বেকুবী আর কিছু হতে পারে না। পাপকে প্রশ্রয় দিলে সে পাপের আগুন জন্ম-জন্মান্তর, পুরুষ-পুরুষান্তর মানুষকে দগ্ধিয়ে মারে। তাই, হেলায়-ফেলায় দুর্ব্বলতা পুষে রাখা ভাল না। বদভ্যাস করা সহজ কিন্তু ছাড়া কঠিন। তবে না ছাড়লে রেহাই নেই। ভাল-মন্দ যাই যার পাওনা থাক, প্রকৃতি তাকে তা' সুদে-আসলে কড়ায়-গন্ডায় না দিয়ে ছাড়বে না।

দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত)—গীতায় মনকে সংযত করার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য অনুশীলন করার কথা বলা হয়েছে। প্রবৃত্তির উপর তো মানুষের অত্যন্ত টান, এমত অবস্থায় বৈরাগ্য আসবে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের উপর অনুরাগ প্রবল না হ'লে বৈরাগ্য আসতে পারে না। ওর মধ্যেই র'য়ে গেছে সব। ইষ্টের ওপর টান যত বাড়ে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার প্রতিকূল যা' তার প্রতি লালসা তত কমে যায়। বৈরাগ্য মানে এ নয় যে বিষয় ও সংসারকে অবহেলা করতে হবে। সবকিছুকে ইষ্টার্থে গুছিয়ে তোলাই বরং আসল বৈরাগ্য। ইষ্টের অভিপ্রায়কে রূপ দেবার জন্যই আমাদের যা'-কিছু করতে হবে। এবং তা' করতে হবে আগ্রহ-সহকারে—সুষ্ঠুভাবে। তা' না ক'রে উৎসাহ-উদ্যমহীন হ'য়ে অলসের মতো ব'সে রইলাম, তা' বৈরাগ্য নয়। ইষ্টকেই সব চাইতে আপন ও বড় ব'লে জানতে হবে, মানতে হবে। তাঁর চাইতে প্রিয়তর বা অধিক মূল্যবান ব'লে কিছু থাকবে না আমার

কাছে। আমার লাখো-লাখো টাকা থাক, কিন্তু সে টাকা থাকবে ইষ্টসেবা ও ইষ্টার্থী-সেবার জন্য! তাঁর জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহ'লে আমি যে-কোন সময় যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকব। এই ত্যাগ ক'রেও ত্যাগের কোন অহংকার থাকবে না। আমার অর্থ তাঁর সেবায় কিংবা তাঁর wishes (ইচ্ছা) fulfil (পূরণ) করার জন্য লোকসেবায় লেগেছে ব'লে নিজেকে ধন্য মনে করব। বৈরাগ্যের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই শিবাজীর জীবনে। নিজে রাজা হ'য়ে রাজ্য দিয়ে দিল গুরুকে। আবার, গুরুর ইচ্ছায় গুরুর representative (প্রতিনিধি)-স্বরূপ নিখুঁতভাবে রাজকার্য্য চালিয়ে গেল। আমার সবকিছুকে তাঁর বলে জানতে হবে এবং তাঁর সেবায় নিয়োগ করতে হবে। এতে মানুষ 'আমি' 'আমার' 'আমি' 'আমার' ক'রে পাগল হয় না, জড়িয়ে পড়ে না। সবকিছুতে লিপ্ত থেকেও নির্লিপ্ত থাকে। তার আসক্তি কেন্দ্রীভূত থাকে ইষ্টে। তাই রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, প্রতিপত্তি, ভোগসুখ কোনটাই তাকে সেখান থেকে চ্যুত করতে পারে না। একেই বলে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য। আবার, কোনকিছু যদি তার ইষ্টচলনে একান্তই ব্যাঘাত ঘটায়, এবং সে কোনমতেই যদি তার ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান না করতে পারে, তবে লহমায় তা' পরিহার করতে তার আটকায় না। বিল্বমঙ্গল যেমন নিজের চোখ দুটো নষ্ট ক'রে ফেলেছিল, কারণ ঐ চোখ নারীরূপের দিকে আকৃষ্ট ক'রে তার মনকে ভগবৎ-পাদপদ্ম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

প্রফুল্ল—এইরকম চরম পন্থা গ্রহণ করা কি ভাল? এতে তো ঠেকে পড়তে হয়। যে-চোখ নারীরূপের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে সাধনার ব্যাঘাত ঘটায়, সেই চোখ দিয়ে সাধনার সহায়ক অনেক কিছুও তো দেখা যায়। আর, চোখ না থাকলে তো পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে পড়তে হয়। নানাভাবে জীবন-চলনা ও সাধনা ব্যাহত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যুক্তিবিচার করছ তো তোমার মতো ক'রে। অনন্যমনা হ'য়ে ঈশ্বরভজনের ব্যাকুলতা বিল্বমঙ্গলকে যে কিভাবে পেয়ে বসেছিল, তা' কি তুমি ধারণা করতে পার? নইলে নিজের চোখ নিজে নষ্ট করা খেলাকথা নয়। আর, কোন খেয়ালের বশে সে তা' করেনি। করেছে প্রাণ উপচান ভগবৎ-নেশার তাগিদে। বাইবেলেও তো আছে শুনেছি—তোমার চোখ যদি তোমার জীবন-সাধনার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তবে দরকার হ'লে বরং সে চোখ উপড়ে ফেল। হাত যদি বাধা সৃষ্টি করে, হাত কেটে ফেল। পূর্ণাঙ্গ থাকতে গিয়ে আত্মার অধোগতি সাধন করার থেকে অঙ্গহানি ঘটিয়েও আত্মাকে অক্ষত রাখা ভাল। আমার ভাল ক'রে মনে নেই। তোমরা দেখে নিও। গাছের মূল ঠিক রাখতে গিয়ে যদি কখনও ডালপালা কাটা লাগে, তা' কখনও দোষের নয়। ডালপালার মায়ায় মূল খোয়ান কি ভাল? জীবনের মূল জিনিস হ'লো ভক্তি। বাহ্যিক কোন ক্ষতি স্বীকারে যদি ভক্তি পুষ্ট হয়, সে ক্ষতি স্বীকারে শেষ পর্য্যন্ত লোকসান নেই, দোষ নেই। তবে অনুরাগ নেই,

অনুরাগের সাধনা নেই, অথচ ত্যাগ, অবদমন ও কৃচ্ছ্রতা-সাধনের কসরত মুখ্য হ'য়ে উঠেছে,—এমনতর জিনিস আর যা-হোক ধর্ম্ম নয়।

দক্ষিণাদা—প্রকৃতির কি দুঃখকষ্ট আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে বই কি? আপনিও তো পরমপিতা থেকেই উদ্ভূত। তবু আপনার প্রকৃতি নিয়ে আপনি। আপনার প্রকৃতি বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় ব্যথা পায়। আপনার শরীর খারাপ হ'য়ে যায়, মন খারাপ হ'য়ে যায়, কত সময় দুঃখ সইতে না পেরে কেঁদে ফেলেন। গাছপালা, মাটি সবকিছুরই এমনতর হয়—প্রত্যেকের তার মতো ক'রে। তাই, প্রত্যেককেই সাধ্যমতো পোষণ দিতে হয়, প্রত্যেকেরই বাঁচার পথ সুগম ক'রে দিতে হয়—সপরিবেশ নিজ অস্তিত্ব বিপন্ন না হয় সে-দিকে লক্ষ্য রেখে। ব্যক্তিগত কোন লাভের আশা না রেখে দরদী যত্নে আপনি যদি একটা মরণোন্মুখ গাছকেও বাঁচিয়ে তোলেন, তাতেও আপনার ধর্ম্মজীবন পুষ্ট হবে। আপনি একদিন প্রকৃতির অনাহূত আশীর্ব্বাদ লাভ করবেন তার দরুন।

১১ই মাঘ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৫।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলঘরে ব'সে আছেন। প্রমথদা (দে), নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) প্রভৃতি কাছে আছেন। এমন সময় হাউজারম্যানদা মিস্ শিমারকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। হাউজারম্যানদা মা-টির পরিচয় দিয়ে বললেন—উনি আমার দেশের লোক। বর্ত্তমানে মাদ্রাজে থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে বললেন—খুব ভাল।

মিস্ শিমার—আপনার কথা অনেক শুনেছি। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার আগ্রহ নিয়ে এসেছি। আমার বিশ্বাস আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমি কিছু নূতন জ্ঞান আহরণ করতে পারব। যারা আপনার সঙ্গ করেছে, তাদের ধারণা আপনার চিন্তাধারার মধ্যে একটি অপূর্ব্ব মৌলিকতা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মূর্খমানুষ, আমার কোন জ্ঞান-ট্যান নেই। তবে আমার experience (অভিজ্ঞতা) আমাকে যেমনতর দেখিয়েছে, বুঝিয়েছে, আমি তার উপর দাঁড়িয়েই যা'-কিছু বলি। তাই পড়াশুনার বিদ্যা না থাকাকে যদি originality (মৌলিকতা) বলেন, তা' আমার আছে।

মা-টি শ্রীশ্রীঠাকুরের অকপট সরল উক্তি শুনে হেসে ফেললেন। মুহূর্ত্তেই যেন একটি সহজ অন্তরঙ্গতার পরিবেশ গ'ড়ে উঠলো।

মিস্ শিমার—অনেকে মহৎ-সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে, কিন্তু তার পিছনে আত্মসমর্পণের চাইতে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যষ্টি-অহং-এর প্রবৃত্তি হ'লো সমষ্টি-অহং-এ উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠা। এই প্রয়াস তার লেগেই আছে। তাই, সে ধরতে চায় এমন একটা কিছু, যা' তার ঐ craving (আকাঙ্ক্ষা) fulfil (পূরণ) করতে পারে। Inner hankering

(ভিতরের আকাঙ্ক্ষা) dwell (বাস) করে প্রত্যেক individual (ব্যষ্টি)-এর মধ্যে—to be sublimated (ভূমায়িত হ'য়ে উঠবার জন্য)। ভূমার মধ্যে, বহুর মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়তে না পারলে তার ভাল লাগে না। একের ego (অহং) যখন বহুর ego (অহং)-এর সঙ্গে সত্তাপোষণী সঙ্গতি ও সম্প্রীতি স্থাপন ক'রে প্রত্যেকের সঙ্গে আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে পারে, তখনই হয় তার উপভোগ। একের ego (অহং) যদি আপন শক্তিমত্তায় বহুর ego (অহং)-কে দাবিয়ে নিজের অধীন ক'রে রাখে, সেখানে কিন্তু mutual enjoyment (পারস্পরিক উপভোগ) থাকে না। তাই, প্রকৃত ব্যাপ্তি বা উপভোগ হয় না। স্বতঃস্বেচ্ছ ভালবাসার মধ্যে কিন্তু একটা অধীনতা আছে। সে অধীনতার মধ্যে সুখ আছে।

মিস্ শিমার—মানুষ কি নিজেকে বিলীন ক'রে দিতে চায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ নিজের সত্তাকে বজায় রেখে বহুতে বিবর্ত্তিত হ'তে চায়। ঈশ্বর যেমন একা বহু হয়েছেন—নিজেকে বহুভাবে উপভোগ করবার জন্য, তাঁর সৃষ্ট মানুষও তেমনি চায়, প্রীতি ও সেবার ভিতর-দিয়ে বহুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হ'য়ে বহুভাবে নিজেকে অনুভব ও উপভোগ করতে। তাই বলে—God created man after His own image (ঈশ্বর নিজের প্রতিচ্ছবি ক'রে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন)। ঈশ্বর যেমন সৃষ্টি ক'রে নিজে ফুরিয়ে যাননি, তাঁর নিজত্ব অটুটই আছে। মানুষও তেমনি ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসতে গিয়ে নিজ সত্তাকে মুছে ফেলতে চায় না। স্বতন্ত্র সত্তাবোধ যদি বিলকুল বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, তাহ'লে যে আর উপভোগ-করনেওয়ালা ব'লে কেউ থাকে না। যে উপভোগ করবে, সেই যদি না থাকে, তাহ'লে উপভোগও থাকে না।

হাউজারম্যানদা—আমাদের সত্তা যদি যীশুখ্রীষ্টে উদ্‌গতি (sublimation) লাভ করে, তাহ'লে বহুতে বিবর্ত্তিত হয় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি আমার ছেলেকে ভালবাসি, তাহ'লে বুঝতে পারি অন্য পিতার তার সন্তানের প্রতি ভালবাসা জিনিসটা কী। যীশুখ্রীষ্টকে যদি ভালবাসি, তবে তিনি যাদের ভালবাসেন, তাদেরও আমি ভালবাসতে শিখি। এমনি ক'রেই circle (বৃত্ত) expanded (বিস্তৃত) হয়।

মিস্ শিমার—তাহ'লে বিবর্ত্তনের মূলে আছে ভালবাসা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয় তাই। আমি যদি ভগবান যীশুকে ভালবাসি, তাহ'লে সব prophet (প্রেরিত পুরুষ)-কেই ভালবাসতে পারব, সমস্ত prophet (প্রেরিত পুরুষ) যেমন ক'রে সবাইকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমন ক'রে ভালবাসতে পারব প্রত্যেকটি মানুষকে। আমরা আবার আমাদের prophet (প্রেরিত পুরুষ)-কে ভালবাসতে পারি through our present Guru (আমাদের বর্ত্তমান গুরুর মাধ্যমে)। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) আজ রক্তমাংস-সংকুল দেহধারী হ'য়ে আমাদের

সামনে নেই, তাই তাঁকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যিনি সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ ও সত্তা দিয়ে তাঁকে ভালবাসেন, তাঁর মধ্য-দিয়ে আজও আমরা তাঁকে দেখতে পারি।

মিস্ শিমার—প্রভু যীশুর ভক্তিরূপ আমরা দেখতে না পেলেও তাঁর ভাবরূপ আমরা দেখতে পাই, তাঁর বাণী ও নীতির মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কোন গুণকে বোধই করতে পারি না, যদি আমরা তা' মানুষের মধ্যে manifested (ব্যক্ত) না দেখতে পারি। তার আগ পর্য্যন্ত আমরা কথার রাজ্যেই থেকে যাই, বোধের রাজ্যে পৌঁছাতে পারি না।

মিস্ শিমার—গভীর অনুভূতির সময় আমাদের যে বোধ হয়, তা' তো নৈর্ব্যক্তিক রকমের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন ভাগবত ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের feeling (বোধ)-টা অত্যন্ত keen and concentrated (তীব্র ও একাগ্র) হ'য়ে ওঠে। তাই, ঐ ব্যক্তিত্ব যে তত্ত্বের প্রতীক, তারই রূপ আমাদের বোধে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

মিস্ শিমার—কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় না ক'রেও তো ভালবাসা আমাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—There will be disintegration and no concentration (তাতে ভালবাসার খণ্ডীকরণ হবে একাগ্রতা সাধন হবে না)। পুরো ভালবাসাটা একজন ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে সার্থকতালাভ করতে পারে, চোখের সামনে এমনতর একটি ব্যক্তিত্ব চাই-ই, আর তাঁকে ভালবাসতে হয় unrepelling adherence ও unconditional surrender (অচ্যুত নিষ্ঠা ও নিঃসর্ত্ত আত্মসমর্পণ) নিয়ে। নচেৎ আমার সঙ্গে যতটুকু মেলে, আমার যতটুকু পছন্দ হয়, মেপে-মেপে এক-এক জনকে ততটুকু ভালবাসলাম, তার মানে আমি কাউকেই ভালবাসি না, ভালবাসি আমাকে, আমার পছন্দ, অপছন্দ ও খেয়ালকে। ঐগুলিই যদি আমার ভালবাসার বস্তু হয়, তাহ'লে আমার পরিণতি যা হ'তে পারে, তাই-ই হবে! ঐ ভালবাসার ভিতর-দিয়ে আমার character (চরিত্র)-এর higher re-adjustment (উন্নততর পুনর্বিন্যাস) হবে না। তা'ছাড়া আতস পাথরের মধ্য-দিয়ে সূর্য্যের উত্তাপ feel (বোধ) করা, আর এমনি সূর্য্যের উত্তাপ feel (বোধ) করা, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। Lord Jesus (প্রভু যীশু) হ'লেন আতস পাথর। He can concentrate mercy for us (তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের করুণাকে কেন্দ্রায়িত ক'রে দিতে পারেন)।

মিস্ শিমার—ভক্তি ছাড়া জ্ঞানের পথেও তো তাঁকে লাভ করা যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ হয়তো analytically approach করতে (বিশ্লেষণ-সহকারে অগ্রসর হ'তে) পারে নেতি-নেতি ক'রে। সেটা mathematically correct but practically not very serviceable (গাণিতিকভাবে ঠিক কিন্তু বাস্তবে খুব বেশী কার্য্যকরী নয়)। জ্ঞানের জন্য আলাদা সাধন করাই লাগে না। ভক্তি

সাধলেই জ্ঞান আপনা-আপনিই আসে ভক্তিমূলক কর্ম্মের পথে। আর, ভক্তি বড় সহজ সাধন। যে চায় সে-ই পায়। কিছু না, কেবল একটু সোহাগের সাথে তাঁকে ভাবতে থাক, তাঁর কথা বলতে থাক, আর তাঁর wish (ইচ্ছা)-গুলি fulfil (পূরণ) ক'রে চল। দেখতে-দেখতে আপনা থেকেই ভক্তি গজিয়ে উঠবে (love will sprout automatically)। ভক্তি রুদ্ধ হ'য়ে যায় এমনতর ভাবা-বলা-করার প্রশ্রয় দিতে নেই, ওতে অযথা blockade (অবরোধ)-এর সৃষ্টি হয়। ভক্তির পথে ভিতরের এই বাধাই সব চাইতে বেশী অসুবিধার কারণ হয়, নইলে বাইরের বাধায় রোখ বাড়ে ছাড়া কমে না।

হাউজারম্যানদা—ভালবাসা মানেই প্রিয়ের প্রীতিজনক কর্ম্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love imparts ability (ভালবাসা সামর্থ্যের সঞ্চার করে)।

হাউজারম্যানদা—ভালবাসা আবার জ্ঞানও আনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হাস্যে হাউজারম্যানদার কথার অনুমোদন জানালেন। পরক্ষণে বললেন—Love is the lofty minister to devotion (ভালবাসা ভক্তির মহান অমাত্য)।

হাউজারম্যানদা—যাকে-তাকে চালাক-হিসাবে বা নেতা-হিসাবে গ্রহণ ক'রে তাকে ভালবাসতে বা অনুসরণ করতে গেলে তো বিপদ আছে। হিটলারকে অনুসরণ করতে গিয়ে জারমানী ও জারম্যানরা কতখানি বিপন্ন হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই নেতাকে অনুসরণ করতে হয় যিনি সুনীত ও সুনিয়ন্ত্রিত। গুরুহীন গুরুকেও অনুসরণ করতে নেই। নেতাহীন নেতাকেও অনুসরণ করতে নেই। আবার, গুরুর শুধু গুরু থাকলে হবে না, নেতার শুধু নেতা থাকলে হবে না, ঐ শ্রেয়ের প্রতি তাঁর এতখানি আনুগত্য থাকা চাই, যার ফলে খেয়ালী চলন বা ভ্রান্ত চলন তাঁর চরিত্র থেকে বিদায় নেয়।

মিস্ শিমার—জারম্যানরা কিন্তু তাদের নেতার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, Sacrifice for the leader who has sacrificed his ego for his beloved. Sacrifice yourself for Christ. (সেই নেতার জন্য ত্যাগ স্বীকার কর যিনি তাঁর প্রেষ্ঠের জন্য নিজের অহমিকাকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। খ্রীষ্টের জন্য নিজেকে বিসর্জ্জন দাও)।

মিস্ শিমার—পাশ্চাত্য দেশ যীশু থেকে চ্যুত হ'য়ে গেছে। তাকে কি আনা যাবে পথে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! কঠিন কিছু নয়। এমন কোন মানুষ যদি থাকেন যিনি যীশুকে সর্ব্বতোভাবে ভালবাসেন ও অনুসরণ করেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নীতিবিধিকেই বাস্তব আচরণে মূর্ত্ত ক'রে তোলেন, তাঁকে ভালবাসতে হবে কায়মনোবাক্যে। অমনতর যীশুপ্রেমীকে ভালবাসলে মানুষ সবাইকে ভালবাসতে

শিখবে, দুনিয়াকে ভালবাসতে শিখবে। যে-কোন একজন prophet (প্রেরিত পুরুষ)-কে ঠিক-ঠিক ভালবাসলে, প্রত্যেকটি prophet (প্রেরিত পুরুষ)-এর উপর ভালবাসা আসে। কারণ, prophet (প্রেরিত পুরুষ)-রা same (এক)। যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই বুদ্ধ, তিনিই যীশু, তিনিই মহম্মদ, তিনিই চৈতন্য, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ যদি একজনকে স্বীকার করে, আর একজনকে অস্বীকার করে, তাহ'লে বুঝতে হবে যাঁকে স্বীকার করে বলছে, তাঁকেও পুরোপুরি স্বীকার করে না। মানুষ অতীত থেকে শুরু ক'রে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বা বর্ত্তমান থেকে সুরু ক'রে অতীত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি prophet (প্রেরিত)-কে যাতে স্বীকার করে, তেমনতর climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি ক'রে তুলতে হবে। সব prophet (প্রেরিত)-কে নিজ prophet (প্রেরিত)-এরই ভিন্ন-ভিন্ন মূর্ত্তি বলে জানতে হবে। এই বোধ থেকে সব prophet (প্রেরিত)-কে ভালবাসতে হবে। এই ভালবাসার মধ্য-দিয়ে দেশে-দেশে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে মিল সহজ-স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে। এমনি ক'রেই স্বর্গ-রাজ্যের আবির্ভাব হ'তে পারে পৃথিবীতে।

মিস্ শিমার—প্রভুর প্রতি ভালবাসা ও সেবা শ্রেয় ? না কর্ম্মবিরত নির্জ্জনবাস ও প্রার্থনাদিই সাধনার পক্ষে শ্রেয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love (ভালবাসা) আছে, কিন্তু activity ও service (কর্ম্ম ও সেবা) নাই, সে love (ভালবাসা) sterile (বন্ধ্যা)। সেটা love (ভালবাসা) কিনা, তাও জানি না। Love (ভালবাসা) যখন service-এর (সেবার) মধ্য-দিয়ে মূর্ত্ত হয়, তখন আরও বর্দ্ধিত হয়। ভালবাসার গভীরতা ও ব্যাপকতাকে যদি ক্রম-বৃদ্ধিপর ক'রে জীবনকে ক্রমোন্নতিশীল ক'রে তুলতে হয়, তবে প্রেষ্ঠের প্রীতিসন্দীপী কর্ম্ম করতেই হবে। নইলে শুধু নির্জ্জনবাস ও প্রার্থনাদি সাধারণ মানুষকে ভাবালু, আরামপ্রিয়, নিথর ও দায়িত্বহীন ক'রে তুলতে পারে। ওতে মানুষ প্রিয়সর্ব্বস্ব না হ'য়ে আত্মসর্ব্বস্বও হ'য়ে উঠতে পারে। চৈতন্যদেব বা রামকৃষ্ণদেবের মতো মানুষের দীর্ঘ নির্জ্জনসাধন কিন্তু তীব্র ব্যাকুল চেষ্টায় ভরা, তার মধ্যে আলস্য ও শৈথিল্যের অবকাশই ছিল না। সাধারণ মানুষ অনেক সময় নির্জ্জনসাধনার নাম ক'রে জড়তার আশ্রয় গ্রহণ করে, ওতে spiritual development (আধ্যাত্মিক বিকাশ) তো দূরের কথা, physical, mental ও moral development (শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক উন্নতি)-ও hampered (ব্যাহত) হয়। আমি বলেছি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা। ইষ্টার্থী ভাবা, বলা, করা একসঙ্গে সমান তালে চালাতে হয়। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নয়।

মিস্ শিমার—মানুষ অনেক সময় সমাজ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে চ'লে যায় ব্যক্তিগত মুক্তির চেষ্টায়, সে-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ignorance-এর (অজ্ঞতার) দরুন ও-সব করে। করতে যেয়ে দেখে যে দুনিয়া উদ্ধার না হ'লে তার উদ্ধার নেই। Christ (খ্রীষ্ট) ততদিন

পর্য্যন্ত crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হ'তে থাকবেন, যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ ভগবানকে ভাল না বাসবে কর্ম্মের মধ্য-দিয়ে। তাঁকে ভালবাসলে মানুষ দেখে যে কী করলে বা কিভাবে চললে-বললে তিনি খুশি হন ও সুখী হন, আর, নিজের করা, বলা ও চলাকে সেই পথেই নিয়োজিত করে। এতে সে নিজেও যেমন সার্থকতা লাভ করে, পরিবেশও তেমনি উপকৃত হয়। ইষ্টনিষ্ঠ লোকের সংখ্যা সমাজে যত বাড়ে ততই প্রেরিত পুরুষগণের জগতে জয়যুক্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। মানুষের love ও willing co-operation (ভালবাসা ও স্বেচ্ছ সহযোগিতা)-ই তাঁদের কাজের soil (ভূমি)।

কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় কলকাতা থেকে একটি দাদা আসলেন। তিনি কফি, কলাইশুটি, নারকেলী কুল, নতুন গুড়ের সন্দেশ, কমলা এবং আপেল নিয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য। দাদাটি জিনিসগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—একে বামুন মানুষ, তায় আবার ভোজনবিলাসী বারেন্দ্র। ও-সব বেশী দেখায়ে কাম নেই। তুমি বড় বৌ-এর কাছে দিয়ে আস গিয়ে। ক'য়ে দিও আজই ঠাকুরভোগে লাগায়ে দিতে।

দাদাটির চোখ আনন্দের আবেগে অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠলো। তিনি জিনিসগুলি নিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

মিস্ শিমার—গীতার নিষ্কামকর্ম্ম এবং আপনি যে কর্ম্মের কথা বলছেন, দুই-ই কি এক জিনিস ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! প্রেষ্ঠস্বার্থ, প্রেষ্ঠ-প্রতিষ্ঠা ও প্রেষ্ঠ-প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম, তাই-ই প্রকৃত কর্ম্ম, আর তাকেই বলে নিষ্কাম-কর্ম্ম। নিজের কামনার তাড়নায় মানুষ যে-সব কর্ম্ম করে, সেগুলি মানুষকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। একবার ঐ জালে জড়িয়ে পড়লে মানুষকে একের পর এক কর্ম্ম বহু করতে হয়, কিন্তু সে-কর্ম্মের উপর তার হাত থাকে না, কর্ম্মচক্র ও কর্ম্মফল তাকে বাধ্য ক'রে টেনে নিয়ে চলে আপন গতিপথে। তার সত্তাপোষণী নিয়ন্ত্রণ সে করতে পারে কমই। কারণ, ঐ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে তার কর্ম্ম স্বরু হয়নি, তার কর্ম্ম স্বরু হয়েছে প্রবৃত্তির দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে। তাই, তার কর্ম্মধারা তার অধীন নয়, ঐ কর্ম্মধারা তার প্রবৃত্তির dynamic motion (গতিবেগ)-এর অধীন। তা মানুষকে যে-পরিণতির পথে নিয়ে চলে, মানুষ সাধারণতঃ যন্ত্রচালিতবৎ হ'য়ে সেই পথেই চলতে বাধ্য হয়। শুনেছি এই ধরণের একটা সুন্দর গল্প আছে এই সম্বন্ধে। এক সাধু ছিল। ইঁদুরে তার কৌপীন কেটে ফেলত। তাই ইঁদুর মারার জন্য সে একটা বিড়াল পুষল। বিড়ালের জন্য দুধের প্রয়োজন। তাই সে একটা গরু পুষল। রান্নাবাড়া, গরু-পোষা সব কাজ তার একার পক্ষে করা কঠিন, তাই সে বিয়ে করল। বিয়ে ক'রে ছেলেপুলে হ'লো। তাদের খেতে-পরতে দিতে হবে। তাই সাধন-ভজন গেল চুলোয়। পেটের ধান্ধায় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ায়। একটার লেজুড় হিসাবে এমনি ক'রে অনেক কিছুই এসে পড়ে। এই হ'লো প্রবৃত্তির dynamics (গতি-বিজ্ঞান)-এর ধারা। এর নিরসন না করলে নিস্তার নেই। তাই গীতায় আছে

'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' হওয়ার কথা। অর্থাৎ, প্রবৃত্তির কন্ডুয়ন থেকে যে-চলন ও প্রচেষ্টার সুরু হয়েছে হয় তা' বর্জ্জন করতে হবে, নয় ইষ্টমুখী ক'রে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি সংসার করা বা কোন কাজ করাকেই খারাপ বলি না, কিন্তু তা' যদি ইষ্টার্থে বা ঈশ্বরার্থে না হ'য়ে নিজ কামনা চরিতার্থ করবার জন্য হয়, তবে তা' যে কোথায় ঠেলে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই।

Love-এর (ভালবাসার) মধ্যে আছে surrender, নিজেকে ইষ্টের কাছে সঁপে দেওয়া। তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিলে তখন কর্ম্মও হয় তাঁরই জন্য। হীন স্বার্থবুদ্ধির থেকে কর্ম্ম করলে মানুষের চলন হয় অন্ধ। কিন্তু ইষ্টে যুক্ত হ'য়ে ইষ্টার্থে যা'-কিছু করলে, তখন চলন হয় চক্ষুষ্মান। তাতে ভুল-ত্রুটি কম হয়, কৃতকার্য্যতাও সহজ হয়। আবার, ইষ্টার্থে যে যত নিজেকে খালি ক'রে দেয়, প্রকৃতিও তাকে তত ভ'রে দিতে থাকে। কারণ, nature abhors vacuum (প্রকৃতি শূন্যতাকে অপছন্দ করে)। তাই, আমার মনে হয় God-centric (ঈশ্বর-কেন্দ্রিক) বা prophet-centric (প্রেরিত-কেন্দ্রিক) হওয়াই সত্যি-সত্যি self-centric (আত্মস্বার্থী) হওয়া, আর সংকীর্ণতাবশতঃ self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হওয়া মানে নিজের সত্তা, স্বার্থ, শক্তি ও আনন্দকে চিতায় তুলে দেওয়া।

একটু আগে পন্ডিতভাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন তামাক খাচ্ছেন। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হওয়া আমার এই তামাক খাওয়ার মতো। সারাদিন টানি, টানতে-টানতে মুখ ব্যথা হ'য়ে যায়, লাভ হয় না কিছু, ফাঁকতালে মাথা গরম হ'য়ে যায়, অথচ তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছাড়তেও ইচ্ছে করে না, একটা লোভ থাকে ভীষণ (বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে ফেললেন)। শেষের কথাগুলির তরজমা না করায় মা-টি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাসির তাৎপর্য্য বুঝতে পারছিলেন না। তাই তিনি প্রফুল্লর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

প্রফুল্ল তামাক খাওয়া সম্পর্কিত কথাগুলির ইংরাজী তরজমা ক'রে দেওয়ার পর মা-টিও আপন মনে হেসে ফেললেন। তারপর প্রফুল্লকে বললেন—আপনি দয়া ক'রে ঠাকুরের একটা কথাও অনুবাদ করতে বাদ দেবেন না। আমরা একটা রসাল উপমা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম আর কি !

আর-এক বার সমবেত হাসির হিল্লোল ব'য়ে গেল সারা ঘরে।

মিস্ শিমার—অনেক সময় মানুষ বুঝতে পারে যে কি তার করা উচিত, কিন্তু সে-পথে চলতে গেলে যে-শক্তির প্রয়োজন, তা' সে আয়ত্ত করতে পারে না। এই জন্যই ঘটে তার পরাজয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারা মানে না-পারাকে অতিক্রম করা। He is to exert more (তাকে আরো বেশী চেষ্টা করতে হবে), তাহ'লে gradually (ক্রমশঃ) wiser

(বিজ্ঞতর) হবে। বুঝবে how to exert properly (কেমন ক'রে বিহিতভাবে চেষ্টা করতে হয়)। যেভাবে যতখানি চেষ্টা করলে success (সাফল্য) tangible (বাস্তব) হ'য়ে ওঠে, তা' যদি কেউ পুরোপুরি নাও করতে পারে, তাহ'লেও সে যতটা করে, তা' নিষ্ফল হ'য়ে যায় না। Adjusted action (নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম) থেকে আসে knowledge (জ্ঞান), adjusted knowledge (নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান) থেকে আসে experience (অভিজ্ঞতা), আবার adjusted meaningful experience (নিয়ন্ত্রিত অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা) থেকে গজিয়ে ওঠে wisdom (প্রজ্ঞা)। একটা না-করা বা ভুল চলার ফলে মানুষের যদি একটা negative experience (নেতিবাচক অভিজ্ঞতা)-ও হয় এবং তৎসঞ্জাত শিক্ষাকে যদি সে জীবন-চলনার ক্ষেত্রে profitably utilise করে (লাভজনকভাবে কাজে লাগায়) তাহ'লেও সে উপকৃত হ'তে পারে। চাই যেমন ক'রে যতটুকু সম্ভব হয় চলতে থাকা, করতে থাকা। আর চাই, সঙ্গে-সঙ্গে observation (পর্য্যবেক্ষণ) ও analysis (বিশ্লেষণ) চালিয়ে যাওয়া—যাতে ধরতে পারা যায় কিসে কী হয়। এই বোধ যদি না ফোটে, তাহ'লে সাময়িক success (সাফল্য) আসলেও তার উপর mastery (আধিপত্য) আসে না।

মিস্ শিমার—ইচ্ছাশক্তির উদয় হয় কিভাবে ? তা' বৃদ্ধি করার পথ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love (ভালবাসা)-ই পথ। একটি মেয়ে হয়তো অলস ও ঢিলে, তা'ছাড়া ঘুম-কাতুরে। বাপ-মা কত ব'লে-ব'লেও হয়তো তাকে ভোরে ঘুম থেকে ওঠাতে পারেনি। সেই মেয়েরই ভাল বিয়ে হ'লো। সে মনোমতো স্বামী পেল। তার উপর টান পড়ল। তখন দেখা যাবে স্বামীর খুশির জন্য তার কর্ম্মতৎপরতার অন্ত নেই। ভোর থেকে উঠে কাজে লেগে যাচ্ছে। নইলে যে স্বামীকে সময়মতো জলখাবার দিতে পারবে না, ভাত দিতে পারবে না। শত উপদেশেও যে একদিন চেতেনি, ভালবাসার টানে সে এখন নিজে থেকেই সচেতন হ'য়ে উঠেছে। তাই-ই জুগিয়েছে তাকে শক্তি, যা' তাকে নিজের দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করার সামর্থ্য দিয়েছে। ভালবাসা এইভাবে অসাধ্য সাধন করায় মানুষকে দিয়ে। ভালবাসার পাত্র যত sublime (মহৎ) হয়, তার sublime wish (মহৎ ইচ্ছা)-গুলি fulfil (পূরণ) করতে গিয়ে, মানুষের will ও effort (ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা) তত tremendous (প্রচণ্ড) হ'য়ে ওঠে। শুনেছি, স্বামী বিবেকানন্দ নাকি এক সময় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যাতে তিনি সর্ব্বদা সমাধিমগ্ন হ'য়ে থাকতে পারেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁর সেই অভিপ্রায় অনুমোদন না ক'রে পৃথিবীর মানুষের জন্য যে তাঁর অনেক কিছু করবার আছে, সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকের মঙ্গলের জন্য বিবেকানন্দ স্বামীজীর মধ্যে যে তীব্র কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখা যায় তার মূলে আছে কিন্তু ঠাকুরের প্রেরণা এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভালবাসা। রামচন্দ্রের জন্য হনুমান, রামদাসের জন্য শিবাজী কি কাণ্ডটাই না করল। তাঁদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির পিছনে ছিল তাদের টান।

হাউজারম্যানদা—আপনি adjusted action-এর (সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মের) কথা বলেন, সে-জিনিসটা কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হয়তো তোমাকে খাবার জন্য জল আনতে বললাম। এখানে ঘটি নেই। তুমি তাড়াতাড়ি একটা ঘটি জোগাড় করলে। ঘটিটা ময়লা, তা তুমি ভাল ক'রে সাফ ক'রে নিলে। তারপর যে-জল খাওয়া যায়, যে-জল খেলে শরীরের কোন ক্ষতি করে না, তেমনতর জল তাড়াতাড়ি নিয়ে আসলে। তাড়াতাড়ি আনলে এইজন্য বেশী দেরী হ'লে তেষ্টায় আমার কষ্ট হবে। এইভাবে সবদিক ভেবে-চিন্তে, সবদিকের সুরাহা ক'রে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপযোগী ক'রে ক্ষিপ্রগতিতে সাশ্রয়ী রকমে সুচারুভাবে কাজ সম্পন্ন করাকেই বলে adjusted action (সুনিয়ন্ত্রিত কাজ)। এমন জায়গায় তুমি পড়তে পার যেখানে হয়তো জল আছে ঘটি জোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন তুমি একটা পাতার ঠোঙ্গা ক'রে জল আনলে। Adjusted action-এর (সুনিয়ন্ত্রিত কাজের) সঙ্গে তাই জড়িয়ে থাকে সংগ্রহপটুতা ও উদ্ভাবনী বুদ্ধি। Purpose to the principle (আদর্শানুগ উদ্দেশ্যপ্রাণতা) যার যত অমোঘ, efficiency (দক্ষতা) তার তত keen (তীব্র)।

হাউজারম্যানদা—Unadjusted action-এর (অনিয়ন্ত্রিত কাজের) রকম কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একজনকে বললাম তামাক খাব। তার হয়তো কলকে, তামাক, টিকে ও আগুনের সমাবেশে কিভাবে তামাক সাজতে হয় তার ক্রম-সম্বন্ধে খেয়াল নেই। আগেই টিকে ধরিয়ে সেইটে পুড়িয়ে ফেলল, তারপর খোঁজ পড়ল তামাকের। তামাক কোথায়, তামাক কোথায় ব'লে সোরগোল সুরু ক'রে দিল। তারপর কলকে কোথায় ব'লে ছুটোছুটি। এতক্ষণে টিকে নিভে যাবার উপক্রম। এইভাবে তামাক সাজতে গিয়ে একটা হট্টগোল কাণ্ড। আমিও তাকে তামাক আনতে ব'লে বেকুব ও বিব্রত। এ-দিয়ে বোঝা যাবে যে আমাকে তামাক খাওয়াবার লোভটা তার প্রবল নয়। তখনও আমার প্রতি তার ভালবাসাটা sterile (বন্ধ্যা)। তাই, আমার জন্য কাজ করতে গিয়ে সে আগ্রহদীপ্ত হ'য়ে কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কারও কাজ এলোমেলো দেখলে বুঝে নিও, তার ভালবাসা কোথাও rightly set (ঠিকভাবে বিন্যস্ত) হয়নি।

মিস্ শিমার—সৌন্দর্য্যের মূল তত্ত্ব কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' সত্তাকে তৃপ্ত, হৃষ্ট, পুষ্ট ও সন্দীপ্ত করে তাই-ই সুন্দর। যা' মনকে আকৃষ্ট করে, অথচ সত্তাকে পরিতুষ্ট ও পরিপুষ্ট করে না, তা apparently beautiful (দৃশ্যতঃ সুন্দর) হ'লেও beauty-র (সৌন্দর্য্যের) দিক দিয়ে খাঁকতিদুষ্ট।

মিস্ শিমার—শিল্পকলার রীতি কেমন হওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিল্পকলার কাজ হ'লো সূক্ষ্ম বোধ ও অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে জীবনচলনাকে সুসমঞ্জস ও সমৃদ্ধ ক'রে তোলা। যে art (কলা) তা' করে না,

তা' lifeless art (নিষ্প্রাণ কলা)। একজন একটা ফুল আঁকলো, সেই আঁকা দেখে মানুষ যদি জীবনকে flowery (পুষ্পময়) ক'রে তোলার প্রেরণা না পায়, তাহ'লে ঐ অঙ্কন জীবনহীন ও নিরর্থক। এমন-এমন ছবি আঁকা যায়, এমন-এমন শিল্পকলার সৃষ্টি ক'রে তোলা যায়, যা' জীবনকে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলতে সাহায্য করবেই কি করবে।

মিস্ শিমার—শিল্পকলার ক্ষেত্রে মহৎ উদ্দেশ্য বা প্রেরণা বাদ দিয়েও তো শিল্পী বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের সার্থক-রূপায়ণ ঘটাতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারও মূল্য আছে যদি তাতে life (জীবন) থাকে, যদি তা' life (জীবন)-কে beautify ক'রে (সুন্দর ক'রে) তোলে, spirit (অন্তরপুরুষ)-কে চেতিয়ে তোলে। Art (শিল্পকলা) যেমন ভাল করতে পারে, তেমনি খারাপ করতে পারে। Art (শিল্পকলা) যদি এমন হয় যে তাতে মানুষের satanic complex (শয়তানী প্রবৃত্তি) nurture (পোষণ) পায়, তাহ'লে তা' misuse of artistic talent (শিল্প প্রতিভার অপব্যবহার) ছাড়া আর কিছু নয়।

মিস্ শিমার—তাহ'লে সঙ্গীতও তো এইরকম হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! যে-কোন জিনিস সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। যে-কোন জিনিসকেই সত্তাপোষণী রকমে ব্যবহার করাও যেতে পারে আবার সত্তার ক্ষতিকারক রকমেও তার ব্যবহার করা যেতে পারে। যা'-কিছুর সত্তাপোষণী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধে বোধই ধর্ম্মবোধ। এই ধর্ম্মবোধ যার সত্তায় গেঁথে যায়, এই ধর্ম্মবোধই যার চলনার নিয়ামক হয়, তার আর ভাবনা নেই।

হাউজারম্যানদা—সার্থক সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যখন কার্য্যকারণ-সম্পর্ক জেনে একটা কিছু create (সৃষ্টি) করতে পারি which is useful to man (যা' কিনা মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়), তাকেই বলে meaningful adjusted knowledge (অর্থপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান)। ধর, আমি স্বতন্ত্রভাবে চামড়াও জানি, সুতোও জানি, বোতামও জানি এবং মানুষের টাকা রাখার জন্য থলের প্রয়োজনের কথাও জানি, আমি এই বিচ্ছিন্ন জানাগুলিকে সমন্বিত ক'রে, সমাহিত ক'রে, বিন্যস্ত ক'রে চামড়ার মানি-ব্যাগ তৈরী করলাম। এর আগে এ-জিনিস কোনদিন চালু ছিল না। আমি মাথা খাটিয়ে বের করলাম প্রথম। একেই বলে meaningful adjusted knowledge (অর্থপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান)। আলাদা-আলাদা বস্তু-সম্বন্ধে আলাদা-আলাদা জ্ঞান এখন integrated ও organised (সংহত ও সংগঠিত) হ'য়ে নূতন তাৎপর্য্যবাহী হ'য়ে উঠলো to the benefit of man (মানুষের উপকারার্থে)। লোকের সুখ, স্বস্তি ও সুবিধা সাধনের গরজই কিন্তু আমার জ্ঞান, বোধ ও কর্ম্মের রাজ্যে এই অগ্রগতি ঘটালো। Adjusted knowledge (সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান) থেকে আসে adjusted experience (সুনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা), thereafter begins the domain of wisdom (তারপর সুরু হয় প্রজ্ঞার রাজ্য)।

প্রমথদা (দে)—Adjusted experience (সুনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা) জিনিসটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি হয়তো পাঁচটা মানি-ব্যাগ তৈরী ক'রে সমীচীন লাভ রেখে তা' বিক্রয় করলেন এবং নিজের ও পরিবেশের পক্ষে ভাল হয় এমনতর কাজে ঐ লাভের পয়সা খরচ করলেন। এতে আপনার অভিজ্ঞতা হ'লো কেমনভাবে পরিবেশের প্রয়োজন পূরণ ক'রে তাদের সন্তুষ্ট ও লাভবান ক'রে নিজে লাভের অধিকারী হওয়া যায়। আবার, ঐ সাধু অর্জ্জনের কল্যাণকর ব্যবহার কেমন ক'রে করতে হয়, সে অভিজ্ঞতাও আপনার হ'লো। সপরিবেশ বাঁচা-বাড়াই যদি হয় মানুষের কাম্য সে-দিক দিয়ে এই কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ সার্থক, সঙ্গতিশীল, অন্বয়ী ও উদ্দেশ্যপূরণী হ'য়ে উঠল। একটা ব্যাপারেও যদি মানুষের এমনতর adjusted experience (সুনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা) হয়, ঐ অভিজ্ঞতার আলোকে সে অন্যান্য ব্যাপারকেও ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারকে যখন মানুষ ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ইষ্টের আপূরণী সার্থকতায় একসূত্র-সঙ্গত ক'রে তুলতে পারে, তখনই আসে তার wisdom (প্রজ্ঞা)। তখন যে-কোন problem (সমস্যা)-ই তার সামনে উপস্থিত হো'ক না কেন, তা' তাকে বিব্রত ও অভিভূত করে কমই, ঐ দাঁড়ায় ফেলে সে যথাসত্বর তার solution (সমাধান) করার দিকে এগিয়ে যায়। এমনি ক'রে সে হয় solved man (সমাহিত মানুষ)। সমস্যাচ্ছন্ন মানুষ তার কাছে এসে সমস্যা সমাধানের পথ পেয়ে যায়। তবে সমস্যার সমাধানের জন্য যে আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, তা' করতে যারা রাজী না থাকে, সমাধানের পথ পাওয়া সত্ত্বেও সমস্যা তাদের কাছে সমস্যাই থেকে যায়। কারণ, সমস্যার সমাধানের জন্য যেমন প্রয়োজন বাহ্যিক বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার, তেমনি প্রয়োজন চারিত্রিক বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার।

মিস্ শিমার—সমস্ত কিছু নেয় কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর— মোক্ষে, মোক্ষ বলতে আমি বুঝি surrendered life (আত্মসমর্পিত জীবন)। পরমপিতার কাছে যখন আমরা নিজেদের সঁপে দিই, তাঁকে যখন অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব দিই—তাঁর ইচ্ছামতো আমাদের অস্তিত্বকে ব্যবহার ও নিয়োগ করতে, যখন আমরা পুরোপুরি তাঁর হাতে থাকি, তাঁর হ'য়ে চলি, তখন আমরা প্রবৃত্তির শাসন ও প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পাই। বৃত্তিগুলি তখন কিন্তু মুছে যায় না। সেগুলি তখন হয় তাঁর সেবক। সত্তা তখন আপন জেল্লা নিয়ে জ্বলজ্বল করে। ব্যাপারটা কেমন হয়, বলি—চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রের উপর। যে-অংশের উপর ছায়া পড়ে, সে অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। পূর্ণিমার চাঁদের যে নিটোল চেহারা, তা' আর আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু ছায়া যখন স'রে যায়, তখন পূর্ণিমার চাঁদের পূর্ণরূপ আবার ধরা পড়ে। আমাদের দেশে বলে চাঁদ রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত হ'লো। ইষ্টের উপর সর্ব্বপ্লাবী টান হ'লে ঠিক অমনতরই হয়। সত্তার পূর্ণ জ্যোতি তখন প্রকাশিত হয় এবং ইষ্টের অভিপ্রায়পূরণে অর্থাৎ লোকমঙ্গলসাধনে তা' যে কি দুর্ব্বার

শক্তি হিসাবে কাজ করে, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। বীর হনুমান, সেণ্ট পল, আলি, ওমর, আবুবকর, নিত্যানন্দ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি ভক্ত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মিস্ শিমার—কার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender (আত্মসমর্পণ) করতে হবে Lord Christ-এর (প্রভু যীশুর) কাছে। মানুষের সামনে মানুষের দরকার হয়। আজকের দিনে যদি কোন মানুষের মধ্যে Christ (খ্রীষ্ট)-এর প্রতি পূর্ণ নতি ও তাঁর নীতি-অনুযায়ী নিখুঁত চলন দেখতে পাই, তবে তাঁর ভিতর-দিয়ে আমরা Christ (খ্রীষ্ট)-কে feel (অনুভব)করতে পারি।

মিস্ শিমার—আমরা সবাই তো এক থেকে উদ্ভুত, একের মধ্যেই তো আমরা নিহিত ছিলাম, কেন আমরা সেখান থেকে পৃথক হলাম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যতই পৃথক হই, পৃথক হ'য়েও আমরা একই থাকি—যদি আমরা একাকে স্বীকার করি, তাঁকে ভালবাসি। একাকে যদি স্বীকার না করি, ভাল না বাসি, বরং তাঁকে বাদ দিয়ে complex (প্রবৃত্তি বা Satan (শয়তান)-কে যদি Lord of life (জীবনের প্রভু) ক'রে তুলি, তবে পার্থক্য ও বিভেদটাই প্রবল হয়, পারস্পরিক ঐক্যবোধ ও প্রীতি উবে যেতে থাকে। পরস্পর-পরস্পরের সহায়-সম্পদ না হ'য়ে ক্ষয় ও ক্ষতির উৎস হ'য়ে উঠি। সবার অস্তিত্বই বিপন্ন হ'য়ে ওঠে! একেই বলে ধর্ম্মের গ্লানি। কিন্তু সেই মূল এক এত হয়েছেন বহুর মধ্য-দিয়ে বহুভাবে নিজেকে অনুভব করবেন ব'লে, উপভোগ করবেন ব'লে। নিজেদের বুদ্ধির দোষে তাঁর সে-অভিপ্রায়কে আমরা পণ্ড ক'রে দিচ্ছি, ফলে আমাদের জীবনও পণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে। তাই বলি, তাঁর দাঁড়ায় দাঁড়াতেই হবে আমাদের, নইলে কোন বুদ্ধিতেই কুলোবে না। নিষ্ঠুর নিয়তি চারদিক দিয়ে গ্রাস করবে। তিনি চান লীলা—আলিঙ্গন ও গ্রহণ। We have been born to embrace and receive creation, otherwise we cannot survive, feel and enjoy (আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সৃষ্টিকে আলিঙ্গন ও গ্রহণ করতে, নচেৎ আমরা বাঁচতে পারি না, অনুভব করতে পারি না, উপভোগ করতে পারি না)। Creation-এর (সৃষ্টির) মধ্যে creator (স্রষ্টা) থাকেন, তাই creation (সৃষ্টি)-কে ignore (উপেক্ষা) ক'রে creator (স্রষ্টা)-কে আমরা পাই না। আবার, আমান চেতনা নিয়ে রক্তমাংস-সঙ্কুল নরদেহ নিয়ে creator (স্রষ্টা) কখনও-কখনও creation (সৃষ্টি)-কে পথ দেখাতে আসেন, এটাও একটা tremendous truth (প্রচণ্ড সত্য)। তিনিই জীবনের পথ। তিনি দেখিয়ে যান কেমন ক'রে উৎসাসীন থেকে সবাইকে আলিঙ্গন, গ্রহণ ও সেবা ক'রে চলতে হয়। তাই বাঁচার মুখ্য পথ হ'লো তাঁকে আলিঙ্গন, গ্রহণ ও সেবা করতে নিরত থাকা এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা-কেমন ক'রে তাঁতে নিবিষ্ট থেকে জগৎকে আলিঙ্গন, গ্রহণ ও সেবা করতে হয়। তাঁকে যখন পাই তখন মনে হয় তোমা থেকে আমি কখনও আলাদা হ'য়ে থাকব না, তোমাকে আমার ভিতর তুমি ক'রে ভ'রে নেব,—আমি ক'রে নয়, আর তোমাকে আমি চিরদিন সেবা ক'রে

চলব, যেমন করলে তুমি সুখী হও তেমনি ক'রে, আমার খুশিমতো নয়। এর মধ্যেই আছে enjoyment (উপভোগ)। Love (ভালবাসা) চিরদিন চায় অপরকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরতে, সেটা অপরের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য লোপ ক'রে নয়, তাকে অক্ষুন্ন রেখে, উৰ্দ্ধৰ্দ্ধিত ক'রে। প্রিয়ের স্বস্তি ও তৃপ্তিই হয় তার স্বার্থ। আপন খেয়াল চরিতার্থ করার বালাই তার থাকে না। ওর থেকে রেহাই পেলেই মানুষ অনেকখানি হাল্কা ও ঝরঝরে হ'য়ে যায়, অনেকখানি মুক্তির স্বাদ টের পায়! কাউকে ভালবাসলে স্বতঃই তাঁর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাকেই বলে যাজন। ইষ্টানুরাগী মানুষ তাই যাজনমুখর হবেই। যাজনের ভিতর-দিয়ে সে ইষ্টকেই enjoy (উপভোগ) করে। ইষ্ট হলেন প্রতিপ্রত্যেকের সত্তা-স্বরূপ। সোহাগের সঙ্গে সত্তার রূপ স্বরূপের কথা যখন কেউ ব'লে, তখন যারা শোনে তাদেরও সত্তা ক্ষণিকের জন্য হ'লেও নাড়া দিয়ে ওঠে। তাই, তারাও enjoy (উপভোগ) করে। যাজন বড় জবর মাল। Christ (খ্রীষ্ট) কবে গত হয়েছেন। কিন্তু আজও যখন তন্ময় হ'য়ে তাঁর কথা আমরা বলি ও শুনি, তখন তাঁকে অনুভব করতে পারি, উপভোগ করতে পারি। এ-অধিকারটুকু জীবের আছে। তাই Christ (খ্রীষ্ট) এবং তঁজ্জাতীয় যাঁরা, তাঁদের যাজন যত এস্তার হ'য়ে ওঠে, ততই মঙ্গল। লোকের ভাল যারা চায়, তাদের এটা করাই চাই।

অপূর্ব আবেগের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনর্গল ব'লে চলেছেন কথা। তাঁর চোখ-মুখে, কণ্ঠস্বরে, দেহের দোলনে করুণা ও প্রীতি মূর্ত্তিমতী হ'য়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে সারা বিশ্বকে একযোগে আলিঙ্গন ও গ্রহণ করবার জন্য তাঁর মনপ্রাণ অধীর ও উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। তাঁর সান্নিধ্যে সকলের মন এখন প্রীতিমাধুর্য্যে মগ্ন।

ইত্যবসরে হাউজারম্যানদার মা আর-একজন ভদ্রমহিলাসহ আসলেন। মা-টির নাম মিস্ মার্টিন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নার্সিং সারভিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

হাউজারম্যানদার মা মিস্ শিমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'লো?

মিস্ শিমার—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধ'রে এবং অনেক বিষয়ে।

হাউজারম্যানদার মা—ঠাকুরের চিন্তাধারার সঙ্গে তোমার চিন্তাধারার মিল হ'লো?

মিস্ শিমার—অমিল হয়নি। তবে আমার মনে হ'লো ঠাকুরের কথাগুলি যেমন অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি যুক্তিযুক্ত। তাই কোথাও মতভেদের অবকাশ থাকলেও তাঁর প্রত্যেকটি কথা সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। একটা বিষয় আমার সব চাইতে ভাল লাগছে যে ঠাকুরের সঙ্গে এত বিষয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, কিন্তু গোড়া থেকে তিনি সমান আগ্রহ ও সহৃদয়তার সঙ্গে আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিয়ে চলেছেন। নবাগত ও অপরিচিতের প্রতি এতখানি সৌজন্য ও মনোযোগ সাধারণতঃ দুর্লভ। ঠাকুর যত বিষয়ে যতগুলি কথা বলেছেন, সেগুলির মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা তো নেই-ই বরং অপূর্ব সঙ্গতি আছে। অভ্রান্ত চিন্তাশীলতার এটা একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এমনতর মানুষের সঙ্গে আলোচনা মানুষের মস্তিষ্কশক্তি ও

চিন্তাশক্তির উন্নতিসাধনে সহায়তা করে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যে আপনি আমাকে এই অনন্যসাধারণ সুযোগ ক'রে দিয়েছেন।

হাউজারম্যানদার মা—আপনি এখানে এসে খুশি হয়েছেন, এতেই আমি আনন্দিত।

মিস্ মার্টিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভারতবর্ষে আরো বহুসংখ্যক উন্নততর ধরণের হাসপাতাল ও নার্স প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের করার শৈথিল্য আছে বহুদিকে। অপরের উপর নির্ভর না ক'রে যা' করণীয় তা' নিজেরা ক'রে নেবার আগ্রহ ও উদ্যম যত বেড়ে যাবে, ততই সব গজিয়ে উঠবে। জীবনকে safe and secure (নিরাপদ) ক'রে তোলার জন্য অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়, কিন্তু ignorance (অজ্ঞতা), indolence (আলস্য), dependence (পরনির্ভরশীলতা) ও fatalism (অদৃষ্টবাদ)-এর দরুন সবদিকে আমাদের মাথা ও চেষ্টা এখনও সজাগ হয়নি। এখন নিজেদের উপর দায়িত্ব পড়েছে, ধীরে-ধীরে সব হবে।

হাউজারম্যানদার মা—মিস্ মার্টিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের নার্সিং-শাখাকে সুগঠিত ও উন্নত ক'রে তুলতে বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। নার্সিং হ'লো মায়ের কাজ। নার্সিং যাঁরা করবেন তাঁদের সব চাইতে বেশী যা' প্রয়োজন তা' হচ্ছে দরদ, মমতা, রোগীকে relief (স্বস্তি) দেবার প্রবল আগ্রহ ও তীক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। অনেক সময় রোগী নিজে ঠিক পায় না, কিসে সে আরাম পাবে। শুশ্রূষাকারিণীর তখন তাকে দেখে বোঝা চাই, কি ব্যবস্থা করলে সে আরাম পেতে পারে। শুধু রুটিনবাঁধা কাজ করলে রোগীর খুশি হয় না। প্রত্যেকটি রোগী চায় individual care and attention (ব্যক্তিগত যত্ন এবং মনোযোগ)। হাসপাতালে বহু রোগীকে যেখানে দেখতে হয়, সেখানে এই জিনিসটি সহজসাধ্য নয়। কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গেই এমনভাবে ব্যবহার করা চলে, যাতে সে তৃপ্তি পায়। তবে কোন নার্সের উপর বেশী-সংখ্যক রোগীর দায়িত্ব থাকা ভাল নয়। তাহ'লে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সকলের প্রতি justice (সুবিচার) করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। তাই হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়ানই ভাল। হাসপাতালে যেমন নার্সের সংখ্যা বাড়াতে হয়, স্কুলে তেমনি শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়ে ছোট-ছোট ক্লাস করতে হয়, যাতে প্রত্যেকটি ছাত্রের উপর proper attention (সমীচীন মনোযোগ) দেওয়া সম্ভব হয়।

মিস্ শিমার—ভগবানের লীলার মধ্যে দুঃখকষ্টের স্থান কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি জগতে এসে মানুষের মঙ্গলের জন্য কত sufferings and pains (দুর্ভোগ এবং কষ্ট) বরণ ক'রে নেন, এও তাঁর লীলা। আবার, মানুষ তাঁকে ও তাঁর principle (নীতি)-গুলিকে জগতে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কত দুঃখ-কষ্ট-নির্য্যাতন স্বীকার ক'রে নেয়, এও লীলার একটা দিক। এই ধরণের যে দুঃখকষ্ট, তার মধ্যে একটা গভীর সুখ আছে। কারণ, এ-কষ্ট মানে নিঃস্বার্থ প্রীতির মূল্যবহন।

এতে চরিত্র আরো নির্ম্মল হয়, উজ্জ্বল হয়। কিন্তু মানুষ তার দোষ, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা, স্বার্থান্ধতা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য যে কষ্ট পায় ও কষ্ট দেয়, সে কষ্ট অন্য ধরণের। তার মধ্যে সার্থকতার উপাদান কমই। তবু ভুল ক'রে মানুষ যখন অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করে, সে যখন পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য determined (কৃতসংকল্প) হয়, আর্ত্ত হ'য়ে সে যখন পরমপিতার শরণাপন্ন হয়, ক্ষত ও ক্ষতি সৃষ্টি করার যন্ত্রণাদায়ক অভ্যাস ভুলে গিয়ে সে যখন মানুষের দুঃখমোচনে মরিয়া হ'য়ে ওঠে, চণ্ডাশোক যখন ধর্ম্মাশোকে পরিণত হয়, রত্নাকর যখন বাল্মীকি হ'য়ে দাঁড়ায়, পাপাসক্ত অগষ্টিন যখন সেইণ্ট অগষ্টিন হ'য়ে পাপীর উদ্ধারসাধনে লেগে যায়, তখন আমরা দেখতে পাই ভুলভ্রান্তি, পতন ও দুঃখকষ্টই তাঁর লীলার রাজ্যের শেষ কথা নয়। মানুষ ইচ্ছা করলে যে-কোন মুহূর্ত্তেই ফিরে দাঁড়াতে পারে এবং দুঃখকেও সুখের কারণ ক'রে তুলতে পারে। ধরুন, রাগের বশে আমি কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি, কিন্তু যীশুর কথা স্মরণ ক'রে, আমি যদি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে ফেলি, তাহ'লে পরস্পরের অন্তরের জ্বালা মুছে গিয়ে তার স্থানে জাগে শান্তি। তবে বিপথে পা না বাড়ানই ভাল। অকাম করলে সেই কর্ম্মফলে নিজেরও কষ্ট, অপরেরও কষ্ট।

মিস্ শিমার—মাঝে-মাঝে মনে হয় সবই একটা খেলা। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সবই খেলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খেলা নয়, লীলা! লীলার মধ্যে creation (সৃষ্টি) আছে, preservation (রক্ষণ) আছে, destruction (ধ্বংস) নেই। Destruction (ধ্বংস) আনে satan (শাতন), যে কিনা God-এর (ঈশ্বরের) opposite pole-এ (বিপরীত প্রান্তে) দাঁড়িয়ে কাজ করে। God-hood (ঈশ্বরত্ব) হ'লো life-hood (জীবনত্ব)। Satan (শাতন) মানে death-hood (মৃত্যুত্ব)। ভগবান ধ্বংস করেন না আমাদের। আমাদের ধ্বংস করে আমাদের অজ্ঞ চলন, যার অপর নাম শাতন। অনন্ত জীবনকে আয়ত্ত করা অসম্ভব কিছু নয়, তা' এই দেহ নিয়েই হো'ক বা অক্ষত স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়েই হো'ক। যত আমরা পরমপিতার পথে চলব—জ্ঞানময় চেতনা ও প্রয়াসকে অক্ষুণ্ণ রেখে,—তত আমাদের স্বাস্থ্য, জীবন ও আয়ু বৃদ্ধি পাবে, আর বৃদ্ধি যদি না-ও পায়, অযথা আয়ুক্ষয় হবে না। সম্ভাব্য আয়ুর পূর্ণ সুযোগ আমরা পাব। বংশপরম্পরায় এইভাবে life-এর (জীবনের) span (পরিধি) বেড়ে যাবে। বিজ্ঞান সেই আশাকেই সমর্থন করে। জীবনকে বাদ দিয়ে লীলার অভিব্যক্তি হয় কী ক'রে? Life-urge-এর (জীবন-সম্বেগের) আর-এক নাম আত্মা। আর, এই আত্মার কখনও মৃত্যু নেই। মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে স্মৃতি-চেতনা-সমন্বিত নিত্য জীবনে স্থিতিলাভ করাই আমাদের তপস্যা।

হাউজারম্যানদার মা—শয়তান একটা স্বতন্ত্র শক্তি না আমাদের ব্যক্তিগত অসৎ-প্রবণতাই শয়তান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ব্যক্তিগত evil propensity (অসৎপ্রবণতা)-ই একটা tremendous force (প্রচণ্ড শক্তি) হ'য়ে ওঠে, যখন আমরা তার কাছে yield (নতি স্বীকার) করি। সেইটেই satanic force (শাতনী শক্তি) হিসাবে কাজ করে। ভিতরে বা বাইরে evil-এর (অসতের) কাছে yield (নতি স্বীকার) করলে, সেখান থেকেই শয়তান শক্তি পায়। নইলে শয়তানের নিজস্ব কোন শক্তি নেই, আমাদের সায় ও সহযোগিতাই তাকে শক্তি যোগায়। আমরা যদি love, life ও Lord (ভালবাসা, জীবন ও ভগবান)-কে আঁকড়ে ধ'রে থাকি এবং ভিতরে ও বাইরে অসৎ যা' তাকে প্রশ্রয় না দিই, তবে শয়তানের অস্তিত্ব কর্পূরের মতো উবে যাবে।

হাউজারম্যানদার মা—শয়তান ব'লে কি কারও অস্তিত্ব আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তানের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নির্ভর করে মানুষের will-এর (ইচ্ছা-শক্তির) উপর। কোন মানুষ যদি evil (অসৎ)-কে আমল না দেয় তাহ'লে সে থাকে না। ভিতরেই হো'ক, বাইরেই হো'ক evil (অসৎ)-কে resist (নিরোধ) করতেই হয়। নইলে তার খপ্পরে প'ড়ে যেতে হয়। যারা evil (অসৎ)-কে resist (নিরোধ) না করে, তারা প্রকারান্তরে শয়তানের শক্তিবৃদ্ধি করে।

এরপর হাউজারম্যানদার মা প্রমথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি রামকানালি গিয়েছিলেন ?

প্রমথদা—হ্যাঁ !

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা রামকানালি গেলে মাকে দেশ থেকে আনতে চেষ্টা করব। মা কাছে থাকলে খুব ভাল লাগে।

মা একটু হাসলেন।

এরপর ওরা তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোল তাঁবুতে এসে বসেছেন। একটু পরে হাউজারম্যানদা, তাঁর মা, মিস্ শিমার, মিস্ মার্টিন প্রভৃতি আসলেন।

মিস্ শিমার প্রশ্ন করলেন—ভারতবর্ষে অনেকে রোগনিরাময়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে। তার কি কোন সার্থকতা আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রায়শ্চিত্তও একরকমের treatment (চিকিৎসা)। বহু রোগের মূল গাড়া থাকে মানসলোকে। সেখানকার অসামঞ্জস্য দেহে আত্মপ্রকাশ করে। প্রায়শ্চিত্তের তাৎপর্য্য হচ্ছে চিত্তের গভীরে অবগাহন ক'রে সেখানকার imbalance (অসাম্য) ও error (ত্রুটি) অপনোদন করা। এটা একটা negative (নেতিবাচক) ব্যাপার নয়। আসল কথা হচ্ছে self-analysis ও meditation-এর (আত্মবিশ্লেষণ ও ধ্যানের) ভিতর-দিয়ে নিজেকে spiritually ও vitally (আত্মিক দিক দিয়ে এবং প্রাণশক্তির দিক দিয়ে) purified ও charged (পবিত্র ও শক্তিসমন্বিত) ক'রে তোলা। প্রায়শ্চিত্তের বিধানে আচার-নিয়ম ও খাদ্যাদি গ্রহণের বিধি এমনভাবে নির্দ্ধারিত থাকে, যে তার দ্বারা physical imbalance (শারীরিক অসাম্য)

অনেকাংশে দূরীভূত হয়। তদুপরি এর পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে যদি কোন ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন হয়, তা' খেতেই বা দোষ কী? মানুষ সাইকেলে চড়ে দ্রুত চলার জন্য। তার সঙ্গে যদি একটা মোটর ফিট ক'রে নেয়, তাহ'লে তা' হ'য়ে দাঁড়ায় মোটর সাইকেল। এতে সুবিধা বই অসুবিধা হবার কথা নয়। তবে কোনকিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করতে গেলে সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে তা' করতে হবে। সাইকেলে মোটর ফিট করতে গেলে তার হালকা ও পলকা চাকার জায়গায় ভারী ও শক্ত চাকা দিতে হবে, টায়ারের quality (ধরণ) বদলাতে হবে। এ-সব না করে যদি জোরদার মোটর ফিট ক'রে দিই তা হ'লে accident (দুর্ঘটনা) ঘটে যেতে পারে। তাই, প্রায়শ্চিত্তের বিধান যা'-যা' আছে তারমধ্যে addition, alteration (পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন) না ক'রে নিখুঁতভাবে তা' পালন করা ভাল। ওতে বোঝা যায় কিসে কী হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাব মনে হয় ওগুলি self-complete (স্বয়ংসম্পূর্ণ)। তবে স্থান-কাল পাত্রানুযায়ী সমীচীন বিশেষ ব্যবস্থা তো দোষণীয় নয়ই, বরং তা' কল্যাণকর। কিন্তু নিষ্ঠাবান বিজ্ঞ বোদ্ধা মানুষ ছাড়া যার-তার স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়ার অধিকার নেই।

•

প্রফুল্ল—শেষের বারো দিন আমি যখন প্রাজাপত্য করি, তখন আমার উপর প্রচণ্ড কাজের চাপ ছিল। সুষমাদির শরীর খারাপ থাকায় তাঁর পক্ষে হবিষ্যান্ন পাক ক'রে দেবার সুবিধা ছিল না। আমার তো সময় ছিলই না। সব কথা আপনাকে নিবেদন করায় আপনি বললেন, 'উপবাসের দিন বাদ দিয়ে অন্যান্য দিনগুলিতে যদি একবেলা ক'রে গুরুগৃহে প্রসাদ খাস, তাতেও বোধহয় হ'তে পারে। তবে শাস্ত্রে এর অনুমোদন আছে কিনা আমার জানা নেই। গোঁসাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস। সে যদি এতে অনুমতি দেয়, তাহ'লে তোদের বড়মাকে ব'লে ব্যবস্থা ক'রে নিস।' আমি গোঁসাইদাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি মহানন্দে সম্মতি দিলেন। পরে শ্রীশ্রীবড়মার সযত্ন তত্ত্বাবধানে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণের ভিতর-দিয়ে আমার শেষ প্রাজাপত্য উদ্‌যাপিত হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা যখন যার ক্ষেত্রে হে impulse (প্রেরণা) দেন, তখন তার ক্ষেত্রে আমি তাই করি, তাই বলি। পরমপিতাই মালিক। আমি কিছু না। তবু আমার মাধ্যমে যে নির্দ্দেশ তোমরা পাবে, তা' শত কষ্টসাধ্য হ'লেও পালন ক'রে চলো। আমার নির্দ্দেশ পালন করতে গিয়ে যদি আপাততঃ দুঃখ-কষ্ট-অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়, তাও বরণ ক'রে নেওয়া ভাল। যে-কষ্টে অনর্থের অবসান হয়, সে-কষ্ট অনর্থ-আমন্ত্রক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের থেকে অনেক বেশী কাম্য। আর, আমাকে তোমরা ভালবাস ব'লে আমার জন্য কষ্ট করতে পেরে তোমরা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করবে। বৌ-ছেলের প্রতি মানুষের মমতা থাকে, ভালবাসা থাকে, স্বার্থবোধ থাকে তাই হাসিমুখে তাদের জন্য মানুষ কত কষ্ট সহ্য করে। এত করে তবু সাধারণতঃ

কোন অনুযোগ থাকে না, অভিযোগ থাকে না, হামবড়াই থাকে না, অবশ্য যদি প্রীতি-প্রত্যাশা ব্যাহত না হয়।

মিস্ শিমার—ভালবাসা কি মানুষের অতীতকে বদলে দিতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বর্ত্তমানের character (চরিত্র) ও condition (অবস্থা) তার অতীতের চলা, বলা, চিন্তা ও কর্ম্মের resultant (সমষ্টিগত ফল) ছাড়া আর কিছু নয়। তার চলা, বলা, চিন্তা ও কর্ম্মের ধরণ যদি বদলে যায়, তবে তার character (চরিত্র) ও condition-ও (অবস্থাও) ধীরে-ধীরে বদলে যায়। ভালবাসাই এই পরিবর্ত্তন সাধনে সহায়তা করে—তা' ভালর দিকেই হো'ক আর মন্দের দিকেই হো'ক। তাই, সচেতনভাবে ইষ্টে ভালবাসা নিয়োজিত করতে হয়, তাতে অতীত কর্ম্মজাত অমঙ্গল মঙ্গলের দিকে সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। ইষ্টে ভালবাসা নিয়োজিত করার জন্যই দীক্ষা গ্রহণ ক'রে দৈনন্দিন করণীয়গুলি অনুশীলন ক'রে চলতে হয়। আবার, ভালবাসা যত পাকে ঐ করাগুলি তত spontaneous, habitual ও constant (স্বতঃ, স্বভাবগত ও নিরবচ্ছিন্ন) হ'য়ে ওঠে।

মিস্ শিমার—নিজের মঙ্গলের লোভে যদি কাউকে ভালবাসতে চেষ্টা করা হয়, সেটা তো স্বার্থপরতার সাধনা। স্বার্থপরতা এবং ভালবাসা কি একসঙ্গে চলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—বড় চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আপনি। আমি যে কথা বলতে চাই, সেই কথাতেই এসেছেন আপনি। ভালবাসা-সম্পর্কে আপনার conception (ধারণা) অতি clear (পরিষ্কার)। যাদের conception (ধারণা) এত clear (পরিষ্কার) নয়, তাদের জন্যও ব্যবস্থা চাই। তাদের উচিত বৈধী ভক্তির অনুশীলন ক'রে চলা। They should first have knowledge about the efficacy of love, so that their will to love may be enhanced (তাদের প্রথমে ভালবাসার কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা উচিত, য'াতে কিনা তাদের ভালবাসার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হ'তে পারে)। স্বার্থবোধ মূলতঃ খারাপ জিনিস নয়, তাই তাকে annihilate (বিনাশ) করতে চেষ্টা না ক'রে elevated, enlightened, expanded ও purified (উন্নত, আলোকপ্রাপ্ত, বিস্তারিত ও পবিত্র) ক'রে তোলার চেষ্টা করা ভাল। সত্তাস্বার্থী চলনই ধর্ম্ম। Lord-ই (প্রভুই) হ'লেন আমাদের inner Divine Self-এর (অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তার) প্রতীক। তাঁকে না ধরলে, তাঁকে ভাল না বাসলে, তৎস্বার্থী না হ'লে, সত্তাস্বার্থী হওয়ার অন্য কোন পন্থা বা উপায় নেই আমাদের। ঘুরে-ফিরে কোন-না-কোন প্রবৃত্তির কবলে প'ড়ে যাব আমরা। তাই, শাশ্বত বিধি অর্থাৎ যা' করলে যা হয়, তা' বলা লাগে, বোঝান লাগে সাধারণ মানুষকে। বৈধী পন্থায় চলতে-চলতে যখন ইষ্টের উপর, প্রভুর উপর ভক্তি-ভালবাসা গজায় তখন হীনস্বার্থ transformed (রূপান্তরিত) হয় ইষ্টস্বার্থে। তখনই ধৃতিপোষণী চলন অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পায় মানুষের জীবনে। পিপুলিয়া হরিদাসের গল্প আছে।

হরিনাম করতে-করতে স্বাভাবিকভাবে ভাবভক্তি ও অশ্রুপুলকের উদ্গম না হওয়ায়, সে নাকি হরিনাম করার সময় চোখে পিপুলের গুঁড়ো দিয়ে কাঁদত। এইভাবে হরিনাম করতে-করতে ও কাঁদতে-কাঁদতে একদিন তার চাপাপড়া ভক্তির প্রস্রবণ খুলে গেল। হরিনাম উচ্চারণ করতে আপনা থেকেই তাঁর চোখ জলে ভ'রে যেত। যেমন ক'রে হোক তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে—তা' মক্স ক'রেই হোক বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবেই হোক। যে তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ভালবাসে, সে তাঁকে প্রাণের তাগিদেই ধরে ও অনুসরণ করে। তা' না ক'রেই সে পারে না, তাই করে। লাভ লোকসানের তোয়াক্কা করে না। কষ্ট বা প্রলোভন তাকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। প্রাণ যার পরমপিতাকে নিয়ে মত্ত, কোন কষ্টই তাকে কাবু করতে পারে না, কোন প্রলোভনই তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, কোন ভয়ই তাকে ভীত করতে পারে না। তাই আমি বলি—অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও। ওর চাইতে বড় লাভ বা প্রাপ্তি ত্রিভুবনে আর কিছু নেই।

মিস্ শিমার—ধ্যানের জন্য কি গুরুর একান্ত প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! অবশ্য প্রয়োজন।

হাউজারম্যানদার মা—যোগ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগের মানে যাই হো'ক এর মূল কথা হলো love (ভালবাসা)।

মা—কার প্রতি ভালবাসা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Lord of life (জীবনেব প্রভু) যিনি তাঁর প্রতি ভালবাসা। আপনি যদি Lord Christ-কে (প্রভু যীশুকে) ভালবাসেন, তাহ'লে অন্যান্য prophet (প্রেরিত)-কেও আপনি ভালবাসবেন, তা' তিনি যখন যেখানেই আসুন না কেন। কোন সত্যিকার prophet-কে (প্রেরিতকে) যখন আমরা অস্বীকার করি, তখন আমরা Lord (প্রভু)-কেই sacrifice (ত্যাগ) করি।

মা—সেই যোগ-সম্বন্ধে আপনার কী মত যেখানে গুরু বা মধ্যস্থ কেউ নেই অথচ মানুষ ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে মনকে অন্তর্মুখী ক'রে তুলতে চেষ্টা করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-ভাবে চেষ্টা করা চলে কিন্তু মানুষের যদি গুরু ও গুরুভক্তি না থাকে, তাহ'লে মনটা একটু গভীরে গেলে মানুষ সহজেই তার মধ্যে গায়েব হ'য়ে যেতে পারে, তারপর আর আত্মচেতনা সজাগ রেখে সচেতন-প্রয়াসে আরো-আরো এগিয়ে যেতে পারে না। ঐ অবস্থায় complex-এর (প্রবৃত্তির) solution-ও (সমাধানও) হয় না, জ্ঞানও হয় না। অথচ মানুষ ছটাকে মাতালের মতো অল্পতেই বুঁদ হ'য়ে থাকে। Spiritual progress (আধ্যাত্মিক উন্নতি) অত্যন্ত elementary stage-এই (প্রাথমিক স্তরেই) খতম হ'য়ে যায়। গুরুভক্তি থাকলে মানুষ গভীর হ'তে গভীরতর অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছেও নিজেকে হারিয়ে ফেলে না, conscious effort (সচেতন-প্রয়াস) চালিয়ে যেতে পারে শেষ পর্য্যন্ত। গুরু যদি হন চরম অনুভূতি ও জ্ঞানসম্পন্ন আর তাঁর উপর শিষ্যের টান যদি হয় অকাট্য, তবে শিষ্যের আত্মপ্রসারণা অনন্ত প্রগতিতে

এগিয়ে যেতে পারে। আমরা আত্মবিলোপ চাই না, আমরা চাই আত্ম-উপলব্ধি, আত্মপ্রসারণা। চেতনাকে চরম স্তর পর্য্যন্ত দৃঢ় রাখতে রক্তমাংসসঙ্কুল সদ্‌গুরু চাই-ই, আর চাই ভালবাসার রজ্জু দিয়ে নিজেকে তাঁর সঙ্গে বেঁধে ফেলা। তীব্র গুরুমুখিতা না থাকলে সাধক মনের গহনে ঢুকে কত অবান্তর পথে ঘুরে-ঘুরে যে নিজের শক্তিকে ক্ষয় ক'রে ফেলতে পারে, তার কোন লেখাজোখা নেই। কেউ হয়তো সামান্য শক্তির অধিকারী হ'য়ে ভাগবানকে ভুলে গেল। সেই শক্তিকে নিয়োগ করল অর্থ, মান, যশ ও ভোগসুখের উপাদান আহরণে। কত রকমারি যে হয় তার কি ঠিক আছে? ফলকথা, গুরুবন্ধ ও গুরুবাধ্য হ'য়ে না থাকলে মানুষকে কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি বাস্তব জগতে নানাভাবে ভূতগ্রস্ত চলনে চলতেই হবে। ছেলেবেলায় আমি experiment (পরীক্ষা) হিসাবে চাঁদে মনঃসংযোগ ক'রে দেখেছি। সূচের ছেদায় মনঃসংযোগ ক'রে দেখেছি, নেতি-নেতি ক'রে দেখেছি, কিন্তু ভালবাসা ছাড়া আর কিছুতে বুক ভরেনি। যখনই নেতি-নেতি করেছি তখনই মনে হয়েছে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, সব গুলিয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে একটা প্রকাণ্ড শুষ্ক শূন্যতা বোধ করেছি, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে নিরাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছে। গুরুভক্তি নিয়ে গুরু-অনুজ্ঞাবাহী হ'য়ে চলার মতো সহজ সাধন আর হয় না। এর ভিতর-দিয়েই সব আপসে-আপ গজিয়ে ওঠে।

মা—যোগী কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগী মানে ভগবৎ-প্রেমী। যে তার সব-কিছু দিয়ে ও সব-কিছু নিয়ে পরমপিতাকে ভালবাসে সেই যোগী।

কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় প্যারীদা একটা ওষুধ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়াবার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে কী খবর?

প্যারীদা—ওষুধটা খাবার সময় হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা দাও। কি আর করা?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওষুধটা খেলেন।

একটু বাদে তিনি বললেন—বাইরের উপর dependence (নির্ভরতা) বাড়ে তা' আমার কোনদিন ভাল লাগে না। আগে সেবা দেওয়া ছাড়া সেবা নেওয়ার কথা কখনও ভাবিনি। পায়ের অসুখ হওয়ার পর থেকে পরনির্ভরশীল হ'য়ে পড়লাম। ইদানীং অসুখ-বিসুখের পাল্লায় প'ড়ে ওষুধ-পত্রের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছি। কিন্তু সেই চিকিৎসকই বাহাদুর চিকিৎসক যে রোগীকে যথাসম্ভব ওষুধের প্রয়োজনমুক্ত ক'রে দিতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে food (খাদ্য) নিয়ে আরো research (গবেষণা) হওয়া দরকার। আমার মনে হয় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুযায়ী যদি প্রত্যেকের food (খাদ্য) judiciously select (বিজ্ঞতার সঙ্গে নির্ব্বাচন) ক'রে দেওয়া যায়, তাহ'লে ওষুধের প্রয়োজন অনেক ক'মে যায়। সেকেলে কবিরাজরা এ-ব্যাপারে খুব পটু ছিলেন।

মা—ভগবান যীশু নিভৃত প্রার্থনাদির উপর জোর দিয়েছেন। এর সার্থকতা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মন সর্ব্বদা বাইরের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে নানাভাবে scattered (বিক্ষিপ্ত) হ'য়ে পড়ে, ঐ-সব বিক্ষেপ থেকে মনকে সরিয়ে এনে ঈশ্বরে একাগ্র যত করা যায়, ততই মনের শক্তি বাড়ে। আর, ঐ শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রায়িত মন দিয়ে পরমপিতার সেবা আরো ভাল ক'রে করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানকে উপলব্ধি করা, সেবা করা ও তাঁকে উপভোগ করা। আমরা ভগবানের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভক্তসত্তা লোপ ক'রে ফেলতে চাই না। তাহ'লে তাঁকে উপলব্ধি করার আনন্দ থাকে না, সেবা করার আনন্দ থাকে না, উপভোগ করার আনন্দ থাকে না। আমরা চাই—তিনি চিরসেব্য হ'য়ে থাকুন এবং আমরা তাঁর চিরসেবক হ'য়ে থাকি। আমরা চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে চাই। বৈষ্ণবরা ভক্তভগবানের নিত্য-সম্পর্কে বিশ্বাসী। তিনিও ফুরাবেন না, আমরাও ফুরাব না। অনন্তকাল স্ব-সত্তায় থেকে আমরা তাঁর পানে ছুটব, তাঁর সুখসাধনে রত থাকব। আর, এর ভিতর-দিয়ে তাঁকে আমরা অফুরন্তভাবে realise ও enjoy (উপলব্ধি ও উপভোগ) করব। আমার এই রকমটা ভাল লাগে।

মিস্ শিমার—কিন্তু তাঁকে উপভোগ করতে চাওয়াও তো আসক্তির পরিচায়ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে আনন্দগর্জ্জনে ব'লে উঠলেন—হোক তা' আসক্তি, আমি চাই তাঁর জন্য আমাদের প্রত্যেকের আসক্তি ও লোভ উত্তাল হ'য়ে উঠুক। এ কথা বলছি তার মানে আছে। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যেই নয়। ঈশ্বর কামনাও তেমনি কামনার মধ্যেই নয়। বরং ঈশ্বর-কামনাই আমাদের অন্য সব অবান্তর কামনার হয়রাণি থেকে বাঁচায়।

মিস্ শিমার—কিন্তু ব্যক্তিগত উপভোগের ইচ্ছাটা তো রইল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-ব্যক্তিগত ইচ্ছায় environment-এর (পরিবেশের) সকলে উপকৃত হয়, সে-ইচ্ছায় কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ নেই। সে-ইচ্ছা ভগবানের অভিপ্রেত ও অনুমোদনপুত। অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রদীপ যদি জ্বলতে চায় ও জ্বলে, তাতে সে শুধু নিজেই আলোকিত হয় না, আশেপাশের অন্ধকার দূরীভূত হ'য়ে সে-স্থানও আলোকিত হ'য়ে ওঠে। তেমনি অজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে একটা মানুষও যদি spiritually enlightened (আধ্যাত্মিকভাবে আলোকপ্রাপ্ত) হয়, তার মাধ্যমে তার পরিবেশও সেই আলোর সন্ধান পেতে পারে, অবশ্য যদি তারা চায়। আর, ভগবানকে উপভোগ করা তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা আমাদের চরিত্রকে ভগবানের উপভোগ্য ক'রে transformed (রূপান্তরিত) ক'রে তুলি। তাই এটা selfishness (স্বার্থ-পরতা) হ'লেও selfless selfishness (নিঃস্বার্থ স্বার্থপরতা)। ভগবৎসুখ-সুখিত্বই এর মূল কথা।

মিস্ শিমার—নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের ভজনায় আধ্যাত্মিক আলোকের স্ফুরণ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে আমাদের মন যে-স্তরে উন্নীত হ'য়ে আছে, বড়জোর সেই স্তরের আলোক পেতে পারি, কিন্তু তা' ছাড়িয়ে যেতে পারি না। ভগবানকে অর্থাৎ ভাগবৎ পুরুষকে প্রত্যক্ষভাবে ভক্ত যখন পায়, তখন কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর অন্তর্নিহিত বাস্তব তত্ত্বমূর্ত্তি সে বোধে উপলব্ধি করতে পারে, যেমন অর্জ্জুন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। শুনেছি সেইন্ট জন না কে যেন রোজ ভগবান যীশুর সামনে গিয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে ব'সে থাকতেন এবং অপলকনেত্রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। একদিন নাকি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—তোমার মুখে একটি কথা নেই, শুধু একদৃষ্টিতে চেয়ে থাক, তুমি ব'সে-ব'সে দেখ কী? তাতে তিনি নাকি বলেছিলেন—"I see love" (আমি ভালবাসাকে দেখি)। তিনি এ কথা বলেননি—"I see Christ" (আমি যীশুখ্রীষ্টকে দেখি)। আমার মনে হয় তিনি ব্যক্তি যীশুকে অবলম্বন ক'রে তাঁর অন্তর্নিহিত তত্ত্বমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই ঐ কথা বলেছিলেন।

মিস্ শিমার—কেউ যদি গুরুগ্রহণ না ক'রে অন্তরে ভগবান-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করে, তার কি আর গুরুগ্রহণের প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি অন্তরে ভগবানের অনুভূতি লাভ করে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে সে pure soul (পবিত্র আত্মা), তাই call of God (ভগবানের ডাক) feel (অনুভব) করতে পেরেছে। এর থেকে ধ'রে নেওয়া যায় যে সঠিক পথ ও সদ্‌গুরু-লাভের আশা ও সম্ভাবনা তার সমধিক। সাময়িক অনুভবের বিশেষ মূল্য থাকে না যদি character-এর transformation (চরিত্রের রূপান্তর) না হয়। সদ্‌গুরুর ভাবে ও প্রেমে দীর্ঘদিন অবিচ্ছিন্ন ও সক্রিয়ভাবে ম'জে থাকতে-থাকতে তবে গিয়ে চরিত্র তাঁর ভাবে রঞ্জিত হয়। নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকলে তখন বেচালে পা পড়ে কমই। ঐ অবস্থায়ও গুরুমুখিতা ক'মে গিয়ে অহংমুখিতা প্রবল হ'লে পতন ঘটতে পারে যে-কোন মুহূর্ত্তে। তাই জীবন্ত গুরুতে surrender (আত্মসমর্পণ) চাই-ই, নইলে অহং-এর চৌহদ্দি পার হওয়া দুষ্কর। আর, তা' পার না হ'লে পরমপিতা আমাদের ভিতর তাঁর আসন গাড়ার জায়গা পান না। একটা অতি সুন্দর গল্প আছে এই বিষয়ে। ধ্রুবের ডাকে ভগবান তাকে দেখা দেবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু ধ্রুব দীক্ষিত নয়, তাই তাকে দেখা দিতে পারছেন না। শেষটা ভগবান উপযুক্ত গুরু জুটিয়ে দিয়ে ধ্রুবের দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং তার পরে দর্শন দিলেন তাকে। তার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ যত সময় দেহধারী গুরুর কাছে মাথা না মোড়ে, তত সময় তার আত্মাভিমান যায় না। আর, ঐটি বড় হ'য়ে থাকলে ভগবান সেখানে পাত্তা পান না। ভগবান যীশু তাই বলেছেন—'None can come to the Father but through me' (আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে আসতে পারে না)। আবার, শিষ্যদের এমনতর কথাও বলছেন—'You have been so long with me and you do not know the Father!' (তোমরা আমার সঙ্গে এতদিন সঙ্গ করেছ, অথচ তোমরা পিতাকে জান না!) অর্থাৎ, তাঁকে জানলেই পরমপিতাকে জানা

হয়, তাঁকে পেলেই পরমপিতাকে পাওয়া হয়। আর, তাঁকে বাদ দিয়ে যত যাই করা হোক, তাতে পরমপিতাকে জানাও হয় না, পাওয়াও হয় না।

মিস্ শিমার—তাঁকে পাওয়া মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের নিষ্ঠাকে অবলম্বন ক'রে যখন তাঁর চলন আমাদের সব সময়ের জন্য পেয়ে বসে এবং কিছুতেই না ছাড়ে তখনই হয় তাঁকে পাওয়া। আদৎকথা, তিনিই সব সময় খুঁজছেন আমাদের, কিন্তু আমরা otherwise enchanted ও engaged (অন্যথা মুগ্ধ ও ব্যাপৃত) ব'লে তিনি আমাদের ধরতে পারছেন না। যখন আমরা তাঁর কাছে ধরা দিই, তিনি যখন আমাদের পান অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের সব will ও energy (ইচ্ছা ও উৎসাহ) নিয়ে তাঁর কাছে available (সহজপ্রাপ্য) হই, তাঁর দ্বারা guided, moulded ও used (পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত) হওয়াটাকেই জীবনের পরম সুখ ও সার্থকতা ব'লে বিবেচনা করি তখন থেকেই তাঁকে পাওয়া সুরু হয়। আর, এ পাওয়ার অন্ত নেই। যতখানি আমরা তাঁর হই এবং তাঁর হ'য়ে উঠতে গিয়ে যে কষ্ট তা' সানন্দে বরণ ক'রে নিই—আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রেখে,—ততখানি আমরা তাঁকে পাই। তাঁকে ভালবাসতে গিয়ে তনু-মন-ধন যে যত উজাড় ক'রে দিতে পারে—অহঙ্কার ও প্রত্যাশার বালাই না রেখে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তত তাকে দশদিক থেকে ঘিরে ধরে। তাঁকে পেলে তাঁর সঙ্গে মানুষের সব আসে।

মিস্ শিমার—দেহ নিয়ে মানুষ কি নিরাকার ঈশ্বরকে দেখতে পায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারে, কিন্তু সাকারকে অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়। অসীম, অনন্ত বলতে আমি বুঝি—the unbounded finite (সীমাহীন সসীম)। ব্যক্তকে বাদ দিয়ে অব্যক্তকে লাভ করা আদৌ সম্ভব কিনা জানি না, সম্ভব হ'লেও সুদুষ্কর।

হাউজারম্যানদার মা—প্রভু যীশু যে বলেছেন আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ ভগবানের কাছে আসতে পারে না, তার নানারকমের ব্যাখ্যা হ'তে পারে। এবং সেই সব ব্যাখ্যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি না ক'রে বিরোধ, অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতাকেই হয়তো প্রবল ক'রে তুলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Follies are not truths. (মূর্খতা আর সত্য এক কথা নয়)।

হাউজারম্যানদার মা—কোন্‌টা মূর্খতা এবং কোন্‌টা সত্য তা' নির্ণয় করা যাবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রেরিত পুরুষদের বাণীকেই আমরা authoritative (প্রামাণ্য) ব'লে মানব। তাঁদের বাণীর মনগড়া ব্যাখ্যা করলে চলবে না। তাঁদের বাণীগুলির মধ্যে সামগ্রিক সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী প্রেরিত-পুরুষগণের প্রকাশিত সত্যের আলোকেও সেগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে হবে। করাই মানুষকে সত্য অনেকখানি চিনিয়ে দেয়। Surrender (আত্মসমর্পণ) করেছেন, এমনতর গুরুর কাছে surrender

(আত্মসমর্পণ) না ক'রে যদি কেউ ভগবানের পথে এগ্‌তে চেষ্টা করে তাহ'লে সে নিজেই টের পায়, তার চেষ্টা কতখানি সার্থক হচ্ছে। সদ্‌গুরুকেই হয়তো ধরল একজন, কিন্তু যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে ধরা উচিত এবং যেভাবে তাঁকে অনুসরণ করা উচিত, তার মধ্যে যদি গোল থাকে তাহ'লেও ঈপ্সিত ফল মিলবে না। এটা একটা positive science (বাস্তব বিজ্ঞান), একটা exact science (নির্ভুল বিজ্ঞান)। ফাঁকিবাজি বা বিধির ব্যত্যয়ের ভিতর-দিয়ে এ-রাজ্যে কাজ হাসিল হবার নয়।

মা কিছুসময় চুপ ক'রে রইলেন, মনে-মনে ভাবতে লাগলেন! তারপর বললেন—আমার জীবনে আমি অনেকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'য়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে আমি গুরু বলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যে অনেক সৎলোকের সংসর্গ লাভ করেছেন, সে খুব সৌভাগ্যের কথা। তাঁরা আপনার real teacher (প্রকৃত শিক্ষক)। তবে যদি কোন surrendered personality-র (আত্মসমর্পণওয়ালা ব্যক্তির) উপর আপনার devotion (ভক্তি) থাকে তবে এই সব teacher-এর (শিক্ষকের) উপর আপনার ভালবাসাটা এবং তাঁদের শিক্ষাটা ঢের বেশী meaningful ও consistent (সার্থক ও সঙ্গতিশীল) হ'য়ে উঠবে আপনার জীবনে। Love for the Guru is the integrating agent of all our experiences. Without this there can be no wisdom (গুরুভক্তি হ'লো সেই শক্তি যা' আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে একীকৃত ক'রে তোলে। এ-ছাড়া প্রজ্ঞার অভ্যুদয় হ'তে পারে না)।

মা—তাহ'লে জীবন্ত গুরুর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য একান্তই প্রয়োজন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তাঁর নির্দ্দেশমতো যদি আমরা অনুশীলন করি, তবে সেই অনুশীলন আমাদের সব দিক দিয়েই বাড়িয়ে তোলে। প্রত্যেকের ভিতর যে কি বিরাট বিকাশ ও বড়ত্বের সম্ভাবনা আছে তা' সে প্রবৃত্তি-পরিবৃত ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন থাকার দরুন টের পায় না। Ambition (গর্ব্বেপ্সা) তাকে যে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখায় তাও তাকে বাস্তবে narrow, mean ও self-centric (সঙ্কীর্ণ, নীচ ও আত্মকেন্দ্রিক) ক'রে তোলে। সদ্‌গুরু জানেন প্রত্যেকের destined goal (নির্দ্ধারিত লক্ষ্য) কী এবং সেই পথেই তাকে পরিচালনা করেন। তাই নিজের খেয়াল-খুশিকে বিসর্জ্জন দিয়ে নির্বিচারে তাঁকে অনুসরণ করতে হয়। সদ্‌গুরু লাভ করার পর যদি কারও সাময়িক স্খলন-পতনও হয়, তাহ'লেও তার সম্বন্ধে হতাশ হবার কিছু নেই। সে যদি একদিনও তাঁকে ভালবেসে থাকে, ঐ ভালবাসার স্মৃতি তার মনে অনুতাপের তুষানল জ্বালিয়ে তাকে self-purification ও self-adjustment-এর (আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের) পথে পরিচালিত করবে। যদিও দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে পিটার একসময় যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন, তাহ'লেও যীশুর সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল ব'লেই যীশুর মৃত্যুর পর তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন। তাই আজও তিনি Saint Peter (সাধু পিটার)

ব'লে গণ্য হন। কিন্তু betrayal-এর (বিশ্বাসঘাতকতার) মতো পাপ নেই। তাই জুডাস চিরধিক্কৃত মনুষ্যসমাজে।

মা—আমরা অনেকে যীশুকে ভালবাসি বলি কিন্তু আমাদের আচরণ তাঁর নীতিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে, তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেই দিক দিয়ে আমরাও জুডাসের থেকে কম বিশ্বাসঘাতক নই যীশুর প্রতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণকন্ঠে ছলছল নেত্রে বললেন—সেদিন যেমন যীশু crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হয়েছিলেন, আজকের দিনেও সেই যীশু তেমনি ক'রে crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হ'য়ে চলেছেন মানুষের হাতে। এই পাপের নিবৃত্তি না হ'লে মানুষের নিস্তার নেই। নিস্তারের একমাত্র পথ হ'লো মূর্ত্ত ত্রাতা যিনি তাঁকে sincerely follow (অকপটভাবে অনুসরণ) করা। তাহ'লে আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলি ধীরে-ধীরে শুধরে যাবে। ঠিকপথে চলতে শুরু না করলে, ভুলপথে চলার অভ্যাস আরো মজ্জাগত হবে এবং তার chain reaction (শ্রেণীবদ্ধ প্রতিক্রিয়া) চলতে থাকবে।

মা—অন্যের দোষ দেখে তার প্রতি কঠোর হওয়া এবং নিজের দোষ না দেখা বা দেখেও তা' উপেক্ষা করা—এইটেই যেন সাধারণ মানুষের স্বভাবগত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কথা।

মা—পিটারের সাধনজীবনের উন্নতি আমাদের উৎসাহিত ও আশান্বিত করে, কিন্তু তাঁর পতন এই শিক্ষা দেয় যে আমরা যেন সাবধান থাকি এবং কোন অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত্তে প্রভুকে যেন পরিত্যাগ বা অস্বীকার না করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে first and foremost (প্রথম ও প্রধান) ক'রে চলাই মানুষের মতো চলা। তাঁকে secondary (গৌণ) ক'রে চলা মানে প্রেতজীবন বা পশুজীবন বহন ক'রে চলা। (একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—মেরী ম্যাগডিলিনী-সম্বন্ধে লোকের কি ধারণা তা' আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর মতো ভক্ত বিরল। তাঁকে mother of christianity (খ্রীষ্টধর্ম্মের মাতা) বললেও অত্যুক্তি হয় না। যীশুর crucifixion-এর (ক্রুশারোহণের) পর ভক্তবৃন্দ যখন ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, তখন তিনিই কিন্তু যীশুর প্রেমে পাগল হ'য়ে জীবনের মায়া তুচ্ছ ক'রে যীশুর সন্ধানে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন, সে কি ব্যাকুল অনুসন্ধান! মুখে যীশুর কথা আর দুটি তৃষিত চোখে যীশুর অন্বেষণ! পথে-প্রান্তরে, ঝোপে-জঙ্গলে, গুহায়-কন্দরে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, পাথরের কোণে সর্ব্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। সেই সন্ত্রাসের রাজ্যে ভক্তদের ভেঙ্গে-পড়া মনোবল পুনরায় জাগিয়ে তুলেছেন তিনি। তাঁর কোন তুলনা হয় না। তাঁর কথা কইতে গেলে আমার কেমন একটা emotion (আবেগ) জাগে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

(শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল—তাঁর হাতের লোমগুলি খাড়া হ'য়ে আছে)।

কিছু সময় চুপচাপ কাটল। এক গভীর অনুভূতির মধুর আবেশ সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বিদ্যামাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তরু কেমন আছে রে ?

বিদ্যামা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশ্রমে (পাবনায়) ছিল ঘরের কাছে। এখানে এসে দূরে প'ড়ে গেছে। সকলে চোখের সামনে থাকে আমার খুব ভাল লাগে। বড়খোকা কাছে থাকা একান্ত দরকার। কিন্তু কাছে-পিঠে বাড়ী না পাওয়ায় কতদূরে সেই গোলাপবাগে থাকতে হ'চ্ছে তাকে।

মিস্ শিমার—স্বপ্নে যদি চিত্র-বিচিত্র নানা রং দেখা যায়, তা' থেকে কী বোঝা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বপ্নে যদি নানারকমের রং দেখা যায়, তা' থেকে বোঝা যায় brain-cell ও nerve (মস্তিষ্ককোষ ও স্নায়ু) ঐ দিক দিয়ে sensitive (সুবেদী অর্থাৎ সাড়াশীল)।

মিস্ শিমার—এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সম্পর্ক আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না এমনতর সূক্ষ্ম বিচিত্র রংয়ের অনুভূতি যদি স্বপ্নে হয় তাতে বোঝা যায় যে আমাদের cell (কোষ)-গুলি বিশেষভাবে developed (বিকশিত) হয়েছে। Nerve ও cell-এর (স্নায়ু ও কোষের) perceptive faculty (বোধশক্তি) যত বাড়ে, তত higher becoming-এর (উন্নততর সম্বর্দ্ধনার) possibility (সম্ভাবনা) খুলে যায়। সে-দিক দিয়ে এটা সুলক্ষণ। সদ্‌গুরুতে যুক্ত হ'য়ে তপস্যা করলেও নানারংয়ের জ্যোতিঃ দেখা যায়, রকমারি শব্দ শোনা যায়। কিন্তু শুধু ঐগুলিই spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নয়। ঐ সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তব-জীবনে ফুটে ওঠা চাই concentric adjusted (সুকেন্দ্রিক সুনিয়ন্ত্রিত) চলন। একজনের শব্দজ্যোতির realisation (অনুভূতি) হয়েছে, কিন্তু concentric adjusted (সুকেন্দ্রিক সুনিয়ন্ত্রিত) চলন জাগেনি, তাকে spiritual man (আধ্যাত্মিক মানুষ) হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে না। আবার, একজনের হয়তো ঐসব realisation (অনুভূতি) হয়নি, অথচ চলন বেশ concentric ও adjusted (সুকেন্দ্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত) তাকেই বলা যাবে spiritual man (আধ্যাত্মিক মানুষ)। নিজের ও অপরের সত্তা পোষিত ও বর্দ্ধিত হয় এমনতর চলনচর্য্যাই হ'লো ধর্ম্মের সাক্ষ্য। তাই ব'লে এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে জপ-ধ্যান, সাধন-তপস্যা ও অনুভূতির কোন প্রয়োজন নেই। ওগুলি না হ'লেই নয়। বাস্তব-জীবনে centripetal force ও tension (কেন্দ্রাভিগশক্তি ও টান)-কে stable (সুপ্রতিষ্ঠ) ক'রে রাখতে গেলে ঐ সব push ও pressure (ঠেলা ও চাপ) চাই-ই। কারণ, আমাদের psycho-physiological core (শারীর-মানস-মর্ম্মকেন্দ্র) তপস্যাপরায়ণতায় habituated ও adapted (অভ্যস্ত ও অভিযোজিত) হ'য়ে না

থাকলে, বাস্তব চলনার ক্ষেত্রে তা' প্রবৃত্তিমুখী inertia (জাড্য) বশতঃ নানা resistance (বাধা) create (সৃষ্টি) করে।

মিস্ শিমার—তাহ'লে যোগ এবং স্বপ্নের মধ্যে বোধ হয় যোগাযোগ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেমনতর plane-এর (স্তরের) মানুষ, সে সাধারণতঃ তেমনতর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে যদি কেউ fine experience (সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা) লাভ করে, বুঝতে হবে সে যোগের পথে গেলে তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করতে পারবে। আবার, যারা যোগী তারা তপস্যার ফলে জাগ্রত অবস্থায় যেমন অনেক অনুভূতি লাভ করে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ভিতর-দিয়েও তেমনি অনেক অনুভূতি লাভ ক'রে থাকে। স্বপ্নের সঙ্গে হাবিজাবি আজে-বাজে মালও অনেক থাকে তাই স্বপ্নের উপর undue importance (অসমীচীন গুরুত্ব) দেওয়া ভাল নয়। ওতে মানুষ credulous ও irrational (অতিবিশ্বাসী ও অযৌক্তিক) হ'য়ে ওঠে।

মিস্ শিমার—গভীর নিদ্রায় স্বপ্নের মতো ক'রে চরম অনুভূতি লাভ করা কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরম অনুভূতি যখন জাগে তখন full consciousness (পূর্ণ চেতনা) জাগ্রত থাকেই। হয়তো তখন শরীর বাহ্যতঃ অচেতন ও ঘুমন্ত ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু চেতনার সূত্র আদৌ ছিন্ন হয় না। সমাধির সময় অনেকের দেহে মৃত্যুর লক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে। কিন্তু ভিতরে চেতনা ও অনুভূতি অতন্দ্র থাকে। সমাধি মানে সম্যক ধারণ—to bear the truth entirely and perfectly with one's whole being (সত্যকে সমগ্রভাবে ও সুষ্ঠুভাবে নিজ সত্তা দিয়ে ধারণ করা)।

এরপর তরজমা ও লিখনরত প্রফুল্লকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'bear'-এর কী-কী মানে হয় দেখ্ তো।

অভিধান দেখে বলা হ'ল—ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, পোষণ করা, প্রসব করা, প্রকাশ করা, ভোগ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনে হাসি-হাসি মুখে সানন্দে বললেন—বড় জবর শব্দ হইছে। সমাধির সঙ্গে এই সবগুলি ভাবই জড়িত আছে।

মিস্ শিমার—টেলিপ্যাথি (ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতীত দূরস্থ ব্যক্তিদের মনোভাবের আদান-প্রদান) ও ক্লেয়ারভয়্যানস্-এর (অলোকদৃষ্টি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শন-শক্তির) সঙ্গে যোগের সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি হ'চ্ছে endowments (বিভূতি)। যোগযুক্ত হ'য়ে তপস্যা করতে থাকলে ওসব এবং আরো অনেক রকমের বিভূতি automatically (আপনা থেকে) আসে। ওগুলির দিকে বেশী attention (নজর) দিতে গেলে self-development (আত্মবিকাশ) blocked (রুদ্ধ) হ'য়ে যেতে পারে। ও-সব দিয়ে আমাদের কাম কি? আমাদের চাই Lord-কে (প্রভুকে) ভালবাসা, তাঁকে সেবা করা, তাঁর মনোমত হ'য়ে গ'ড়ে ওঠা।

—জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।…………
লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

যাঁকে পেয়ে তিলেক চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না, তাঁকে ফেলে অন্য কোন্‌দিকে ছুটবো আমরা, আর লাভই বা কি তাতে ?

মিস্‌ শিমার—পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেকে ঐসব শক্তিকে মনের অস্বাভাবিক গতি ব'লে মনে করেন, কিন্তু আমার মনে হয় ওর সঙ্গে আত্মিক শক্তির যোগ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা ঠিক, কিন্তু প্রকৃত গুরু যিনি তিনি সবসময় শিষ্যকে সাবধান ক'রে দেন, যাতে সে ওদিকে বেশী ঝুঁকে না পড়ে। কারণ, তাতে অকিঞ্চিৎকর লাভের লোভে মহত্তর লাভ হ'তে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

হাউজারম্যানদার মা—দূরস্থ প্রিয়জনের জন্য প্রার্থনার কি কোন প্রভাব আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহিত প্রার্থনায় বিহিত উপকার হয়ই।

মা—কিভাবে উপকার হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রার্থনার পিছনে যদি আমার চরিত্রগত sincere love ও strong will-force (আন্তরিক ভালবাসা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি) থাকে, তবে তার fine shootings (সূক্ষ্ম ক্ষেপণ) radiated (বিকীর্ণ) হ'য়ে তাকে গিয়ে charged (আহিত) ক'রে তুলে তার মঙ্গল-চলনকে accelerated (ত্বরান্বিত) ক'রে দিতে পারে। অবশ্য, যার জন্য প্রার্থনা করছি তার যদি আমার সঙ্গে কিছুটা tuning (একতানতা) ও আমার প্রতি কিছুটা tension (টান) না থাকে, তাহ'লে তেমন effect (ফল) হয় না।

মা—কিন্তু এর প্রমাণ কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রমাণ পেতে গেলে প্রমাণ যেভাবে পেতে হয় সেইভাবে pursue (অনুসন্ধান) করতে হবে। বিজ্ঞানীরা বর্ণনার সাহায্যে বুঝিয়ে দেন বস্তুজগতে কোন্‌ স্তরে কি ঘটে, কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। তাঁরা যার নাম কোয়াণ্টা বা ইলেকট্রন দিয়েছেন, তার যদি অন্য কোন নাম দিতেন, তাহ'লেও আমাদের আপত্তি করার কোন কারণ থাকত না। আমি বলতে গিয়ে যে-সব term (শব্দ) apply (প্রয়োগ) করি, সেগুলির মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু যেগুলি আমার দেখা জিনিস, বোধ করা জিনিস, সেগুলির সত্যতা-সম্পর্কে আমি কোন প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করি না। তাই ব'লে আমার কথা আমি কাউকে মেনে নিতে বলি না। আমি শুধু বলতে পারি আমি যা' ক'রে যা' জানতে পেরেছি, আপনারাও তা' ক'রে তা' জানতে পারেন।

মিস্‌ শিমার—বস্তু যে মূলতঃ শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই আজ এ বিষয়ে একমত। উভয়েই আজ একযোগে এক আদিম মৌলিক শক্তি-উৎসকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমার এইসব কথা শুনতে বড় ভাল লাগে। আমার দেখা আমাকে বলে—There are no seperate compartments like matter and spirit, like east and west (বস্তু ও আত্মা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই ধরণের কোন স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নেই)।

মায়েরা মহা প্রীত ও পুলকিত হ'য়ে বিদায় নিলেন।

মা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হাউজারম্যানদাকে বললেন—মা'র হাতখানা ধর।

১২ই মাঘ, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ২৬।১।৪৮)

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলঘরে বিছানায় ব'সে আছেন। প্রমথদা (দে), নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত) প্রভৃতি কাছে আছেন। প্রকাশদা (বসু), রাজেনদা (মজুমদার), কালীদা (সেন), পদাভাই (দে), মণিভাই (সেন) প্রভৃতি বাইরে দাঁড়িয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—প্রকাশের পাশে এসে পল্টু (প্রকাশদার স্বর্গত পুত্র) যেন দাঁড়াল। এই মুহূর্ত্তে দেখলাম। পরে আর দেখতে পেলাম না। কি জানি—কিছুই বুঝলাম না।

এই কথা শুনে শোকার্ত্ত প্রকাশদা ক্ষণতরে একটু বিচলিত হ'লেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন—বোধ হয় এই ভেবে যে তাঁকে বিহ্বল হ'তে দেখলে শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হ'য়ে পড়বেন।

একটু পরে প্রমথদা জিজ্ঞাসা করলেন—যোগের সহজ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ মানে ভালবাসা। কারও উপর ভালবাসা জন্মালে তার চিন্তা মনে লেগেই থাকে। ভাবি, কিসে তার ভাল হবে, কেমন ক'রে সে সুখী হবে, তার সুখসুবিধার জন্য আমি কী করতে পারি। তাই loving active effort-ও (ভালবাসাময় সক্রিয় চেষ্টাও) লেগে থাকে। ভাবায়, করায়, বলায় তাকে নিয়ে জড়িয়ে পড়ি। একেই বলে যোগ। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আমরা যেভাবে জড়িয়ে পড়ি, ভগবান্‌কে নিয়ে, ইষ্টকে নিয়ে ঐভাবে জড়িয়ে পড়তে পারলেই কাম ফরসা। তখন আর কসরত করা লাগে না। তাঁর জন্য ভাবা, করা, বলা spontaneous (স্বতঃ) হ'য়ে ওঠে। তার থেকে আসে knowledge (জ্ঞান), knowledge (জ্ঞান) থেকে হয় experience (অভিজ্ঞতা), experience (অভিজ্ঞতা) থেকে হয় wisdom (প্রজ্ঞা)। এমনি ক'রে power (শক্তি) বাড়ে, ability (সামর্থ্য) বাড়ে, prosperity (ঐশ্বর্য্য) বাড়ে। সে চায় না, অমনি বাড়ে।

উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন, চলা-ফেরায় জপ
যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ।

এই ক'টা জিনিস অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারলে তাঁর সঙ্গে কখনও যোগ-হারা

হ'তে হয় না। এতে সবদিক দিয়ে বাঁচোয়া। সর্ব্বক্ষণ সব কাজের ভিতর তাঁকে নিয়ে engaged (ব্যাপ্ত) থাকতে পারলে, প্রবৃত্তি আর আমাদের নাগাল পায় না, নাস্তানাবুদ করতে পারে না। তাতে কর্ম্মসাফল্য অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। কারণ, কাজের পথে প্রবৃত্তি যে resistance ও distraction (বাধা ও চিত্তবিক্ষেপ) create (সৃষ্টি) করে এবং তা' overcome (অতিক্রম) করতে গিয়ে যে energy ও effort (শক্তি ও চেষ্টা) লাগে, তা' যদি অনেকখানি বেঁচে যায়, তবে তা' কাজে লাগান যায়—কাজের পথে বাইরে থেকে যে-সব resistance ও distraction (বাধা ও বিক্ষেপ) আসে সেগুলি overcome (অতিক্রম) করার ব্যাপারে। এতে কম time, energy ও effort-এ (সময়, শক্তি ও চেষ্টায়) বেশী কাজ successfully (কৃতকার্য্যতা-সহকারে) করা যায়। এমনি ক'রে কাজে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা বাড়ে। তাই বলে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। আদৎ কথা ইষ্টকে মুখ্য ক'রে চললে, বললে, করলে ইষ্টেরটাও হয় এবং ফাও হিসাবে নিজেরটাও সুষ্ঠুভাবে হয়। নিজেকে মুখ্য ক'রে চললে, বললে, করলে লাভ যতখানি হয়, তার চাইতে লোকসান হয় বেশী। যে-পরিবেশ মানুষের পাওয়ার উৎস, সেই পরিবেশ মানুষের আপন না হ'য়ে পর হ'তে থাকে। তার জমায়েত ফল একদিন ফলেই।

নিৰ্ম্মলদা—ইষ্টকাজে বার-বার বাধা পেলে মানুষ তো ব'সে পড়তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে ভাল যে বাসে, সে ব'সে পড়ে না। চেষ্টা ক'রে পারে। পারলাম না, ব'সে পড়লাম, তার মানে ego (অহং) satisfied (সন্তুষ্ট) হয়নি, তাই ক্ষান্ত দিলাম। বাইরের বাধা তো বড় বাধা নয়, বড় বাধা বাসা বেঁধে থাকে যার-যার নিজের ভিতরে, মানবড়াই, অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, আত্মস্বার্থ, আত্ম-প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি, লোকলজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, দুর্ব্বলতা, অসহিষ্ণুতা, কষ্টের জন্য রাজী না থাকা ইত্যাদি কত রকমারি বাধাই যে ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকে, তা' পরিস্থিতির চাপের মধ্যে না পড়লে বোঝা যায় না। ইষ্টটানের ফলে ঐগুলি যাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায়, ওগুলি যাদের উত্যক্ত করতে পারে না, তাদের অসম্ভব ক্ষমতা হয়। তাকে বলে যোগবিভূতি। বিভূতি মানে বিশেষরূপে হওয়া। প্রবৃত্তিভেদী টান নিয়ে যারা ইষ্টের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে, তারা মহাশক্তির আধার হ'য়ে ওঠে, অথচ তাদের তিলমাত্র অহঙ্কার থাকে না। তাদের অহঙ্কারে আঘাত দিলে, তারা তাতে ভ্রূক্ষেপও করে না, কিন্তু ইষ্টকে এতটুকু কটাক্ষ করলেও, তারা তা' বরদাস্ত করে না। তাদের ego ও interest-এর (অহং ও স্বার্থের) stay (অবলম্বন)-ই হলেন ইষ্ট।

নিৰ্ম্মলদা—মানুষ এইভাবে চলে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Due to self-centric habit (আত্মস্বার্থী অভ্যাসের দরুন) মানুষ foolishly (বেকুবের মত) চলে। অভ্যস্ত চলনে তার এমনতরই নেশা, যে সেটা খারাপ বুঝলেও ছাড়তে চায় না। যেন-তেন প্রকারেণ ইষ্টনেশা ও যজন, যাজন,

ইষ্টভৃতি পালনের নেশায় মজিয়ে দিতে হয় মানুষকে। এই যারা করে, তারাই মানুষের প্রকৃত বান্ধব। তবে ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠার অছিলায় যারা আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠার ধান্ধা নিয়ে চলে তারা হতভাগা। এদের কপটতা মানুষের কাছে ধরা পড়তে দেরী লাগে না। তাই তারা শুধু নিজেদের ক্ষতি করে না, সমাজেরও ক্ষতি করে। ধর্ম্ম-যাজকরা যদি প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী না হ'য়ে স্বার্থান্ধ মতলববাজ হয়, তবে তাদের যাজন শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে ধর্ম্মবিদ্বেষী ক'রে তুলতেই সাহায্য করে। তবে যাদের মধ্যে কপটতা না থাকে, যারা সর্ব্বদা নিজেদের শাসন ও সংশোধন ক'রে চলে, তাদের ভুল-ত্রুটি থাকলেও, তার দরুন লোকের বেশী ক্ষতি হয় না এবং তারা নিজেরাও ধীরে-ধীরে পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

নির্ম্মলদা—অনেকে বড় হয়, কিন্তু তাদের পিছনে তো কোন জীবন্ত-আদর্শ দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কার পিছনে কে আছেন, আমরা বাইরে থেকে কি ক'রে জানব? তবে সাধারণ বড় বড়ও নয়। কেউ-কেউ অহং-এর তাড়নায় অন্যকে দাবিয়ে খাটো ক'রে রেখে নিজে খেটেপিটে কিছুটা ঠেলে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত তাদের জীবন হাউইয়ের মত। আলোর বিপুল ঝরার মত তাদের পতন অনিবার্য্য। আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয়, তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে সুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহুলোক তাদের আচরণে অন্তরে-অন্তরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, আর তাই-ই হয় তাদের কাল। অন্ততঃ লোক-অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। রামকৃষ্ণদেব, চৈতন্যদেব, কতদিন হ'লো গত হয়েছেন কিন্তু they are increasing day by day (তাঁরা দিনের পর দিন বেড়ে উঠছেন)। গিরীশ ঘোষ আর দ্বিতীয়টা হ'লো না। বিধির বিধান চিরতরে জারী হ'য়ে আছে যে, যারা অহং-এর ওপর দাঁড়াবে তারা যতই দক্ষ হোক শেষ পর্য্যন্ত তলিয়ে যাবে। আর, যারা আদর্শের জন্য অহংকে যতটা উৎসর্গ করবে—বাস্তব সেবা ও সক্রিয়তায়,—তারা ততটা স্থায়ীভাবে টিকে থাকবে অন্ততঃ লোকমনে। এ-বিধানের কোনদিন নড়চড় হবে না। কালের কাছে কোন চালাকী টেকে না।

প্রফুল্ল—দক্ষযজ্ঞ-সম্বন্ধে আপনার একটা চমৎকার ছড়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই নাকি? প'ড়ে শোনা না।

ছড়ার খাতা এনে প'ড়ে শোনানো হ'লো—

প্রেষ্ঠপূজা উবিয়ে দিয়ে
অবজ্ঞা আর অপমানে
দম্ভী সেবায় চাটুপালি
দক্ষ দাঁড়ায় সমুখানে।

হামবড়ায়ী বৃত্তিপূজায়
লাগিয়ে করে বাজিমাৎ
শিবশ্রেষ্ঠে তখনই সে
অপমানেই করে কাৎ।

দক্ষের মেয়ে সতী তখন
মর্ম্মদিগ্ধ শিবনিন্দায়
আত্মাহুতি যজ্ঞে দিয়ে
পুড়িয়ে ফেলে আপনায়।

সতীর ব্যথায় গর্জ্জে তখন
ভুতরা নাচে থিয়া-থিয়ায়
চুরমারি সব দিমিক-দিমিক
যজ্ঞ অনল নিভিয়ে দেয়।

প্রবল নাচন ধিন-তা-ধিনি
চুর্ণ করি, দীর্ণ করি
উড়িয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয়
চর্ম্মকরীর হাতে ধরি।

সাপের ফণা গর্জ্জে ওঠে
মড়ার খুলি ঠঠন-ঠন্
শব-সতীরে কাঁধে লয়ে
পাগলা তখন শিবনাচন।

দম্ভী অহং অবনতির
কুটিল কঠোর দীর্ণীঘাতে
ওড়ে মাথা, অজের মুণ্ড
শোভেই তখন দক্ষ কাঁধে।

দক্ষতা যদি সার্থকতায়
শ্রেষ্ঠপূজা নাই রে ধরে
দক্ষযজ্ঞ অমনি হ'য়েই
মানুষ মাথার নিকেশ করে।

একপাশে দুজন মা কথা বলছেন। তাঁদের মধ্যে সহজভাবে কথা সুরু হ'য়ে এখন সমানে সমান পাল্লা দিতে গিয়ে কথা কাটাকাটি সুরু হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যে

গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা করছেন এবং তাতে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে সেদিকে তাঁদের খেয়াল নেই।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাদ-প্রতিবাদ করার যে প্রয়োজন নেই তা নয়। Retort (প্রত্যুত্তর) দেওয়ার মধ্যে একটা বুদ্ধির খেলা আছে। কিন্তু retort (প্রত্যুত্তর) দিতে গিয়ে অপরের ego (অহং)-কে wound (আঘাত) ক'রে মানুষটাকে চটিয়ে দেওয়া বেকুবী। প্রয়োজনমত অপরের ego (অহং)-কেও মাত্রামত tease (বিরক্ত) করা চলে যদি fondling cane (সোহাগের বেত্র) হাতে থাকে। যার গুণ যা আছে, তার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, তার দোষটাকে যদি তার গোচরে আনা যায়, তাহ'লে সে তা ধরতে পারে, বুঝতে পারে। অহংকার, ক্রোধ ও তিরস্কারপরায়ণতার খানায় প'ড়ে গেলে আমাদের যে আর হুঁশ থাকে না। পঞ্চাশ বৎসরের কঠোর শ্রম ও ত্যাগে যে মানুষটাকে আপন ক'রে তুলেছি, এক লহমার বেফাঁস কথায় তাকে হয়তো শত্রু ক'রে ছেড়ে দিলাম। অসংযমের দরুন আমরা নিজেরা যেভাবে নিজেদের সর্ব্বনাশ করি, বাইরের কেউ তেমন সর্ব্বনাশ করতে পারে কমই। এই যে এরা দুজন এখানে আরম্ভ করেছে, আমি ও আমরা এখনকার মত ওদের কাছে মুছে গেছি, তাই আমাদের যে অসুবিধার সৃষ্টি করছে সে-সম্বন্ধে পর্য্যন্ত খেয়াল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই পরোক্ষ উক্তিতে লজ্জিত হ'য়ে তখনকার মত মা দুটি চুপ করলেন।

প্রমথদা—যাজন করি, অনেক সময় সুবিধা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে জায়গায় প্যাঁচ আছে, সে জায়গায় হাত হয়তো পড়ে না। তাছাড়া divinely charged (ভাগবতভাবে ভরপুর) থেকে divine impulse (ভাগবত প্রেরণা) radiate (বিকিরণ) ক'রে মানুষের প্রবৃত্তিমার্গী মনকে সত্তাসচেতনার ভুমিতে আরূঢ় করার মত সামর্থ্য অর্জ্জন করতে হয়। তাতে আর ফস্‌কে যায় না। তখন কথাবার্ত্তা, কায়দা আপসে-আপ নির্ভুলভাবে হ'তে থাকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন ধান মাপার সময় ধানের রাশ ঠেলে দেবার কথা। ঠিক ঐভাবে পরমপিতা ক্রমাগত যোগান দিয়ে যান। ইষ্টের সঙ্গে tuning (যোগসঙ্গতি) না থাকলে, শুধু বুদ্ধি, বিবেচনা, পাণ্ডিত্য বা যুক্তিতর্ক দিয়ে যাজন হয় না।

নির্ম্মলদা—সংসার ও ইষ্ট এই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি কোথায়? কিভাবে চললে সামঞ্জস্য ক'রে চলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে সর্ব্বস্ব ও মুখ্য ব'লে জানবে। সংসার চালাবার কথা বড় ক'রে ভাববে না। বড় ক'রে ভাববে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার কথা এবং ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা যাতে হয় সেইভাবে সংসার চালাবে। সংসার চালান তোমার প্রধান দায় নয়, তোমার প্রধান দায় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা, আর তার জন্য সংসারকে যেভাবে বিন্যস্ত করা লাগে, তাই করবে তুমি। এতে আপাততঃ ভুল বোঝাবুঝি হ'তে পারে, কিন্তু tussle (দ্বন্দ্ব) avoid ক'রে (এড়িয়ে) যদি tactfully (কৌশলে) সাজিয়ে নিতে পার,

তবে পরিবারের প্রত্যেকটি লোক তোমার ভালবাসার গোলাম হ'য়ে থাকবে। তাদের দিয়ে অনেক বড় কাজ করাতে পারবে তুমি। দু'-নৌকায় পা দিয়ে দোদলবান্দা রকমে যদি চল শান্তি পাবে না।

নিশ্মর্লদা—সংসারের দৈনন্দিন ব্যয় সঙ্কুলান যদি না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো ভাল ক'রে হবে। আগেই তো বলেছি, ইষ্টপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে মানুষ কিভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, efficient (যোগ্য) হয়, successful (কৃতকার্য্য) হয়। লোভী কাঠুরিয়ার মতো যেন না হয়, তাহ'লে হবে না। গল্প আছে—কাঠ কাটতে-কাটতে এক কাঠুরিয়ার কুড়োলটা তার হাত থেকে ফসকে গিয়ে পাশের জলে প'ড়ে গেল। সে তখন জল-দেবতার কাছে কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা জানাতে লাগল—হে ঠাকুর! আমার কুড়ালটা তুমি ফিরিয়ে দাও। নইলে আমি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মারা যাব। জল-দেবতা তখন তার সততা পরীক্ষা করার জন্য একটা সোনার কুড়োল নিয়ে হাজির হলেন। সে সোনার কুড়োল দেখে বলল—এ কুড়োল আমার নয়। তারপর রূপোর কুড়োলসহ তিনি জল থেকে উঠে আসলেন। তাতেও কাঠুরিয়া বলল—এ কুড়োলও আমার নয়। তারপর আসলো তার নিজের হারান কুড়োল। তখন সে বলল—প্রভু! এইটেই আমার। জল-দেবতা তার নির্লোভিতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তিনখানি কুড়োলই তাকে দিয়ে গেলেন। এই খবর শুনে আর-এক কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে-কাটতে ইচ্ছা ক'রে কুড়োলটা জলে ফেলে দিল। কুড়োল জলে ফেলে দিয়ে সে দেবতার কাছে কান্নাকাটি সুরু ক'রে দিল। দেবতা তখন তাকে পরীক্ষা করবার জন্য একখানি সোনার কুড়োলসহ আবির্ভূত হ'য়ে তাকে বললেন—দেখতো, এই কুড়োল তোমার নাকি? সে লোভ সামলাতে না পেরে ব'লে ফেলল—হ্যাঁ প্রভু! এইটিই আমার কুড়োল। তখন দেবতা সোনার কুড়োলসহ অন্তর্হিত হলেন। তার হাজার কান্নাকাটিতেও আর ফিরলেন না। লাভের মধ্যে হ'লো এই যে তার নিজের কুড়োলটাও সে খোয়াল।

নিশ্মর্লদা—তাহ'লে কোন্ মনোভাব নিয়ে আমাদের চলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখ-কষ্টের জন্য ষোল-আনা রাজী থাকতে হবে। এ কথা মনে করো না যে তোমার বাড়ীতে চুরি হবে না, ছেলেপেলের অসুখ হবে না, কারও অকাল-মৃত্যু হবে না, অভাব-অভিযোগ হবে না, ঝগড়াঝাটি হবে না। এগুলি যে হবে না এমন নয়। যা' হবে তার থেকে এমন experience (অভিজ্ঞতা) gain (লাভ) করা চাই যাতে ভবিষ্যতে ওগুলি আর না ঘটতে পারে এবং ঐ দুর্ঘটনাগুলিকে তুমি শুভফলবাহী ক'রে তুলতে পার। কর্ম্মফল ভুগতে হবেই, কিন্তু ইষ্টচলন অব্যাহত থাকলে, কোন-কোন কর্ম্মের ফল undone (নষ্ট) হ'য়ে যায়, কোনটা lesser (কম)-ভাবে আসে, কোনটা আদৌ occur করে (ঘটে) না, আবার যেগুলি ঘটে সেগুলির ফল শুভে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। তাছাড়া, বর্ত্তমানের চলনা যদি ইষ্টপ্রাণতার ফলে ত্রুটিহীন হয়, তাহ'লে বর্ত্তমানের গর্ভজাত ভবিষ্যতে দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রুদ্ধ

হ'য়ে আসে। এইগুলিই হ'লো লাভ, কিন্তু সে-লাভের মূল হচ্ছে ইষ্টানুগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। নইলে আকাশ থেকে কোন সুখসুবিধা ঝ'রে পড়বে না। না ক'রে কিছু পাওয়ার দুরাশা রেখো না। সে তুক আমার জানা নেই। তুমি হয়তো বৌমাকে এমনভাবে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পার, যাতে সে তোমার শিষ্যার মত হ'য়ে যাবে। তোমার জন্য কষ্ট সইতে তার আর গায় লাগবে না। সবদিক adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারলে একজনের প্রত্যেকটি সন্তান অসাধারণ জীবনীশক্তির অধিকারী হ'তে পারে, long lived (দীর্ঘজীবী) হ'তে পারে, প্রবল resisting capacity (রোগ-প্রতিরোধী-ক্ষমতা) নিয়ে জন্মাতে পারে, অনেকখানি নীরোগ হ'তে পারে, obedient (বাধ্য), intelligent (বুদ্ধিমান) ও efficient (যোগ্য) হ'তে পারে। একজনের পরিবারের লোকগুলি যদি তার asset (সম্পদ) হয়, তাহ'লে তার ভাবনা কী? চলন ও বিয়ে যদি ঠিক থাকে তবে generation after generation (পুরুষানুক্রমে) মানুষ বেড়েই চলে। তোমার ভবিষ্যত-বংশধরগণ যাতে উন্নততর হয়, তার ভিত এখন থেকেই পত্তন কর। আমি যা'-যা' কই সেগুলি চেষ্টা দিয়ে মূর্ত্ত ক'রে চল। তাতে plus (যোগ) হবেই। যোগ যোগই সৃষ্টি করে, যোগে বিয়োগ নেই, বিয়োগে আবার যোগ থাকে না।

মিস্ শিমার-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর তৃপ্তির সঙ্গে বললেন—মা-টি বোঝে সহজে, তার মানে নাড়াচাড়া আছে।

রাত্রে পরে হাউজারম্যানদা, তাঁর মা ও মিস্ শিমার প্রভৃতি আসলেন।

হাউজারম্যানদা—প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে কাবু করা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের কাবু করার কথা ভাবতে যাব কোন্ দুঃখে? ওগুলি আরো strong (শক্তিমান) হোক না কেন, তাতে ক্ষতি কি যদি তারা ইষ্টার্থে ছাড়া নিয়োজিত না হয়? তাই ইষ্টানুরাগের প্লাবন যাতে জাগে প্রাণে—সক্রিয় সন্দীপনায়,—তাই-ই করা লাগে। ওতে ইন্দ্রিয়শক্তির পটুতাও উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে-পটুতা applied (প্রযুক্ত) হয় ইষ্টার্থে অর্থাৎ মঙ্গলজনক কর্ম্মে। তা' দিয়ে ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। ইষ্টানুরাগের প্রবাহ বিস্তারশীল হ'তে-হ'তে যত সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে ওঠে তত প্রবৃত্তির প্রবাহগুলিও ঐ মহাপ্রবাহের সঙ্গে মিশে সুফলপ্রসূ ও সার্থক হওয়ার পথে চলে। কিছুই ম'রে যায় না, ঝ'রে যায় না, লোপ পায় না, সবই ইষ্টের পদস্পর্শে অর্থাৎ ইষ্টীচলন স্পর্শে ধন্য হ'য়ে ওঠে।

হাউজারম্যানদা—আমরা তো আমাদের বাস্তব দুর্ব্বলতাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে weak (দুর্ব্বল) ব'লে স্বীকার করা একটা unprofitable auto-suggestion (লাভহীন স্বতঃ-অনুজ্ঞা) ছাড়া আর কিছু নয়। Weakness (দুর্ব্বলতা) তোমার কেউ নয়, তাকে আমল দাও ব'লে, আশ্রয় দাও ব'লে সে আসন গেড়ে ব'সে থাকে। Emphasise love for the superior Beloved that is

the eternal property of your being and as it will swell, weakness will dwindle to that extent (ইষ্টানুরাগের উপর জোর দাও, তাই-ই তোমার সত্তার চিরন্তন সম্পদ, ইষ্টানুরাগ যত ফেঁপে উঠবে, দুর্ব্বলতা তত ক্ষীণ হবে)। তুমি যেমনই হও আর যাই হও, জোর ক'রেও কর, বল ও ভাব তেমনি ক'রে যেমনতর করা, বলা ও ভাবা গভীর ইষ্টানুরাগ থেকে স্বতঃই উৎসারিত হয়।

মিস্ শিমার—এটা তো একপ্রকারের কপটতা বা আত্মসম্মোহন। এতে তো নিজ সত্তার সঙ্গে মিথ্যাচার করা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আমরা হ'তে চাই, অথচ হ'য়ে উঠতে পারিনি, আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে কায়মনোবাক্যে তদনুগ অনুশীলন যদি করি, তা কপটতা বা মিথ্যাচার হ'তে যাবে কেন ? তাই-ই তো জীবনের সাধনা। ভাল হওয়ার intention (অভিপ্রায়) যদি না থাকে, অথচ লোক-ঠকান চাল হিসাবে ভাল মানুষের pose (ভঙ্গিমা) নিয়ে যদি চলা হয়, তাকেই বরং বলা যায় কপটতা। আর, self-hypnosis (আত্ম-সম্মোহন)-এর কথা যে বলছেন, আমার মনে হয় নিজেকে হীন, পাপী ও খারাপ ব'লে মেনে নেওয়াটাই real self-hypnosis (প্রকৃত আত্ম-সম্মোহন)। পরমপিতার সন্তান যে তার পক্ষে ঐ ধরণের স্বীকৃতি self-degrading self-hypnosis (আত্ম-অবমাননাকর আত্ম-সম্মোহন) ছাড়া আর কিছু নয়।

হাউজারম্যানদার মা—বিশ্বাস-ও-ভক্তি-উদ্দীপী আচরণ করবার মত ইচ্ছাশক্তি লাভ করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব'সে-ব'সে শুধু চিন্তাজগতে বিচরণ না ক'রে, চিন্তা-অনুযায়ী করা ও বলাটা ঝম ক'রে সুরু ক'রে দিতে হয়। ভাবা-অনুযায়ী করা ও বলা সুরু করার পথে নিজের ভিতর ও বাইরে থেকে অনেক resistance (বাধা) দেখা দেয়। ও-দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে যা' করণীয় তা' করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, আর continuity (ক্রমাগতি) নিয়ে তা' ক'রে চলতে হয়। Then a new satisfaction seizes you and adds urge and energy to your go (তখন এক নূতন তৃপ্তি আপনাকে পেয়ে বসে এবং আপনার চলার-পথে তা' প্রেরণা ও শক্তি সংযোগ করে)।

মিস্ শিমার—বুদ্ধিগত জ্ঞান এবং আচরণ, এই দুইয়ের মধ্যে যোগসেতু কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা principle (নীতি) ক'রে নিতে হয় করাটাকে নিখুঁত ও সুষ্ঠু ক'রে তোলার জন্য বিহিতভাবে বুঝব, জানব, ভাবব, আবার জানা-বোঝাটাকে বাস্তব ক'রে তোলার জন্য করার ভিতর-দিয়ে জানব। এমনতরভাবে না চললে করা বা জানা কোনটাই perfect ও solid (পূর্ণাঙ্গ ও জমাট) হয় না। তাই, তা' অভিজ্ঞতার স্তরে উপনীত হ'য়ে চরিত্রকে স্পর্শ করে না। শিক্ষা-ক্ষেত্রে করা ও জানার সমন্বয়সাধন একান্ত প্রয়োজন। নইলে সে-শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একীভূত হয় না। একটা ক্লান্তিকর বোঝার মতো মাথার উপর চেপে ব'সে মানুষকে ক্রমাগত ভারাক্রান্ত করে।

মিস্ শিমার কর্ম্মের উপর আপনি জোর দেন, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি বাদ দিয়ে তো কর্ম্ম হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের intention-এর (অভিপ্রায়ের) মধ্যে কিছুটা latent will (সুপ্ত ইচ্ছাশক্তি) থাকেই, সেই latent will (সুপ্ত ইচ্ছাশক্তি)-ই potent ও paramount (বলিষ্ঠ ও প্রধান) হ'য়ে ওঠে, যদি তাকে কর্ম্মে রূপ দিয়ে চলা যায়। মানুষের যদি সম্বেগশালী সদভিপ্রায় থাকে, তবে সেটা একটা benign sign (শুভ লক্ষণ)।

হাউজারম্যানদা—অভিপ্রায় বলতে কী বুঝায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Desire which is a bit inflamed is intention (কথঞ্চিৎ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষাই অভিপ্রায়)।

হাউজারম্যানদার মা—সদিচ্ছাকে প্রদীপ্ত করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎজীবন অর্থাৎ ঈশ্বরনিষ্ঠ জীবনের সার্থকতার বিষয় লোভাতুর চিত্তে ভাবতে হয়। সেবা ও ত্যাগপূত মহৎ জীবনলাভের লালসাকে দাউ-দহনী ক'রে তুলতে হয়। হনুমানজাতীয় ভক্তের জীবন নিবিষ্ট চিত্তে অনুধ্যান করতে হয়। জীবন মানেই তো এমনতর জীবন—এইটে অন্তর দিয়ে feel (বোধ) করতে হয়। আত্ম-কেন্দ্রিক স্বার্থগৃধ্নুতার বশবর্ত্তী হ'য়ে চলা মানে যে নিজেরই ক্ষতি সাধন করা, সেটা নিছকভাবে নিশ্চিত ক'রে বুঝতে হয়। তখন হীনতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে মানুষের বিবেকে বাধে, মনে আতঙ্ক হয়। যত কষ্ট হো'ক ঈশ্বরনিষ্ঠ, ইষ্টনিষ্ঠ জীবন লাভের জন্য আত্মবলিদানে বদ্ধপরিকর হয় সে। জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে মানুষ যখন convinced (প্রত্যয়দীপ্ত) হয়, তখন সদিচ্ছা তাকে পেয়ে বসে। কদর্য্য কামনার শত প্রলোভনও তাকে আর প্রলুব্ধ করতে পারে না। বোধের গোলমালেই মানুষ ভুল পথে চলে। প্রকৃত বোধ জাগলে বিপথে চলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

মিস্ শিমার—ঈশ্বর-নিষ্ঠ জীবনের মাধুর্য্য যদি কেউ উপভোগ না করে, তাহ'লে সেই জীবন লাভের জন্য তার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনে আমাদের যা'-কিছু পেতে হয় করার ভিতর-দিয়ে। করা ছাড়া পাওয়ার পথ নেই। বিশ্বাস ক'রে করা সুরু করতে হয়। করাই করার ফলকে চিনিয়ে দেয়। মা-বাবাকে যারা ভক্তি করে, তাঁদের যারা obey (মান্য) ক'রে চলে, তারা জানে তাতে কত সুখ। ঐ বনিয়াদ যাদের না থাকে, submission to Ideal (আদর্শের কাছে নতি) তাদের কাছে foreign (বিজাতীয়) জিনিস ব'লে মনে হয়। Submission-এর (নতির) elements (উপাদান) চরিত্রে থাকা চাই, এবং তার development-এর (বিকাশের) জন্য culture-এরও (অনুশীলনের) ব্যবস্থা চাই। শ্রদ্ধাবান যে, তার জন্য তাই দীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে। অনেকে এমন আছে, যাদের এ-জীবনে ভগবৎ-পিপাসা জাগবারই নয়। অনেকে আছে

যারা বিধ্বস্তির পর আর্ত্ত হ'য়ে ভগবানের দিকে হাত বাড়ায়। কিছু লোক আছে যারা কামনার পূরণের জন্য ভগবানকে ডাকে, ভগবানের সাহায্য চায়। কিছু লোক আছে যারা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু। তারা জগতের মূল সত্য ও আদি কারণকে জানতে চায় এবং সেই জন্য বেত্তাপুরুষের শরণাপন্ন হয়। অল্পসংখ্যক লোক আছে যারা শিশুকাল থেকেই ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। ভগবদন্বেষণ ও ভগবদনুসরণ ছাড়া অন্য কোন নেশা তাদের মন মজাতে পারে না।

মিস্ শিমার—ভগবানের পথে যারা চলে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই হয় আর্ত্ত না হয় কামনা-পীড়িত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কথা ঠিক।

মিস্ শিমার—তার মানে তাদের সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপদমুক্তি ও সুখসুবিধা লাভ, কিন্তু সকাম উপাসনার ভিতর-দিয়ে আর যা' হোক আত্মিক উন্নতি তো হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকেই personal desire (ব্যক্তিগত কামনা) নিয়ে সাধনা সুরু করে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা একটু বিচার-বিশ্লেষণ-শীল তারা কিছুদিন পরেই বুঝতে পারে যে conscious nurture of their desires is sure to frustrate the fulfilment of the desires (সচেতন বাসনাপোষণ তাদের বাসনাপূরণকে ব্যর্থ করতে বাধ্য) এইটে যারা ঠিকমত বোঝে তারা কামনাবাসনার দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রত্যাশাহীন হ'য়ে পরমপিতার দাসত্ব করে, তাঁরই প্রীতিকর্ম্মে ঢেলে দেয় নিজেদের। তখন কিন্তু কিছুই অপ্রাপ্ত ও অপ্রাপ্য থাকে না তাদের। তবে পাওয়া না-পাওয়ার তোয়াক্কা তারা করে না। তাঁর সেবায় নিবিষ্ট ও নিয়োজিত থাকার অধিকার পেয়েই তারা সুখী থাকে। আর, এ করতে গিয়ে দুঃখ কষ্ট নিন্দা, অপমান ইত্যাদিও যদি তাদের ভাগ্যে জোটে, তাও তাদের টলাতে পারে না। টলাবে কাকে? যে-মনকে টলাবে, সে-মন তো একজনকে নিয়ে কানায়-কানায় ভরা। অন্য দিকে নজর দেবার মত স্থান সে-মনে কোথায়?

> "হায় সে কি সুখ
> হাতে লয়ে জয়তুরী
> জনতার মাঝে ঝাঁপায়ে পড়িতে
> রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে
> অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
> হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

সে মিনমিনে ভক্ত হয় না। সে হয় উজ্জী ভক্তি ও দীপ্ত বীর্য্যের প্রতীক। যেমন ছিল হনুমান। অন্যায় ও অসৎ যা', তাকে মিশমার ক'রে দিয়ে ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় সে হ'য়ে ওঠে অমোঘ ও অজেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ প্রেরণার গণগণে আগুনে জ্বলছে। মাঘ মাসের শীতের

রাতে তাঁর ভাস্বর ললাট এখন ঘর্ম্মসিক্ত। আনন্দের এই দীপ্ত ছবি মানুষের নত্যকালের ধ্যানের ধন, মনের মণিকোঠায় মহার্ঘ্য সঞ্চয়।

সবই এখন সাময়িকভাবে স্তব্ধ। এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে তাঁর কাছ থেকে ঋত্বিক্-সংঘের কাজকর্ম্মের খবর নিতে লাগলেন।

একটু পরে মিস্ শিমার আবার প্রশ্ন করলেন—সাধকের জীবনের রূপান্তর সম্বন্ধে আপনি যা' বললেন, তা তো সাধারণতঃ দেখা যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায় মানুষ যে-কামনার তাড়নায় সাধনা সুরু করে, সেই কামনার আবর্ত্তে প'ড়ে আজীবন হাবুডুবু খায়। তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হয়ই না, বরং কামনা পূরণ না হওয়ার দরুন তাদের মধ্যে ক্ষোভ, অসন্তোষ, অবিশ্বাস ও সংশয় প্রবল হ'য়ে ওঠে। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Divine mercy dwells within us and it never deserts us (পরমপিতার দয়া আমাদের ভিতরে বসবাস করে এবং তা' আমাদের কখনও পরিত্যাগ করে না)। এই mercy (দয়া) আমাদের কখনও অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না। তা' অনন্তের দিকে আমাদের চলন্ত ক'রে রাখে। তাই আমরা চাই আরো, আরো, যে-আরোর শেষ নেই। জগতের কোন বস্তুই এই আরোর ক্ষুধা মেটাতে পারে না। আবার, পাওয়ার ক্ষুধা মানুষকে ক্রমাগত হয়রান ক'রে মারে। চাহিদার চাবুক তাকে চাকরের মত খাটায়। কিন্তু চাহিদার পর চাহিদা পূর্ণ হলেও সে দেখে মন তার ভরেনি। তখন সে খোঁজে কি করলে মন ভরে। আর, তা' ভরে তখনই যখনই অনন্তের প্রতীকস্বরূপ প্রিয়পরমের প্রতি সীমাহীন টান নিয়ে মানুষ তাঁরই প্রীতিকর্ম্মে নিজেকে নিরন্তর নিঃশেষে নিয়োগ করে। মানুষের অনির্ব্বাণ তৃষ্ণাগ্নি নির্ব্বাপণের এই ছাড়া আর কোন পথ নেই। বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান যে, সে জীবনের ভালমন্দ অভিজ্ঞতা থেকে এই simple truth (সরল সত্য)-টা সকাল-সকাল বোঝে। যারা বেকুব অনেক ঘা-গুঁতো না খেলে তারা শায়েস্তা হয় না। ঠিক পথে চলতে সুরু করলেও পূর্ব্ব অভ্যাসের দরুন বিপথ-প্রীতি তাদের সহজে রেহাই দেয় না। সদ্গুরু সেই জন্য অনেক সময় মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে সৎ-চলনে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করেন। তাঁর কথা শুনে চললে ভয় নেই।

হাউজারম্যানদা—আদর্শের উপর বিশুদ্ধ অনুরাগ জম্মাতে সময় কেমন লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' লহমায় হ'তে পারে, কিছুদিনের মধ্যেও হ'তে পারে, আবার সারাজীবনেও না হ'তে পারে। মানুষ চাইলেই পারে। It all depends on the velocity of urge (এটা আকুতির বেগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে)। বৈষ্ণব শাস্ত্রে নাকি আছে—"কৃষ্ণপ্রেম নিত্য সিদ্ধ, কভু সাধ্য নয়"। ভাইকে যে ভাই ব'লে স্বীকার করি ও ভালবাসি, তার মধ্যে কি কোন কসরত লাগে? প্রিয়পরমকে তেমনি পরম আপন জ্ঞান ক'রে চলতে সুরু করলেই হয়। অন্য কোন শক্ত ব্যাপার এর মধ্যে

কিছু নেই। ধর্ম্মকে যারা কষ্টসাধ্য ব'লে মনে করে, তারা ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুই জানে না।

মিস্ শিমার—আপনি কি নিত্য নিয়মিত সময়ে ধ্যান করার পক্ষপাতী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তবে ইষ্টকে যে ভালবাসে কাজকর্ম্মের মধ্যেও ধ্যানপরায়ণতার ঝোঁক তার লেগেই থাকে। ফাঁক পেলেই সে ধ্যানে অর্থাৎ ইষ্টচিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।

মিস্ শিমার—কারও যদি গুরু না থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু থাকলেই ধ্যান ঠিকমত হয়। জ্ঞান ও বোধমত নিত্য আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণ প্রত্যেকেরই করা উচিত। ঐটে করতে গেলে গুরুর প্রয়োজন ভাল ক'রে বোধ করা যায়।

মিস্ শিমার—কারও যদি কোন প্রেরিতপুরুষে বিশ্বাস না থাকে, তাহ'লে তারও কি ধ্যানের অভ্যাস করা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মশুদ্ধির জন্য আত্মচিন্তা অর্থাৎ ধ্যানানুশীলনের প্রয়োজন আছে সবারই। অন্তর্ম্মুখী চিন্তাশীলতা বিশ্বাসকে গজিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

মিস্ শিমার—ধ্যানাভ্যাসের থেকে কি শুধু ভালই হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু যদি না থাকেন এবং গুরুর প্রতি টান যদি না থাকে তবে চিন্তাগুলি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে হয় না। অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশীলতার মাত্রাধিক্য মনকে অনেক সময় distorted (বিকৃত) ক'রে তুলতে পারে। গুরুকরণের পর ভক্তিযুক্ত হ'য়ে ধ্যান যদি করা যায়, তাহ'লে complex (প্রবৃত্তি)-গুলি normally (স্বভাবতঃ) একটা কেন্দ্রে concentrated (কেন্দ্রীভূত) হয়। এই গুরু যদি হন divine man (ভাগবত মানুষ) তবে complex (প্রবৃত্তি)-গুলির meaningful adjustment (সার্থক নিয়ন্ত্রণ) হওয়ার পথ খুলে যায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে হ'য়ে ওঠে normal ও balanced (স্বাভাবিক ও সাম্যভাবদীপ্ত)। একক্ষেত্রে মহৎ আর একক্ষেত্রে ইতর এই ধরণের অসঙ্গতি তার চরিত্রে থাকে না, অবশ্য যদি ধ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টানুগ করা, বলা হাত ধরাধরি ক'রে চলে। আবার, মানুষ যদি কেবল জপ ক'রে, অথচ ধ্যান ও কাজকর্ম্ম না করে, তাতে ভাল হয় না। জপে মানুষের sensitivity (সাড়াপ্রবণতা) বাড়ে, কিন্তু ঐ sensitivity (সাড়াপ্রবণতা) যদি বিহিত ধ্যান ও কাজকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে proper channel-এ (সমীচীন খাতে) directed (পরিচালিত) না হয়, তবে তা' মানুষের অভ্যস্ত দোষ, দুর্ব্বলতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে উত্তাল ক'রে তুলতে পারে। উপযুক্ত গুরুর অধীনে তাঁর নির্দ্দেশ-মতো ঠিকভাবে সাধন-ভজন না করলে, অনিয়ন্ত্রিত সাধনার ফলে অনেকের কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বেড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আবার, নানাপ্রকার অস্বাভাবিক suppression-এর (অবদমনের) ফলে অনেকের মধ্যে রকমারি aberration (বিচ্যুতি ও বুদ্ধিভ্রংশ)-ও দেখা দিয়ে থাকে। সদ্গুরুর প্রতি অকাট্য অনুরাগকে

pivot (কীলক) ক'রে সাধনার পথে অগ্রসর না হ'লে কত যে বিড়ম্বনা দেখা দিতে পারে তার লেখাজোখা নেই।

মিস্ শিমার—সাহিত্য, সঙ্গীত বা শিল্পসাধনার মতো সৃজনাত্মক কর্ম্মে উন্নতিলাভ করতে গেলেও কি মানুষের সদ্‌গুরু গ্রহণের প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! Creative (সৃজনধর্ম্মী) কিছু করতে গেলেই মানুষের প্রথম প্রয়োজন হ'লো adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হওয়া। A scientist or artist must be balanced within (একজন বৈজ্ঞানিক বা শিল্পীকে অবশ্যই ভিতর থেকে সাম্যভাবসিদ্ধ হ'তে হবে)। নইলে তার প্রতিভা বা শক্তি দিয়ে লোকের কল্যাণ না হ'য়ে অকল্যাণ হ'তে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত শক্তির বিনিয়োগ যদি সত্তাপোষণী রকমে না হয়, তবে তার কোন দাম থাকে না ! জীবনের জন্যই তো সব, না আর কিছু !

মিস্ শিমার—শুধু নিজের প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণে উপনীত হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—That may be Hitlerian adjustment (সেটা হিটলারের মতো নিয়ন্ত্রণও হ'তে পারে)।

মিস্ শিমার—মহৎ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে আমরা অনেক সময় ভগবৎপ্রীতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে বুঝতে হবে সেই শিল্পী বা সাহিত্যিকের কোন ব্যক্তির উপর গভীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে। তা' বাদ দিয়ে ভগবৎ-প্রীতির স্ফুরণ হ'তে পারে না। নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসা হাওয়ার লাড়ু। তার অস্তিত্ব নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান যীশু প্রভৃতির জীবনের পিছনেও জীবন্ত কেন্দ্র ছিলেন। All surrendered to a person (সবাই বিশেষ ব্যক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন)।

মিস্ শিমার—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জন্য পরস্পরের প্রণয়-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উভয়ে যদি একই ইষ্টকে ভালবাসে, তবে ঐ ইষ্টপ্রীতিই তাদের পারস্পরিক ভালবাসাকে আরো গভীর ও দৃঢ়সম্বদ্ধ ক'রে তোলে। মাঝখানে ইষ্ট না থাকলে একটা gap (ফাঁক) থাকে, কারণ mutual becoming-এর (পারস্পরিক বিবর্দ্ধনের) পথে কোন inspiring agent (প্রেরণাসন্দীপী শক্তি) থাকে না। আর, যে-ভালবাসা মানুষের becoming (বিবর্দ্ধন)-কে ক্রমাগত accelerate (ত্বরান্বিত) না করে, তা' দিন দিন stale (বাসী) হ'য়ে পড়ে।

মিস্ শিমার—সেই গভীর দাম্পত্য প্রেম-সম্বন্ধে কি বলা যায় যেখানে উভয়ের কোন অভিন্ন আদর্শে নতি বা আনুগত্য নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় সেখানেও উভয়ের common beloved (অভিন্ন

প্রিয়) ব'লে কেউ আছে। হয়তো পিতা, মাতা বা এই জাতীয় কেউ। মানুষ তাকে religious love (ধর্ম্মাশ্রয়ী ভালবাসা) বলুক বা না বলুক, তা' কিন্তু মূলতঃ ধর্ম্মাভিমুখী। গুরুজনের প্রতি ভক্তি গুরুভক্তিরই সোপান।

মিস্ শিমার—তাহ'লে শুধু ভালবাসা ও কর্ম্মই যথেষ্ট নয়, ভালবাসার একটি মৌলিক উন্নত পাত্র ও কেন্দ্র চাই-ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক তাই। ধরুন, আমি Lord (প্রভু)-কে দেখিনি, কিন্তু তাঁকে আমি ভালবাসতে চাই। এজন্য আমার এমন একজনের সঙ্গ লাভ করা প্রয়োজন, যে তাঁকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসে ও অনুসরণ করে। এই প্রেমী সুজনের সান্নিধ্য-লাভ তাই সৌভাগ্যের কথা। তবে যাঁকে-তাঁকে Guide (চালক) হিসাবে select (নির্ব্বাচন) করা ঠিক নয়। দেখতে হবে প্রবৃত্তিভেদী প্রেষ্ঠটান তাঁকে normally adjusted ও solved man-এ (সহজভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সর্ব্ব-সমাধান-সমন্বিত ব্যক্তিতে) পরিণত ক'রেছে কিনা। Divine man (ভাগবত মানুষ) যিনি তিনি হ'য়ে ওঠেন spontaneously loving and serviceable (স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ভালবাসাময় ও সেবামুখর)। কেউ যদি তাঁকে ঘৃণা বা হিংসাও করে, তবু তিনি তাকে ভাল না বেসে বা তার ভাল না ক'রে পারেন না। Love (ভালবাসা) কারও মধ্যে set ক'রেছে (প্রতিষ্ঠা পেয়েছে) কিনা তার crucial test (চরম পরীক্ষা)-ই হ'লো এই। অপরের ভালবাসার বিনিময়ে তাকে ভালবাসায় কোন বাহাদুরি নেই, কিন্তু একজন যদি তার প্রতি কারও সক্রিয় দ্রোহবুদ্ধির কথা জানা সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে পারেন, তবে বুঝতে হবে তিনি সাধারণ মানুষের ঊর্দ্ধে। ভালবাসা তাঁর স্বভাব। এই ভালবাসার মধ্যে যে অসৎ-নিরোধের স্থান নেই, তা' কিন্তু নয়। কিন্তু তার মধ্যে কোন দ্রোহবুদ্ধি বা দুরিতবুদ্ধির অবকাশ থাকে না। তাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁর অসৎ-নিরোধী প্রয়াস মানুষকে কাছে টানে ছাড়া পর করে না। তবে তাঁর অপার ভালবাসা উপভোগ করার লোভে এবং তাঁর সাহায্যে নিজ কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ তাকে ধরে, তাতে কিন্তু তার সত্যিকার মঙ্গল হয় না। তাতে তার selfishness (স্বার্থ-পরতা)-ই flare up ক'রে (প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে) ওঠে। The important thing is not his love for us, but our love for him and that is our wealth because that disentangles us from our obsessions and weaknesses (আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসাটা আমাদের পক্ষে বড় জিনিস নয়, কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসাটা আমাদের পক্ষে বড় জিনিস। তাই-ই আমাদের সম্পদ, কারণ, তা' অভিভূতি ও দুর্ব্বলতাগুলি থেকে আমাদের মুক্ত করে)।

মিস্ শিমার—চালক-হিসাবে কাউকে যদি আদৌ গ্রহণ করতে হয়, কাকে গ্রহণ করতে হবে তা' নির্দ্ধারণ করা তো কঠিন কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পবিত্র আগ্রহ, আকুতি বা ভালবাসার সম্বল যদি কারও থাকে, সে প্রায়ই ভুল করে না। যার যেখানে স্থান, পরমপিতা জাগতিক যোগাযোগের ভিতর-

দিয়ে তাকে সেখানেই ঠেলে পাঠান। পরমপিতার বিধান এমনতর যে, যে তাঁকে চায়, প্রকৃতিই তাকে সহায়তা করে।

প্রফুল্ল—ভগবানকে নিয়ে যারা চলতে চায়, পরিবার-পরিবেশের কাছ থেকে অনেক বাধাই তাদের পেতে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির উপাসক যারা, তারা ভগবদুপাসনার পথে বাধা সৃষ্টি করবে, সে আর বিচিত্র কী? এই বাধাই কিন্তু ভক্তের আগ্রহকে আরো জ্বলন্ত ক'রে তোলে। তাই বাধা প্রকারান্তরে ভক্তির পরিপোষক হয়। পরমপিতার দয়ার ধারা বিচিত্র। আমাদের প্রবৃত্তি-চাহিদা যে অনেক সময় frustrated (ব্যর্থ) হয়, সেও পরমপিতার দয়া। ইষ্টকে যে চায় সে প্রীতিকর, অপ্রীতিকর, সুবিধাজনক, অসুবিধাজনক সবরকম উপাদানকেই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার অনুকূল ক'রে তোলে। এতেই হয় শক্তি ও ভক্তির সমন্বয়। যে-ভক্তি বাধাকে জয় করতে জানে না, সে-ভক্তি শক্তিহীন। আর, তা ভক্তি নামের যোগ্য কিনা বলা যায় না। ভক্তের রাজা হনুমান। পদে-পদে তার বাধা এসেছে, আর পরাক্রমের সঙ্গে সে তা উত্তীর্ণ হয়েছে। এতে পদে-পদে তার ভক্তিও যেমন বেড়েছে, শক্তিও তেমনি বেড়েছে। আর, সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মুখে হাসি ফুটেছে এবং পরিবেশের পক্ষেও ভাল হ'য়েছে। শুধু নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটভাবে মনের সুখে জপতপ করবার ভিতর-দিয়ে ভক্তি সিদ্ধ হবার নয়। এর যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে ইষ্টের জন্য responsibility (দায়িত্ব) নিয়ে কঠোর শ্রমে তা successfully execute (কৃতকার্য্যতার সঙ্গে উদ্যাপন) করবার। ইষ্টের জন্য মাথা খাটাতে হয়, গা ঘামাতে হয়, নিজেকে অক্ষত রেখে আগুনের সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে গেলে কতরকম পরিস্থিতি ও মানুষের সম্মুখীন হ'তে হয় নিজ উদ্দেশ্যে অটুট থেকে সবকিছু manage ও manipulate (পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ) ক'রে, সকলের কল্যাণকে অবধারিত ক'রে পারস্পরিক প্রীতিসঙ্গতিকে সলীল ক'রে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হ'তে হয়। এর ভিতর-দিয়েই গজায় self-confidence, personality, experience, wisdom (আত্মপ্রত্যয়, ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা)। ভক্ত ভগবানের হাতে তাঁর মাঙ্গলিক শক্তির এক শক্তিমান হাতিয়াররূপে গ'ড়ে ওঠে। একজন ভক্ত যেখানে থাকে তার আশপাশ সবদিক দিয়ে উন্নত হ'য়ে ওঠে। এই যোগ্যতার অভ্যুদয়ের ব্যাপারে আরাম-বিরামের চাইতে বাধাবিঘ্ন ও ঝড়ঝাপটাই বেশী কার্য্যকরী হ'য়ে থাকে। তবে বিশ্বপ্রকৃতি দৃশ্য অদৃশ্য নানাভাবে তাকে শক্তি, সাহস ও সহায়তা যোগায়। সৎ-শক্তির অন্তিম জয়ের অনিবার্য্যতা-সম্বন্ধে সে কোন অবস্থায়ই বিশ্বাস হারায় না। তাই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও সে আশার আলো আবিষ্কার করে। আর, তাই-ই তাকে অতন্দ্রভাবে চলন্ত রাখে মঙ্গল-অভিযানে।

প্রফুল্ল—আপনি বললেন, নিজেকে অক্ষত রেখে আগুনের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কথা। কিন্তু নিজেকে অক্ষত রাখার তাগিদ যদি কারও প্রবল হয় সে তো ইষ্টার্থে প্রয়োজন হ'লেও কোন ঝুঁকি বা বিপদের সম্মুখীন হ'তে পারবে না। কাপুরুষের

মতো সর্ব্বদা গা বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করবে। তাতে ইষ্টার্থ বিপন্ন হ'লেও সে বিচলিত হবে না। এমনি ক'রে সে কপট হ'য়ে পড়বে। এবং নিজের হীন ক্লীবতা ও স্বার্থান্ধতা যাতে লোকের কাছে ধরা না পড়ে, সেইজন্য নিজ আচরণের সমর্থনে বড়-বড় philosophy (দর্শন) আওড়াবে। এইসব ভয়কাতুরে, আরামপ্রিয়, স্বার্থান্ধ, ফাঁকিবাজ লোকদের দিয়ে কোনদিন কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। নিষ্ঠাবান, আপোষরফাহীন, বেপরোয়া, স্বার্থপ্রত্যাশাহীন লোকেরাই জগৎকে এগিয়ে নিয়ে চ'লেছে। বিপ্লবী বীর শহীদ অনুজা সেনের সঙ্গে একসময় আমার গভীর যোগাযোগ ছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য তখন আমি প্রয়োজন হ'লে যে-কোন মুহূর্ত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তাতে আমি অসীম বল বোধ করতাম বুকে। কিন্তু আপনি যা' বলেন তাতে মনে হয় মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও মৃত্যু বরণ করা ঠিক নয়। নিজেকে বাঁচিয়ে উদ্দেশ্য সাধন ক'রে চলাই সঙ্গত। এটা হয়তো ভাল। কিন্তু আজ যে বাঁচার তাগিদ অনুভব করি সে শুধু আপনার ইচ্ছাপূরণের জন্য নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতা ও কর্ত্তব্যবোধ। সবটা মিলিয়ে দেখতে পাই—আজ আমি আগের তুলনায় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি। আগের মতো মনোবল আজ আমার নেই। এটা আমার ভাল লাগে না। কী করলে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা-হীন'—এমনতর বলদৃপ্ত মনোভাব আমি ফিরে পাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাববে তুমিও ঠাকুরের জন্য, তোমার স্ত্রী-পুত্রও ঠাকুরের জন্য। সবকিছু ইষ্টের ও ইষ্টার্থে এই বোধটা যদি নিনড় হ'য়ে দাঁড়ায় তখন নিজ স্বার্থ ইষ্টস্বার্থের অঙ্গীভূত হ'য়ে ওঠে। ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থাকে না। তখন বুকে বলের অভাব হয় না। সর্ব্বদাই তিনি অন্তরে জাগ্রত থাকেন এবং তাঁর বলে বলীয়ান হ'য়ে আমরা তাঁরই ঈপ্সিত কাজ ক'রে চলি। ভয়, দুর্ব্বলতা বা দুশ্চিন্তা সেখানে এগুতে সাহস পায় না। এই তো অমৃতময় জীবন। এটা অফুরন্ত, অনন্ত। আমি বলি—এই দেহ নিয়েই তোমরা অমর হয়ে পরমপিতার সেবা ক'রে চল। তাঁর জন্য প্রয়োজন হ'লে বিপদ বা ঝুঁকি তো ঘাড়ে নেবেই। কিন্তু মৃত্যুর সব ফাঁদকে ফাঁকি দিয়ে তোমরা বীর্য্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে, সেই আশাই আমি করি। আমি তোমাদের ভালবাসি, তোমরা আমাকে ভালবাস—এই ভালবাসা চিরদিনের জন্য অমরণ ও অগ্রগতিশীল অভ্যুদয় আমন্ত্রণ করুক, সে শুধু আমাদের জন্য নয়, সকলের জন্য। এর মধ্যেই নিহিত আছে সৎসঙ্গের সার্থকতা।

এরপর মিস্ শিমার জিজ্ঞাসা করলেন—অনেকে এমন আছেন, যাঁরা শিশুদের খুব ভালবাসেন, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবকে খুব ভালবাসেন অথচ বিশেষ ক'রে শ্রেষ্ঠ কাউকে ভালবাসেন না। এমনতর ভালবাসায় কি কোন কাজ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর ভিতর-দিয়ে superior adjustment (উন্নত নিয়ন্ত্রণ) আসে না। ভালবাসার পাত্র যেমন এবং ভালবাসার মাত্রা যেমন, তা' দিয়ে determined

(নির্দ্ধারিত) হয় মানুষ কেমনতর হ'য়ে উঠবে। মানুষ ভালবাসতেই চায়, যখন ভালবাসা ঠিক খাতে প্রবাহিত না হয় তখন তা রকমারি অভিব্যক্তি নেয়। ভালবাসতে গিয়ে shock (আঘাত) পেয়ে অনেকে মানুষকে ভালবাসা ছেড়ে দিয়ে জীবজন্তু নিয়ে প'ড়ে থাকে। এটা স্বাভাবিক নয়। যে Lord (প্রভু)-কে ভালবাসে সে স্বভাবতঃই সকলকে ভালবাসে। জীবজন্তু এমন-কি গাছপালার উপর পর্য্যন্তও তার দরদ গজায়। এই যে এতজনকে সে ভালবাসে সে কিন্তু প্রভুরই জন্য। তাই, সে-ভালবাসা তার ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারে না। ভালবাসা ইষ্টার্থী না হ'লে তা' মূঢ়তারই সৃষ্টি করে। তাই তাকে বলে মায়া। মায়া মানে তাই যা মানুষকে ছোট ক'রে রাখে। তাই আমি বলি—যে নিজের ও অপরের ভাল চায় সে যেন ইষ্টকেই তার দুনিয়ার central figure (কেন্দ্রপুরুষ) ক'রে চলে। তাতে কেউই বাদ পড়ে না। ধূলিকণা পর্য্যন্ত তাঁর ভালবাসা ও সেবার ভাগ পায়। এই ভালবাসা যেখানে যেমনতর হওয়া প্রয়োজন সেখানে তেমনতরভাবেই applied (প্রযুক্ত) হয়। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে মেপে-মেপে সে চলে। যার বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন যেমন তার ক্ষেত্রে সে তেমনতর ব্যবস্থাই অবলম্বন করে। এতে বাইরে থেকে বৈষম্য মনে হ'তে পারে কিন্তু এই হ'লো সাম্যসঙ্গত ব্যবস্থাপনা।

মিস্ শিমার—আমাদের তো প্রত্যেককেই সমভাবেই ভালবাসা উচিত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করতে গেলেই চাই concentration of love for the Lord (প্রভুর জন্য ভালবাসার কেন্দ্রীকরণ)। তা থেকেই ভালবাসা sublimated (ভূমায়িত) হয়। সে-ভালবাসার মধ্যে থাকে ভগবৎপ্রীতির essence and fragrance (নির্য্যাস ও সৌগন্ধ), যা মানুষকে ঊর্দ্ধমুখী ক'রে তোলে, উন্নতিপরায়ণ ক'রে তোলে, উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। পরমপিতাকে পরিহার ক'রে জীবপ্রীতি যেখানে আড়ম্বর বিস্তার করে, সেখানে egoism ও expectation-এর (অহংকার এবং প্রত্যাশার) irritation (জ্বালা) থাকেই কি থাকে। তাই, মানুষকে তা' শান্তি দিতে পারে কমই। আবার, প্রত্যাশাপীড়িত ভালবাসা ও সেবা যেখানেই আশানুরূপ প্রতিদান না পায় সেখানেই ক্ষোভ ও অভিমানের সৃষ্টি হয় প্রায়শঃ। কারণ, অমনতর ভালবাসা ও সেবা মানুষকে অনেক সময় অকৃতজ্ঞ ক'রে তুলতে প্ররোচনা যোগায়। দৃষ্টান্ত হিসাবেই বলছি—ধরুন, আপনাকে কেউ অসময়ে সাহায্য করেছে। সে যদি তাই নিয়ে ক্রমাগত আপনাকে খোঁটা দেয়, আপনার মর্য্যাদাকে পদদলিত করে তাহ'লে তা' কি আপনার কাছে ভাল লাগে? আপনি হয়তো তখন বলতে বাধ্য হন—আপনি সাহায্য করেছিলেন কেন? আমাকে সাহায্য ক'রে কি আপনি আমার মাথা কিনে নিয়েছেন? এমনতর বলাটা কিন্তু আপনার অকৃতজ্ঞতারই সামিল হ'লো। কিন্তু তার ব্যবহারই আপনাকে উত্তেজিত ক'রে আপনাকে দিয়ে ঐ কথা বলাল। তবে এ কথা আমি আবার বলি, যার কাছ থেকে জীবনে একদিনের জন্যও আমরা সেবা ও ভালবাসা পেয়েছি—তা' যে-উদ্দেশ্য-প্রসূতই হোক না কেন তার জন্য তার প্রতি

আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। সে যদি দুর্ব্যবহারও করে, তাহ'লেও তাকে বলা উচিত—'আপনার কাছ থেকে যে উপকার আমি পেয়েছি তার জন্য আমি চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।' অবশ্য, এই কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে এমন-কিছু করা উচিত নয় যা'তে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়। ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ যে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে গেলেন, এটা কৃতজ্ঞতার ব্যভিচার মাত্র।

মিস্ শিমার—মানুষকে ভালবাসা সহজ, কারণ মানুষ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। কিন্তু প্রভু, যিনি প্রত্যক্ষ নন, তাঁকে ভালবাসা কঠিন কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো আমি বলি প্রভুর বার্ত্তাবহ যিনি, বর্ত্তমানকালে প্রভুর জীয়ন্ত প্রতীক যিনি, তাঁকে ভালবাসার কথা। যে-ভালবাসা ইষ্টানুগ নয় সে-ভালবাসা প্রাণহীন। তা' ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে চলে। তার ক্রমাগতি থাকে না। তা' বার-বার কেটে যায়। তাই, তা' মহৎ কিছু গজিয়ে তুলতে পারে না। যে-ভালবাসা ইষ্টে সুনিষ্ঠ ও কেন্দ্রায়িত তার রকমই আলাদা। জান গেলেও সে-ভালবাসা যায় না। অ র, অমনতর ভালবাসার reflection (প্রতিফলন) যখন মানুষের উপর গিয়ে পড়ে তখন তা' মানুষের ভাল না ক'রে ছাড়ে না। মানুষের শাতনীসংঘাত সে-ভালবাসাকে স্তিমিত করতে পারে না। অনন্ত সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে তা' মানুষের মঙ্গল-সাধনে ফিঙ্গে হয়ে লেগে থাকে। অনুযোগ, অভিযোগ ও প্রত্যাশার ধার সে ধারে না। অবুঝ মানুষের প্রতি থাকে তার অসীম সহানুভূতি। এই রকমটাই একদিন মানুষকে গলিয়ে দেয়, আনে মানুষের পরিত্রাণ। ইষ্টহীন মানুষ এই সর্ব্বাত্মক ভালবাসার মূলধন পাবে কোথা থেকে? আর, তা' এমন অঘটনই বা ঘটাবে কি করে? তার অহমিকা ও প্রত্যাশা যত প্রতিহত হবে ততই সে হয় ক্ষিপ্ত হবে, না হয় অবসন্ন হ'য়ে পড়বে। শেষটা লোকের কাছে গেয়ে বেড়াবে—'সব ব্যাটা পাজি, সবাই অকৃতজ্ঞ। আমি ঢের ক'রে দেখেছি। ঢের দিয়ে দেখেছি—ওতে কিছু হয় না।' আমি কই পাগল! মানুষকে যদি ভগবৎ-প্রীতিই না দিলি, তুই তাকে দিলি কী? মানুষকে যোগ্য ও উন্নত ক'রে তোলার জন্য প্রথম চাই ধর্ম্মদান। তারপর আর যা-কিছু।

মিস্ শিমার—যতদিন আমরা কোন ভাগবত মানুষকে না পাই, ততদিন আমরা বিশেষ কোন সৎমানুষকে বিশেষভাবে ভালবেসে যদি চলি, তাহ'লে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো একান্তই দরকার। তাতে ভালবাসা cultured ও activated (অনুশীলিত ও কৃতিদীপ্ত) হয়। তবে Divine man-এর (ভাগবত মানুষের) সন্ধানে থাকতে হয়। কিন্তু কোন বিকৃত বা ভ্রান্ত বা মনগড়া ধারণার মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করবার বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। তাতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ ক'রেও আমরা হয়তো তাঁকে বুঝতে বা ধরতে পারব না, আমরা বঞ্চিত হব।

হাউজারম্যানদার মা—আপনি কি সবাইকে সমভাবে ভালবাসেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভালবাসি equitably (প্রত্যেককে তার মতো ক'রে।)

মা—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, আপনার তিনটি সন্তান আছে। আপনি তাদের প্রত্যেককে ভালবাসেন। কিন্তু আপনি প্রত্যেককে serve (সেবা পরিবেষণ) করেন, তার স্বতন্ত্র প্রয়োজন-অনুযায়ী। একটা বোর্ডিং-এ তাদের সমপরিমাণ খরচ দিয়ে যদি রাখেন, সেখানে তাদের জন্য একঢালা সমান ব্যবস্থা হয়তো হবে, কিন্তু individualised, attention, nurture ও service (বিশেষীকৃত মনোযোগ, সম্পোষণা ও সেবা) তারা পাবে না। কিন্তু individualised treatment (বিশেষীকৃত ব্যবহার) ছাড়া মানুষের প্রাণ ভরে না। আপনার একটি ছেলে হয়তো খুব তোয়াজ চায়, তার সঙ্গে যদি তোয়াজী ব্যবহার না করেন সে ক্ষুব্ধ হবে। আবার, একজন হয়তো আপনাকে খুশি করবার জন্য, সেবা করার জন্য পাগল। তাকে সেই সুযোগ দিতে হবে যাতে আপনাকে সে সেবা করতে পারে। তাতেই সে উল্লসিত ও উদ্দীপ্ত বোধ করবে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা ও পরিবেষণাই হ'লো essence of equitable love (বৈশিষ্ট্যসম্মত ভালবাসার তাৎপর্য্য)।

মা—আপনি তো জগতের সব মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারেন না। যাদের সংস্পর্শে আসেন তাদের প্রত্যেককে তার মতো ক'রে ভালবাসতে হয়তো পারেন। যারা দূরে রয়েছে, তাদের জন্য আপনার কী ব্যবস্থা? তাদের প্রতিও তো আপনার কর্ত্তব্য আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কর্ত্তব্যবুদ্ধির থেকে কিছু করি না। যা' করি তা ভালবাসার তাড়নায় করি। সকলের ভাল আমার দেখতে ইচ্ছে করে, সকলের ভাল যাতে হয় তাই করতে আমার ইচ্ছা করে। সাধ্যমতো চেষ্টাও আমি করি! তবে কতটুকুই বা আমি পারি? কিন্তু আমার আশা বিরাট। আমি কাউকে ক্ষুদ্র মনে করি না। প্রত্যেকের মধ্যেই আছে পরমপিতার অধিষ্ঠান। আমার কাছে যাদের পাই, তাদের প্রত্যেককেই আমি induce (প্রবুদ্ধ) করি,, যাতে তারা অপরকে ভালবাসে, অপরের ভাল করতে চেষ্টা করে। আমার ঋত্বিক্‌রা তো এই কাম নিয়েই ঘোরে। নিজেদের ত্রুটি, গলদ ও অসুবিধা নিয়েও এদের অনেকেই ঢের করে। সাধারণ সৎসঙ্গীদের অনেকেরও রকম খুব ভাল। কাকে দিয়ে কী হয় তা' কি বলা যায়? ভরসা আমার পরমপিতা, ভরসা আমার আপনাদের মতো মানুষ, যারা আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন। আমি অপটু হ'লে কি হয়? পরমপিতার দয়ায় আপনারা তো আমার আছেন। লক্ষ-লক্ষ আপনারা ভাল চাওয়া ও ভাল করার নেশায় মেতেছেন। পরমপিতা আপনাদের সুস্থ, সুদীর্ঘজীবী ক'রে রাখুন। আপনারা ঢের পারবেন, খুব পারবেন, আরো পারবেন।

শীতের কুহেলীজড়িত নৈশ স্তব্ধতা ভেদ ক'রে তাঁর দিব্য আশীস-বাণী আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল—"আপনারা ঢের পারবেন, খুব পারবেন, আরো পারবেন।"

এই মধুর পরিবেশে সকলের মন এখন ভাবাবিষ্ট। রাত অনেক হ'য়েছে। ঠাকুর-ভোগের সময় হ'য়ে গেছে। তাই হাউজারম্যানদা নীরবে ইঙ্গিত করতেই হাউজারম্যান-দার মা ও মিস্ শিমার উঠে পড়লেন। অন্যান্য অনেকেও গাত্রোত্থান করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তামুক খাওয়াও প্যারীচরণ!

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ২৭।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে রোদ্দপিঠ ক'রে একখানি চেয়ারে বসেছেন। প্রসন্ন-হাস্যে তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল, চোখদুটি প্রীতি ও করুণায় উচ্ছল। ভক্তবৃন্দ এসে একে-একে প্রণাম করছেন। এমন সময় ভজহরিদা (পাল) আসলেন। তিনি প্রণাম ক'রে উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর রামকানালি-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ইচ্ছা করে এমন ব্যবস্থা করতে যাতে প্রত্যেকেই আবার বাড়ী-ঘর করতে পারে। লিমিটেড কনসার্ণ ক'রে বাড়ী তৈরী ক'রে easy instalment basis-এ (সহজ কিস্তির ভিত্তিতে) প্রত্যেককে যদি বাড়ী দেওয়া যায় তবে কারও অসুবিধা হয় না। চেষ্টা করলেই এটা করা যায়। ইটের ব্যবস্থা, চুণ-বালির ব্যবস্থা, সিমেন্টের ব্যবস্থা, মিস্ত্রির ব্যবস্থা, তদারকীর ব্যবস্থা সবই নিপুণভাবে করা লাগে। কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে দেখতে হয় তার কোন্-কোন্ দিক আছে, তার জন্য কী কী প্রয়োজন। সমস্ত দিকগুলি মাথায় এঁচে নিয়ে প্রত্যেকটি কাজের জন্য উপযুক্ত লোক ও লওয়াজিমা সংগ্রহ ক'রে সুনির্দিষ্টভাবে অগ্রসর হ'তে হয়। একজন লোককে পুরোপুরি দায়িত্ব মাথায় নিতে হয়। তার মাথায় সবটা সুস্পষ্ট ছবির মতো ফুটে ওঠা চাই। সে তখন যেখানে যখন যাকে দিয়ে যা' করণীয় তা করাতে পারে। Continuity (ক্রমাগতি) কাজের একটা বড় জিনিস। যে এমনতর দায়িত্ব নেবে তার সংকল্প থাকা চাই যে কাজ সম্পূর্ণ হাসিল না করা পর্য্যন্ত সে অন্য কোন পিছুটানের দিকে নজর দেবে না। বিভিন্ন লোককে দিয়ে যে কাজ করাবে তার মাথা খুব ঠাণ্ডা হওয়া চাই, মুখমিষ্টি হওয়া চাই, প্রত্যেকের প্রকৃতি বোঝা চাই। লোকের সঙ্গে তার ব্যবহার এমন হওয়া দরকার যাতে প্রত্যেকে তার উপর খুশি থাকে এবং তার খুশির জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করতে প্রস্তুত থাকে। বিভিন্ন মেজাজের, বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে চালনা করতে গিয়ে একটা মানুষ নিজেই অনেকখানি বেড়ে ওঠে। আর, কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে-করতে মানুষের অভ্যাস ও চরিত্রও ঠিক হয়। একজন জপতপ যতই করুক, সে যদি দায়িত্ব সহকারে বাস্তব কর্ম্ম না করে, তাহ'লে কিন্তু নিজের গলদ ধরতে বা শোধরাতে পারে না। মানুষই প্রধান। মানুষ হ'লে আর সব হয়। কেউ যদি devoted (অনুরক্ত) ও willing (ইচ্ছুক) হয় তাহ'লে সে পারে। বেশী অহঙ্কারী ও স্বার্থপর হ'লে তাদের যতই গুণপনা থাকুক না কেন, তাদের দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। তুমি দেখ আমি যেমন চাই তেমনভাবে গুছিয়ে নিতে পার কিনা।

ভজহরিদা—দয়াল! আপনি যেমন আদেশ করবেন, আমি সেইভাবে করতে চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা থাকলেই পারবে।

এরপর রমণীদা ও গুরুদাসদা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত থেকে পাঞ্জা নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি সব ভাল ক'রে বলে দিয়েছেন তো?

কেষ্টদা—আজ্ঞে হ্যাঁ, সব বলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাঞ্জা দানের সময় বললেন—দেশের উদ্ধারের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য যা-যা করা লাগে তা' করবেই।

কথাগুলি তাঁর কণ্ঠে দিব্য-বাণীর মতো ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল। উভয়েই ভাবদীপ্ত অন্তরে পাঞ্জা গ্রহণ ক'রে আবার প্রণত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় এসে বসলেন। আমতলার পাশ দিয়ে অনেকে যাতায়াত করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। অদূরে পশ্চিম-দিকে পাঁচিলের কাছে দুটি কুকুর নিজেদের মধ্যে খেলা করছে। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে বললেন—এই বেশ খেলছে, মজা করছে, এখনই ওদের সামনে কিছু খাবার এনে দিলে তাই নিয়ে কামড়া-কামড়ি সুরু ক'রে দেবে। যেখানেই ভোগের নেশা আছে, অথচ ভোগ্যবস্তুর যোগান পর্য্যাপ্ত নয়, সেখানে ভোক্তা যারা তাদের মধ্যে বাধে গণ্ডগোল।

প্রফুল্ল—মানুষের ক্ষেত্রেও তো এই কথা খাটে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তবে মানুষ যদি অলস ও পরমুখাপেক্ষী না হ'য়ে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ও অর্জ্জনের দিকে নজর দেয়, তাহ'লে তাদের যোগ্যতাও বাড়ে, যোগানও বাড়ে, তাতে conflict-এর (দ্বন্দ্বের) প্রয়োজন কমে। অপরের শ্রম ও যোগ্যতার ফল আত্মসাৎ ক'রে যারা দাঁড়াতে চায়, তারাই অসুবিধার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রফুল্ল—ধনিক তার ধনশক্তির বলে গরীব শ্রমিককে শোষণ করে বলেই তো আজ শিল্পক্ষেত্রে এত অশান্তি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোষণ করা যেমন অপরাধ, নিজেকে শোষিত হতে দেওয়াও ঠিক তেমনি অপরাধ। গোলামীর নেশা, চাকরীর নেশা আজ আমাদের দেশের মানুষকে পেয়ে বসেছে। এই নেশা ঘুচে যাক, মানুষ independently earn (স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন) করার যোগ্যতা অর্জ্জন করুক, শ্রম কেনার অর্থাৎ চাকরে হিসেবে শ্রমিক পাওয়ার সুযোগ ক'মে যাক, তাহ'লে শ্রমিকের কদর হবে, তার উপর অবিচার করতে সাহস পাবে না মালিক। মালিককে শ্রমিকের স্বার্থ দেখতে হবে, শ্রমিককে মালিকের স্বার্থ দেখতে হবে, আর উভয়কে একযোগে দেখতে হবে সমাজের স্বার্থ। সমাজের স্বার্থের বিনিময়ে যদি মালিক ও শ্রমিক নিজেরা লাভবান হ'তে চায়, তবে সে-লাভ বেশীদিন টিকবে না। সমাজ হ'লো

আমাদের অস্তিত্বের ধারক ও পোষক। ধারয়িতা ও পুষ্টিদাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে কেউ অক্ষত থাকতে পারে না।

প্রফুল্ল—মালিক ও শ্রমিক সমাজের স্বার্থ দেখবে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মালিক ও শ্রমিক উভয়েই দেখবে তারা কত কম খরচে কত বেশী উৎপাদন করে কত কম লাভে লোককে দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে পারে। এইটেই হ'লো industrial efficiency-এর (শিল্পগত দক্ষতার) মাপকাঠি। এতে লোকের পক্ষে সুবিধা হয়, কেনে বেশী, তাই মালিক ও শ্রমিকের পক্ষেও সুবিধা হয়। লোকের কেনার ক্ষমতা যাতে অক্ষত ও ক্রমবৃদ্ধিপর থাকে মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই তা' দেখা উচিত। দাঁ-মারার বুদ্ধি থাকলে সেই দাঁয়ের কোপ একদিন নিজের কাঁধে গিয়ে পড়ে। পারস্পরিক স্বার্থবোধ, ব্যাপক স্বার্থবোধ না থাকলে নিজের স্বার্থ বিপন্ন হ'তে বাধ্য। হীনস্বার্থপরতার obsession (অভিভূতি) থাকলে মানুষ intellectually (বুদ্ধি দিয়ে) এটা বুঝলেও চলার বেলায় চলে উল্টো। এই উল্টো চলন সারানোর একমাত্র দাওয়াই হ'লো অকাট্য ইষ্টপ্রাণতা। আবার, একজন মুখে যত ইষ্টপ্রাণতার কথা বলুক না কেন, সে সত্যিই ইষ্টপ্রাণ কিনা তার পরখ হ'লো তার চলন ইষ্টস্বার্থী কিনা, লোকস্বার্থী কিনা। যে ইষ্টস্বার্থী, সে লোকস্বার্থী হবেই কি হবে।

প্রফুল্ল—আপনি স্বাধীন জীবিকার উপর জোর দেন, কিন্তু যার জমি নেই, মূলধন নেই, যোগ্যতা নেই সে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করবে কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জমি না থাক, মূলধন না থাক, বড় রকমের যোগ্যতা না থাক, তাতে কিছু এসে যায় না, চাই চরিত্র ও অনুসন্ধিৎসাদীপ্ত সেবাবুদ্ধি। তা' থাকলে, মানুষ কিসের মধ্য-দিয়ে যে কি ক'রে ফেলে তার ঠিক আছে ? একজনের কথা শুনেছিলাম। তার কিছু ছিল না। সে একটা ষ্টেশনের কাছে থাকত। সকালবেলায় বড় এক বালতি জল আর মগ নিয়ে ষ্টেশনে যেত, দাঁতন আর ঘুটের ছাই না কি যেন সঙ্গে নিত। সবার মুখ ধোবার ব্যবস্থা ক'রে দিত আর তার জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা ক'রে পয়সা নিত। এই থেকে সুরু ক'রে নিজের সততাযুক্ত চেষ্টার ফলে সে পরে বড় ব্যবসাদার হ'য়ে গেল। বহু টাকার মালিক হয়েছিল সে। অল্পের উপর দাঁড়িয়ে উন্নতি করার হাজারো রকমের পথ সব সময়ই খোলা আছে। ভাবলে তো মানুষ পথ পাবে। অন্যের সুখ-সুবিধা ক'রে দেবার, প্রয়োজন-পূরণ করবার ক্ষুধা যাদের মজ্জাগত নয়, তারা ভাবেও না, করেও না, পথও পায় না। আর, যোগ্যতার কথা যে বলছ, তা' কাজ করতে-করতে বাড়ে। তবে যার জন্মগত knack (কৌশল) ও inclination (ঝোঁক) যে-দিকে তার সেই পথে চেষ্টা করা ভাল।

কথা হচ্ছে, এমন সময় হাউজারম্যানদা, তাঁর মা ও মিস্ শিমার প্রভৃতিকে

আসতে দেখা গেল। বঙ্কিমদা (রায়) ওদের বড়াল-বাংলোর গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেই ওদের বসার জন্য মোহনকে দিয়ে বেঞ্চ আনিয়ে রাখলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে সন্তোষ প্রকাশ ক'রে বললেন—বঙ্কিমের চোখ-কান খুব সজাগ। Mental alertness (মানসিক সজাগতা) একটা মহৎ গুণ। অনেকের Mental alertness (মানসিক সজাগতা) থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে physical co-ordination (শারীরিক সঙ্গতি) থাকে না, তাতে ঐ alertness-এর (সজাগতার) পুরোপুরি সুফল পাওয়া যায় না। একসঙ্গে দুই-ই দরকার। কালমাণিক আমার (বঙ্কিমদাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা) এর কোনটায় কম যায় না।

উমাদা (বাগচী)—শরীর যাদের মনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, তারা কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিতান্ত অসুস্থ হ'য়ে না পড়লে, নানা কাজকর্ম্ম, খেলাধুলো, হাঁটাচলা ইত্যাদির অভ্যাস বজায় রাখা ভাল। ওতে limbs (অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি) active (সক্রিয়) থাকে এবং সেগুলির আরো active (সক্রিয়) হবার hunger (ক্ষুধা) বেড়ে যায়।

ইতিমধ্যে হাউজারম্যানদা প্রভৃতি এসে উপবেশন করলেন।

মিস্ শিমার প্রশ্ন করলেন—দূরের বিশেষ সাড়া আসে কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটার সঙ্গে যার tuning (একতানতা) হয়, তার কাছে সেইটেই আসতে পারে। প্রত্যেকটা creation-এর (সৃষ্টির) ভিতর একটা specific wave (বিশিষ্ট তরঙ্গ) থাকে, যার থেকে কিনা সে sprout করে (গজিয়ে ওঠে)। বিভিন্ন species-এর (জাতির) সৃষ্টি হয় এইভাবে। প্রত্যেকটি individual being ও thing-এর (ব্যষ্টিগত জীব ও বস্তুর) পিছনেও আছে specific vibrational wave (বিশিষ্ট স্পন্দনাত্মক তরঙ্গ)। প্রত্যেকটি চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম ও ঘটনার ভিতরও এই ব্যাপারটি থাকে রকমারি রকমে। যখন আমাদের ego (অহং) passive (নিষ্ক্রিয়) থাকে এবং যখন আমাদের মন universal mind-এর (বিশ্বমনের) সঙ্গে in tune (একতান) থাকে, তখন তা' অনেক কিছু receive করতে (ধরতে) পারে। Ego (অহং) দিয়ে নিজের manipulation-এ (পরিচালনায়) করতে গেলে সেগুলি কিন্তু হয় না, ঘুমোনর চেষ্টাটা যেমন ঘুমের অন্তরায় হয়। কিন্তু mechanically (যান্ত্রিকভাবে) wave (তরঙ্গ) সৃষ্টি ক'রে tuning (একতানতা)-ওয়ালা mechanical receiving set-এ (যান্ত্রিক গ্রহণ-যন্ত্রে) তা' receive করা (ধরা) যায়। রেডিওতে এই জিনিসটিই করা হয়। আমাদের মনের আবিল্যই বাদ সাধে, নইলে মনের যন্ত্র যদি বিক্ষেপ ও বিক্ষোভশূন্য হয় তাতে অনেককিছু ধরা পড়ে। মানুষ যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, তত higher and higher truth (উচ্চ হ'তে উচ্চতর সত্য) তার কাছে revealed (প্রকাশিত হয়)।

মিস্ শিমার—আমরা যে-সব সূক্ষ্ম জিনিস অনুভব করি, তার কি কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেগুলি কোন-না-কোন রকমে exist করে (থাকে)। যেমন একটা মানুষ মরে গেছে, মরে গিয়েও সে কিন্তু বিশেষ একটা রকমে exist করে (থাকে), তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করা চলে। In this material sphere he may not exist, but in some other finer material sphere he exists (এই ভৌতিক-স্তরে সে হয়তো থাকে না, কিন্তু অন্য কোন সূক্ষ্মতর ভৌতিক-স্তরে সে থাকে)। Matter ও Spirit (বস্তু ও আত্মা) ব'লে দুটো স্বতন্ত্র বস্তু আছে ব'লে আমার মনে হয় না, মূলতঃ একটা জিনিসই আছে in finer and grosser form (সূক্ষ্ম এবং স্থূল আকারে) Matter viewed from spiritual standpoint is spirit in gross form, and spirit viewed from material standpoint is fine matter (আত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে বস্তু আত্মিকতার স্থূলরূপ, এবং বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে আত্মিকশক্তি বস্তুরই সূক্ষ্মরূপ)। Energy (শক্তি) যেমন matter-এ (বস্তুতে) converted (রূপান্তরিত) হয়, matter (বস্তু)-কেও তেমনি energy (শক্তি)-তে convert (রূপান্তরিত) করা যায়। Atom-এর (অণুর) inherent energy (অন্তর্নিহিত শক্তি)-কে burst করার (ফাটিয়ে দেবার) কায়দা আয়ত্ত ক'রে atom-bomb (আণবিক বোমা)-কে অতো শক্তিশালী করা সম্ভব হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়। অবশ্য, এ আমার কথা। আমি কিছু জানি না।

মিস্ শিমার—জগতের অনন্ত রহস্যের বিষয় জানতে গিয়ে তো মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়। আবার জানতে, বুঝতে না পারলেও তো ভাল লাগে না। এ-অবস্থায় কী করলে ঠিক হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Lord (প্রভু)-কে ভালবাসতে হয়। তা' থেকে যা' আসে তাই-ই ভাল। Unrepelling love is the highest wisdom (অচ্যুত ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা)। ভালবাসলে তাঁর পথে চলা আসে, তাঁর জন্য করা আসে। এই একনিষ্ঠ চলা ও করা থেকে আসে জ্ঞান, সেই জ্ঞান চলা, করা ও ভালবাসাকে আরো সমৃদ্ধ করে, আরো ব্যাপক করে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) ক'রে environmental service ও integration-এর (পারিবেশিক সেবা ও সংহতির) circumference (পরিধি) ক্রমাগত expanded (বিস্তৃত) হ'তে থাকে। এমনি ক'রে simultaneously (যুগপৎ) চলতে থাকে ceaseless intensification and expansion of fruitful love, life, activity and knowledge (সফলপ্রীতি, জীবন, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের বিরামবিহীন গভীরতা ও বিস্তার-সাধন)।

পল্টুর মৃত্যুর পর পল্টুকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে দেখতে পেলেন, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্পষ্ট দেখতে পেলাম এইটুকু বলতে পারি। তোমাদের যেমন এখন

দেখছি, ঠিক তেমনি দেখেছিলাম ওকে। ওর কথা ভাবিওনি, সামনে এসে দাঁড়ালো। এমনি অনেক কিছু পরমপিতা তাঁর মরজিমতো আমার জানা ও দেখার পাল্লার মধ্যে এনে দেন। আমি অনেক জিনিস না-জানার মতো ক'রে জানি, অর্থাৎ জানি কিন্তু তার উপর hold (অধিকার) নেই, তাই জেনেও যেন জানি না। তার জন্য আমার দুঃখ নেই। পরমপিতা আমাকে যেভাবে চালান আমি সেইভাবে চলি, তিনি যা' মঞ্জুর করেন তাতেই খুশি থাকি।

১৪ই মাঘ, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ২৮।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে বিছানায় উপবিষ্ট আছেন। গায়ে একটি কাঁথা জড়িয়ে বসেছেন। বঙ্কিমদা (রায়), কালীদা (সেন), প্যারীদা (নন্দী), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), মোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়), সরোজিনীমা, কালিদাসীমা, বোনামা, সুশীলাদি, শৈলমা, প্রভৃতি অনেকে কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কপালের উপর আলোটা প'ড়ে কপালখানি চক-চক করছে, মুখখানি আনন্দোজ্জ্বল। দেখতে বড় মনোলোভা লাগছে।

কালীদা জিজ্ঞাসা করলেন—শুনেছি দুনিয়ার স্রষ্টা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে নাকি দ্রষ্টার মত দেখেন। এতে কি তাঁর কোন লাভ-অলাভ নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয় তো খুব লাভ অলাভ আছে। মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টকে overcome (অতিক্রম) ক'রে জীবনের পথে চলে, জয়ের পথে চলে, হয়তো সত্তারূপী তিনি পরমহৃষ্ট হন তা'তে। আবার, যখন কেউ হাল ছেড়ে দেয়, জীবন-সম্বেগরূপী তিনি হয়তো ব্যথিত হন। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যতই দুঃখ-কষ্ট চেপে ধরে, ততই urge for life (জীবনের জন্য আকুতি) excited (উদ্দীপ্ত) হয়। মানুষ, মানুষ কেন প্রতিটি সত্তা life (জীবন) চায়ই। এই চাওয়াটাই জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলে বাধা ও দুঃখ-কষ্টকে এড়িয়ে, না হয় অতিক্রম ক'রে, না হয় সমাধান ক'রে। তার ভিতর-দিয়েই হয় মানুষের বৃদ্ধি, আসে আনন্দ, আসে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। তাই এতে স্রষ্টা বিচলিত হ'তে যাবেন কেন ? পড়তে তো তোমার কত কষ্ট হয়েছে তাই দেখে তোমার অভিভাবক বা শিক্ষক বিচলিত হ'য়ে যদি তোমাকে বিদ্যার্জ্জনের কষ্ট পেতে না দিতেন, তাহ'লে তুমি কি আজ ডাক্তার হ'তে পারতে ? The inner hankering of creation is to be increasingly richer in the wealth of life (সৃষ্টির অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা হ'লো জীবনের ঐশ্বর্য্যে আরো-আরো সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠা)। যে দুঃখ-কষ্টকে জীবনের সমৃদ্ধির যোগানদার ক'রে তোলা যায়, সে দুঃখ-কষ্ট আর দুঃখকষ্ট থাকে না।

কালীদা—দেখতে পাই জীবনে দুঃখ তো অনিবার্য্য !

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখকে কেউ পছন্দ করে না, তাই সেই অনিবার্য্যকে অতিক্রম করতে সবাই চেষ্টা করে। ভ্রষ্ট ভোগলালসা চায় to enjoy at the cost of life (জীবনের

বিনিময়ে ভোগ করতে)। এই চাওয়াটাকে control (নিয়ন্ত্রণ) করতে না পারলে, মানুষ জীবন নিয়ে ভাল ক'রে দাঁড়াতে পারে না। Self-control (আত্ম-সংযম)-এর জন্য যে সামান্য ত্যাগ ও কষ্ট, তা' স্বীকার করতে যদি রাজী না থাকি, তবে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিপরায়ণ চলন থেকে যে অশেষ কষ্টের সৃষ্টি হয়, তা' বরণ ক'রে নিতে রাজী থাকতে হবে। মজা এই যে মানুষ দুঃখ পছন্দ করে না, অথচ দুঃখ হয় যাতে সেই কাম করে, আর দুঃখ আসলে আপসোস করে। এই বাহানার কি কোন মানে হয়? পরমপিতা অন্যায় আব্দারে কর্ণপাত কমই ক'রে থাকেন। আর, এটা ঠিক জেনো—external nature (বাইরের প্রকৃতি) মানুষের বাঁচার পথে যে দুঃখের সৃষ্টি করে, তার কিন্তু পার আছে। বিজ্ঞানের দৌলতে সে-পথ আজ মানুষের অনেকখানি করায়ত্ত। কিন্তু স্বেচ্ছায় মানুষ নিজেই নিজের দুঃখ ডেকে নিয়ে আসলে, তা' ঠেকাবে কে বল? তা' ঠেকাবার জন্যও তো পরমদয়াল দয়াপরবশ হ'য়ে মানুষের মূর্ত্তি ধ'রে মানুষের মধ্যে আসেন। কিন্তু মানুষ যদি তাঁকে না ধরে, তাঁর পথে না চলে, তাই বা তিনি কি করতে পারেন? কিন্তু এটাও ঠিক, মানুষ হয় তো জেনেও জানে না, বুঝেও বোঝে না, তাই ভুল করে। কিন্তু তার সব করা, সব চাওয়ার মূলে আছে অস্তিত্বকে বজায় রেখে স্থূল, সূক্ষ্ম নানাভাবে উপভোগ-প্রতুল হ'য়ে চলার নেশা। ভোগ করতে গিয়ে অস্তিত্ব অবলুপ্ত হ'য়ে যাক এ কেউ চায় না। Eternal existence is the cry of life (চিরস্থায়ী অস্তিত্বের জন্যই জীবনের কান্না)।

কালীদা—জীবনের কোন উপভোগই তো স্থায়ী নয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন কিছু অস্থায়ী হ'লেও যদি তা' মানুষকে আনন্দ দেয়, তাও মানুষ চায়। মিঠাই-এর মিষ্টি-স্বাদ তত সময়ই পাওয়া যায় যত সময় তা' মুখে থাকে, ঐটুকু সুখও মানুষ পেতে চায়, যদি তাতে ক্ষতি না হয়। অনিত্য জিনিস যা' নাকি সত্তার পক্ষে nurturing (পরিপোষণী) তা' চাওয়া বা করায় তুমি গররাজী নও। যদি ঠিক-ঠিক জান যে কোন-কিছু সত্তার পরিপন্থী এবং তা' তোমার জীবনে sufferings (দুর্ভোগ) ব'য়ে আনবে, তবে তা' কিন্তু তুমি চাও না। তোমার মতো ভাল-মন্দের বোধ যাদের নেই, যারা dull ও ignorant (বোকা ও অজ্ঞ), তারা হয়তো select (নির্ব্বাচন) করতে পারে না কোন্‌টা কি মাত্রায় গ্রহণীয় ও করণীয় ও কোন্‌টা বর্জ্জনীয় ও অকরণীয়। এইজন্য তারা determine (নির্দ্ধারণ)-ও করতে পারে না কেমনভাবে চললে favourable to their existence (তাদের অস্তিত্বের পক্ষে অনুকূল) হয়। এই বোধ ও শক্তি গজাতে গেলে লাগে Ideal (আদর্শ) ও তাঁতে attachment (অনুরাগ)।

কালীদা—Existence-এর (অস্তিত্বের) কাজ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ বাঁচা, বাড়া ও উপভোগ। আর এগুলি প্রত্যেকের এমনভাবে হওয়া চাই যাতে তা' অপরের বাঁচা, বাড়া ও উপভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। অপরের বাঁচা, বাড়া ও উপভোগের পথকে প্রশস্ত ক'রে নিজের বাঁচা, বাড়া ও উপভোগের

পথকে সাবুদ করার মধ্যেই নিহিত আছে অস্তিত্বের সার্থকতা। আর, তাকেই বলে ধর্ম্ম।

শৈলমা'র কপালটা ফুলে আছে। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কপালে কী হয়েছে ?

শৈলমা—একটা গুঁতো লেগেছিল।

তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরে মেন্টুকে বললেন—মা শোকাতপা মানুষ। মা'র উপর নজর রাখিস। ফোলা জায়গাটায় একটু আইওডেক্স্ ঘসে দিতে হয় আস্তে-আস্তে। আর, মা'র খাওয়ার সময় সামনে বসে থেকে দেখবি মা যাতে ঠিকমতো খায়। ওর শরীরটা দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

কালীদা—আপনি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনটা ভালভাবে যাপন করার কথাই সব সময় বলেন। তাতেই কি সব হবে ? ভালভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কী ? দু'দিন পরেই তো দেহ থাকবে না। তারপর সব অন্ধকার। দু'দিনের জাগতিক জীবনের জন্য কেন মানুষ এত ব্যস্ত ও বিব্রত হ'তে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালভাবে বাঁচার কথা এত বলি তার কারণ—এইটে হ'লো সত্তার চিরন্তন চাহিদা। সরাসরি ধর্ম্মের কথা, নীতির কথা সকলের ভাল না লাগতে পারে। কিন্তু বাঁচার কথা প্রত্যেকের কাছেই উপাদেয়। এমন-কি যারা suicide (আত্মহত্যা) করতে উদ্যত হয়, তাদেরও শুনেছি শেষমুহূর্ত্তে বাঁচার জন্য প্রবল আগ্রহ হয়। তাই ভগবদ্দত্ত এই basic biological urge (মূলীভূত জীববিদ্যাসম্মত-আকুতি)-কে proper nurture (বিহিত পোষণ) দিয়ে আরোতরের দিকে goad (চালিত) করতে পারলে তা' থেকে সব-কিছুই এসে পড়ে। আমাদের proceed করতে (অগ্রসর হ'তে) হবে from the finite to the infinite (সীমা থেকে অসীমে)। যা' আছে তার উপর দাঁড়িয়ে আরোর দিকে হাত বাড়াতে হবে। বাঁচার ইচ্ছাটাকে মূলধন ক'রে সমাজের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যা'তে প্রত্যেকের বাঁচা প্রত্যেকের বাঁচার সহায়ক হয়। একেই বলে ধর্ম্ম—যা'তে সপরিবেশ সকলের ধৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এর জন্য চাই সেবাবুদ্ধি, স্বার্থত্যাগের বুদ্ধি, সংযম ইত্যাদি। সঙ্গে-সঙ্গে চাই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যসম্মত যোগ্যতার বিকাশ ও কর্ম্মতৎপরতা। এগুলিকে স্ফুরিত করতে গেলে চাই ইষ্টের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রাণের যোগ, প্রেমের যোগ। তাঁকে ভালবাসলে মানুষ তাঁকে খুশি করার জন্য পাগল হ'য়ে ওঠে। তার ভিতর-দিয়েই মানুষের ভিতর দেবগুণ বিকশিত হয় এবং জড়তা ও পশুপ্রবৃত্তির নিরসন হয়। ধীরে-ধীরে মানুষ ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠে এবং ইষ্টার্থে নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধনকে জীবনের ব্রত ব'লে গ্রহণ করে। এতে মানুষ শুধু নিজে বাঁচে না, পরিবেশও অভ্যুদয়ের পথে চলে। পারস্পরিকতা স্বতঃ হ'য়ে ওঠে সমাজে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে ওঠে। কেউ কাউকে পড়তে দেয় না, ঝরতে দেয় না, মরতে দেয় না। এমনতর ভালবাসাময় জীবনই তো স্বর্গ। তা'ছাড়া মানুষ যখন ইষ্টৈকলক্ষ্য হ'য়ে ওঠে তখন তার সর্ব্ববৃত্তি আপনা

থেকে সুবিন্যস্ত হয়, সুসংন্যস্ত হয়। এমনি ক'রেই মানুষ ভগবান-লাভের পথে অগ্রসর হয়, যা'-কিনা তার চরম কাম্য। তাহ'লে বুঝে দেখ ভালভাবে বাঁচা বলতে কি বুঝায়। জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য ধর্ম্ম নয়। জীবনটাকে সুন্দর ক'রে তোলার মধ্যেই আছে জীবনের সার্থকতা। ইতিবাচক কথা না ব'লে নেতিবাচক কথা যত বেশি বলা যায়, মানুষ ততই নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে। তা'তে তামসিকতাই প্রবল হ'য়ে ওঠে। ফলে দারিদ্র্য, বিপদ ও বিধ্বস্তিই মানুষের সাথীয়া হয়। বল, তা'তে কার কী লাভ? আমি বলি—প্রিয়পরমকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাস, তাঁরই জন্য, তাঁকে নিয়েই, তাঁরই প্রদর্শিত পথে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে আনন্দময় জীবন-যাপন কর। এমনতর জীবন-যাপন করায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কোনটাই অপ্রাপ্ত ও অপ্রাপ্য থাকবে না। ইহকাল ও পরকাল দুই-ই রক্ষা পাবে। এটা কি ফেলবার কথা?

প্রফুল্ল—আত্মা যখন অমর তখন দেহ থাক্ বা না থাক্ তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মার-আত্মাত্ব উপলব্ধি করতে গেলেই দেহ দরকার। দেহ ছাড়া আমরা সেই উপলব্ধিতে উপনীত হ'তে পারি না। দেহ-মন যদি রোগ, শোক, দারিদ্র্য, অশান্তি ও অভাবে প্রপীড়িত থাকে, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সুজনন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবিকা, আইন, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহ'লে কিন্তু মানুষ অন্তর্ম্মুখী সাধনায় মনোনিবেশ করতে পারে না। তাই, আত্মোপলব্ধিব জন্যই মানুষের বাঁচার সর্ব্ববিধ লওয়াজিমা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই করতে গিয়েও মানুষ আত্মাব শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন হয়। তাই, জীবনের এমন কোন কাজ নেই, এমন কোন দিক নেই যার সঙ্গে আত্মোপলব্ধির সম্পর্ক নেই। বাঁচতে গেলেই মানুষকে আত্মোপলব্ধির পথে চলতে হয় এবং আরো-আরো আত্মোপলব্ধির পথ পরিষ্কার করার জন্যই মানুষের দেহগত জীবনকে টিকিয়ে রাখতে হয়। দেহহীন আত্মোপলব্ধি একটা কথার কথা মাত্র। ওর কোন মূল্য নেই। সাধনার ভিতর-দিয়ে বোধকে যত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম স্তরে উন্নীত করা যায় ততই আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। শরীর না থাকলে সাধনাই বা করে কে আর উপলব্ধিই বা করে কে? প্রধান জিনিস হ'ল নিষ্ঠা ও ভক্তি। মানুষের প্রিয়পরম ব'লে যদি কেউ থাকে তাহ'লে তার একমাত্র আগ্রহ হয় তাঁকে সেবায় সুখী করা। যে ইষ্টের সুখ-সাধনে, তৃপ্তি-সাধনে ব্যাপৃত, সে চায় অনন্তকাল ধ'রে ইষ্টকে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর উপভোগ্য হ'য়ে নিজের জীবনটাকে উপভোগ করতে। মরণের কথা তার মনে প্রবেশ করারও অবকাশ পায় না। এই ইষ্টতন্ময়তার মধ্যেই নিহিত থাকে অমরতার আস্বাদ। এই জন্যই তো জীবন আমাদের কাছে এত প্রিয়। জীবন যদি না থাকে তাহ'লে জীবনবল্লভকে আমরা উপভোগ করব কি করে? ধর, বাষ্প অসীম শক্তিমান ও অমর। তাই দিয়ে ইঞ্জিন চলে। ইঞ্জিনের ভিতর এমনতর সমাবেশ থাকে

যার দরুন বাষ্প তার ভিতর-দিয়ে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হ'তে পারে। বাষ্পের ক্রিয়াশীলতার ভিতর যে কি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে তা' কি ইঞ্জিন না দেখলে বা ইঞ্জিন না থাকলে আমরা বুঝতে পারতাম? তেমনি শরীরের ভিতর-দিয়ে মনের ভিতর-দিয়ে মানুষের বিচিত্র গুণের ভিতর দিয়ে যদি আত্মার শক্তি প্রকাশ না পায় তাহলে কি আত্মার মহিমা উপলব্ধি করার অন্য কোন পথ আছে? অন্ততঃ আমরা যতদিন মানুষ হিসাবে অস্তিত্ব ধারণ করছি, ততদিন আমাদের চেষ্টা করতে হবে যা'তে আমাদের স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, জীবন, আয়ু, আনন্দ ও শক্তি ক্রমবৃদ্ধিপর হ'য়ে চলে। তাতেই আত্মার অমরতার প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা দেখানো হবে। তুমি, আমি হয়তো এই দেহ নিয়ে চিরকাল থাকব না, কিন্তু তোমার আমার বংশধর ও সমগ্র মনুষ্যজাতি চিরকাল পৃথিবীতে থাকবে। আমাদের উচিত এমনভাবে চলা যার ফলে ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা আরও ভালভাবে আরও সুন্দরভাবে, আরও সার্থকভাবে বাঁচতে পারে। এর ফলে সুবিধা এই হবে যে তুমি, আমি মৃত্যুর পর আবার যদি কখনও অন্য কোন দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে আসি, তাহ'লে সেদিনও আমরা এই সুন্দর সমাজ ও পরিবেশের অবদান উপভোগ করতে পারব।

কালীদা—আমি আছি এই বোধটা মানুষের যায় না। কিন্তু মানুষ জানে না সে কে বা কী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে মানুষ জানুক বা না জানুক, আমি আছি এই বোধটা সে ছাড়তে চায় না। থাকাটাকে সে চিরন্তন ক'রে ধ'রে রাখতে চায়। এর থেকেই বোঝা যায় যে মানুষের পেছনে eternal (চিরন্তন) কোন-একটা বস্তু আছে। নইলে এই hankering (আকাঙ্ক্ষা) থাকত না। মানুষ শুধু বাঁচতে চায় না, চায় নিজের অস্তিত্বকে উপভোগ করতে। এই অস্তিত্বের উপভোগের জন্য দরকার হয় beloved (প্রিয়)। Beloved (প্রিয়) যেমন-তেমন হ'লে মানুষের being (সত্তা) fulfilled (পরিপূরিত) হয় না। Divine man (ভাগবত-মানুষ)-কে মানুষ যখন Beloved (প্রিয়) হিসাবে পায় তখনই তার সত্তা পরিপূর্ণ বিকাশ ও উপভোগের সুযোগ পায়। অমনতর মানুষের প্রতি অকাট্য অনুরক্তি যখন জাগে তাঁর সঙ্গে যখন মানুষের যথাযথ সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সে বোধ করতে পারে সে কে? পরমপিতাও নিত্য, আমরাও নিত্য! তিনি আমাদের নিত্য সেব্য, আমরা তাঁর নিত্য সেবক। এই আমাদের আত্মপরিচয়। তাই অন্তহীন জীবনের প্রতি আমাদের এত সীমাহীন আকুতি।

কালীদা—সুষুপ্তি ও সমাধির মধ্যে কি বোধ থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাধি মানে সম্যক ধারণা, তার মধ্যেও sense of sequence of events (ঘটনা-পারম্পর্যের বোধ) থাকেই, তাই সমাধির ভিতর-দিয়ে মানুষ

knowledge (জ্ঞান) নিয়ে ফেরে। সে-জ্ঞানের মূল্য অনেক বেশী। কারণ, বাইরের কোন বিক্ষেপ বা কল্পিত ধারণা সেই জ্ঞান বা বোধকে ব্যাহত করতে পারে না। জ্ঞাতব্য যা' তার স্বরূপের অবিকৃত ও অবিমিশ্র অভিব্যক্তি ও মর্ম্মস্পন্দনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ একাত্মতামূলক পরিচয় ঘটে। তাতে মানুষ ছিন্ন-সংশয় হয়। লোকে সে-সম্বন্ধে হাজারো রকমের কথা বললেও ঐ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের অকাট্য সত্যতা-সম্বন্ধে তার মনে কোনদিন প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি জাগে না। গভীর ঘুম থেকে উঠলে কিন্তু মানুষ কোন নূতন জ্ঞান বা প্রত্যয় নিয়ে ফেরে না। তবে তখনও যে তার বোধ থাকে, তা' এই থেকে মনে হয় যে ঘুমের পর সে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সেটা যেন নিদ্রাকালীন অস্ফুট স্বাচ্ছন্দ্য-বোধেরই রেশ।

কালীদা—সমাধি লাভ করেছে, এমনতর মানুষ কি হিংসাত্মক কাজ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজন এক-এক object (বিষয়) নিয়ে সমাহিত হয়। অনেক রকমের সমাধি আছে। কারও সমাধির বিষয় হয় টাকা, কারও সমাধির বিষয় হয় মেয়েছেলে। অমন সব সমাধিতে জ্ঞান বাড়ে না, বাড়ে মোহ ও মূঢ়তা। তাতে প্রীতি ও সহনশীলতার বদলে দ্বেষ, হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও দম্ভই বাড়ে। কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রতি হাড়ভাঙ্গা টানের ভিতর-দিয়ে যে সমাধি হয়, তাতে ব্রাহ্মীজ্ঞানের উন্মেষ হয়। তার মানে that knowledge leads to being and becoming (সেই জ্ঞান সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথে নিয়ে যায়)। তার হিংসাও জীবনধর্ম্মী হয়। তাকে দিয়ে মানুষের, মানুষের কেন সব জীবের ভাল ছাড়া খারাপ হয় না। তার সব কাজ হয় মঙ্গলধর্ম্মী। একজনের হয়তো কিছু নেই, তার নিজেরই হয়তো পেট চলে না। আমি হয়তো তার উপর নিত্যনূতন ফরমাজ করি। বাইরে থেকে দেখতে গেলে এটাকে এক প্রকারের নিষ্ঠুরতা ব'লে মনে হবে। কিন্তু কেউ যদি রাজী থাকে নির্দ্দয়ভাবে চাপের উপর চাপ দিয়ে তাকে দুরস্ত ক'রে তুলতে আমার খুব ভাল লাগে। যে কষ্টে ভাল হবে, মানুষকে সে-কষ্টের মধ্যে ফেলতে আমার কোন সংকোচ হয় না। কিন্তু যাদের টান কম, যারা বেশী চাপ ও চোটের মধ্যে পড়লে ছিটকে যেতে পারে, তাদের বেলায় যা' করণীয়, তা' করার সুযোগ আমি সব সময় পাই না। গুরু আয়োদধৌম্য শিষ্য উপমন্যুর উপর যে কঠোর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তা' তিনি চালাতে পারতেন না, যদি উপমন্যুর তাঁর উপর unrepelling attachment (অচ্যুত অনুরাগ) না থাকত। গুরুর আদেশমতো নির্ব্বিচারে নানা কৃচ্ছ্রতা স্বীকার ক'রে মাঠে-মাঠে গরু চরিয়ে গুরুর আশীর্ব্বাদে উপমন্যু যে মহাজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল, সেটা কিন্তু একটা আজগবী ব্যাপার নয়। সক্রিয় গুরুনিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে মানুষ জ্ঞান, বোধ, বিচার-বিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের এমন একটি চাবিকাঠি হাতে পায়, যার ফলে যে-কোন বিষয়ের মূলগত মর্ম্ম ও তত্ত্ব আয়ত্ত করতে বেগ পেতে হয় না। কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোন্‌টা ত্যাজ্য, কোন্‌টা জীবনীয়, কোন্‌টা জীবনের পরিপন্থী তা' সে সহজেই নির্ণয় করতে পারে। জীবনের মূল

যিনি, তাঁতে যার নজর সব সময় নিবদ্ধ থাকে, সে সব জিনিসেরই, সব বিষয়েরই মূল তাড়াতাড়ি ধরতে পারে।

প্রফুল্ল—ইষ্টহীন বহু ব্যক্তিকেও তো তীক্ষ্ম ধী-সম্পন্ন হ'তে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়তো হ'তে পারে। কিন্তু মানুষ যদি সুকেন্দ্রিক না হয় তবে তার মেধা ও ধী তাকে তীব্রবেগে সাবাড়ের পথেও নিয়ে যেতে পারে। সে যে শুধু নিজের ক্ষতি করে তা' নয়, অপরকেও সে হয়তো সর্ব্বনাশের পথে পরিচালিত করতে পারে। প্রবৃত্তিপরায়ণ চলনের সমর্থনে সে হয়তো এমন ধারালো যুক্তির অবতারণা করতে পারে, যা' শুনে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে সেইদিকে ছুটবে।

চব্বিশ পরগণা থেকে পরিবারবর্গসহ এক দাদা এসেছেন আজ সন্ধ্যায়। তাঁরা এসে প্রণাম করলেন।

দাদাটি কাতরভাবে তাঁর নানা জটিল ব্যাধি ও তজ্জনিত অসুবিধার কথা নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খগেনকে (মণ্ডল) বললেন—প্যারীকে ডাক্ তো।

প্যারীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই একে দেখেশুনে এমন ব্যবস্থা করে দিবি যাতে তাড়াতাড়ি ভাল হ'য়ে ওঠে। ছা-পোষা মানুষ, রোগের জন্য ভালভাবে কাজকাম করতি পারে না, তাতে সংসারে কত কষ্ট হয়, তারপর রোগের যন্ত্রণা তো আছেই। তুই লক্ষ্মী! ওকে সারিয়ে দে।

প্যারীদা—হ্যাঁ! আমি ভাল ক'রে দেখব। আপনার দয়া হ'লে সেরে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া।

ভদ্রলোকের-স্ত্রী ব্যাকুলভাবে বললেন—বাবা! আপনার আশীর্ব্বাদই সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—এই ডাক্তার-বাবাকে ভাল করে ধর্। ও যদি সদয় হয়, তাহ'লে অনেক-কিছু করতে পারে।······পরক্ষণে বললেন—তোরা লেপ-কাঁথা নিয়ে আইছিস তো? এখানে বড় শীত। দেখিস নিজেদের, ছাওয়াল-পাওয়ালদের যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

মা-টি বললেন—আমাদের মোটামুটি ব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম নে। কাল-সকালে ডাক্তার-বাবুর কাছে আসিস। জানিস তো ডাক্তারবাবু কোন্ ঘরে থাকে? (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে)—ঐ যে দালান দেখছিস, ওর পশ্চিম দিকের একটা ঘরে। এসে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবি।

ওঁদের চোখেমুখে এক নূতন আশা ও আনন্দের আলো জ্বলে উঠলো। ওঁরা আবার প্রণাম ক'রে অতিথিশালার দিকে গেলেন।

কালীদা—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আছে—সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমীর দিন প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের কথা। এগুলি কি ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব অনেক-কিছুই হ'তে পারে। এই রাতের বেলায় তুমি যদি

একটা powerful telescope (শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ) দিয়ে আকাশের দিকে তাকাও, তাহ'লে এমন অনেক সব তারা তুমি দেখতে পাবে, যা' এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ না। এখন শুধু চোখে দেখতে পাচ্ছ না ব'লে যে সেগুলি নেই তা' তো নয়। অমনি অনেক-কিছু আছে, যা' হয়তো সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি যদি সেগুলি দেখার মতো স্তরে উন্নীত হয়, তাহ'লে তখনই দেখতে পাই। তপস্যার ভিতর-দিয়ে আমাদের মন একাগ্র হয়, বোধশক্তি তীব্র ও সূক্ষ্ম হয়। তখন অনেক-কিছু ধরা পড়ে। পরমপিতা আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রী-সমন্বিত এই যে শরীর-যন্ত্রটি দিয়েছেন, বিহিতভাবে এর যথাযথ উৎকর্ষণী অনুশীলন ও সদ্ব্যবহার যদি আমরা করতে পারি, তাহ'লে অনেক রাজ্যের অনেক দৃশ্য, অনেক বার্ত্তাই আমাদের বোধের দ্বারে উপনীত হ'তে পারে। This is a factual reality (এটা তথ্যগত বাস্তব), এর মধ্যে অলৌকিকতার কিছুই নেইকো। বিধিমতো করলে বিহিত ফল পাবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক দেওয়া হ'লো। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর মেণ্টুভাইয়ের দিকে চেয়ে অপূর্ব্ব মনোহর ভঙ্গীতে মৃদু-মৃদু হাসছেন।

মেণ্টু—একজন হয়তো কোন অন্যায় কাজ করলো, কিন্তু তার বিবেক হয়তো তাকে বললো সে ঠিকই করেছে, কাজটা যে অন্যায় তার বিবেক দিয়ে সে তা' বোধ করতে পারল না এমন ক্ষেত্রে তার ঐ অন্যায়ের ফল কি তাকে পুরোপুরিই পেতে হবে? প্রত্যেকে চলে তো তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে যা' সে ঠিক ব'লে বোঝে, তাই করা ছাড়া তার উপায়ই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও বিবেক যদি বলে যে চুরি করা ন্যায় কাজ, এবং সেই বিবেকের বশবর্ত্তী হ'য়ে যদি কেউ চুরি ক'রে ধরা পড়ে, তাহ'লে কি তার শাস্তি হবে না? অন্যায়ের ফল আছেই। তা' কেউ এড়াতে পারে না! বিবেক যদি ভুল বোঝে, কর্ম্মফল ঠিকবুঝ জাগিয়ে দিতে সাহায্য করে, অবশ্য যদি মানুষ আত্মসমীক্ষা-তৎপর হয়। মন এক-এক সময় এক-এক রং ধরে, মনের পাগলামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে, অনুসরণ না ক'রে নির্ম্মমভাবে প্যাগল মনকে গুরুমুখী ক'রে তুলতে হয়।

মেণ্টু—আমি হয়তো ন্যায় কাজ করলাম, আর-একজন হয়তো ভয় দেখিয়ে বলল—না! তুমি ঠিক কাজ করনি। এইভাবের অনেক অকারণ ঝামেলার মধ্যে তো পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যা'ই বলুক, ন্যায় কাজ করলে সময়ে তার সুফল তুমি পাবেই। তোমার conviction (প্রত্যয়) থাকলে তুমি আজেবাজে লোকমতে ঘাবড়াবেই না। ওদিকে ভ্রূক্ষেপই করবে না। ভাল কাজ যদি কর এবং লোকে ভুল বুঝে তোমাকে যদি সেজন্য শাস্তিও দেয়, তাহ'লেও কখনও স্বীকার ক'রো না যে কাজটা খারাপ। শাস্তির ভয়ে ভাল জিনিসটাকে খারাপ ব'লে স্বীকার করলে moral back-bone (নৈতিক মেরুদণ্ড) weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে যায়। Opposition (বিরোধ)

minimise করার (কমাবার) জন্য বড় জোর tactfully (সুকৌশলে) এই কথা বলতে পার—আমার উদ্দেশ্য এই ছিল কিন্তু করার রকমটা হয়তো নিখুঁত হয়নি। আপনি হ'লে হয়তো আরো কত সুন্দরভাবে এটা করতে পারতেন।

কালীদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের স্থিতিকাল জানা থাকলে বোঝা যায় একজনের পরমায়ু বাড়লো কি কমলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকভাবে চললে এবং বাইরের আগন্তুক কোন কারণ না ঘটলে যার যেমন life-potency (জীবনীশক্তি) সে ততদিন বাঁচতে পারে। একেই বলে পরমায়ু। এই life-potency (জীবনীশক্তি) কার কত বা কেমন তা' determine (নির্দ্ধারণ) করা চলে। চিন্তা, চলন, আহার, আচার ও environmental adjustment-এর (পারিবেশিক বিন্যাসের) তারতম্য অনুযায়ী তা' খর্ব্ব হয় বা বৃদ্ধি পায়।

শৈলমা—আমার পল্টুর নামধ্যানের নেশা ছিল খুব। শুনেছি নামধ্যানে নাকি আয়ু বাড়ে। কিন্তু পল্টু তো স্বল্পায়ু হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-নেশা যেমন ছিল, অন্য দিক দিয়ে এমন কোন উপকরণ বা অনুচলনের খাঁকতি হয়তো ছিল, যাতে দীর্ঘ আয়ু ব্যাহত হয়। একটা নিয়ে তো হয় না, জীবনের সঙ্গে ও পিছনে অনেক-কিছু দিক জড়ান থাকে।

বিধির নিয়ম পালবি যেমন (এইটুকু ব'লে প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে বললেন)—কি যেন একটা ছড়া আছে না ?

প্রফুল্ল—বিধির নিয়ম পালবি যেমন
যতটা বা যতটুকু
কেটে-ছেঁটে সব মিলিয়ে
পাবিও ফল ততটুকু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহিত কর্ম্মের বিহিত ফল আছেই। নামধ্যান যদি ঠিকমতো ক'রে থাকে, তার ফল সে পেয়েছেই। কিন্তু তা' হয়তো এত প্রবল নয় যা' যাবতীয় প্রতিকুল শক্তিকে প্রতিহত ক'রে দিতে পারে। এত রকমের অজ্ঞতা ও ত্রুটিপূর্ণ চলন সত্ত্বেও আমরা যে টিঁকে থাকি সেই-ই তো পরমপিতার পরম দয়া। তাঁর পালনী শক্তি সর্ব্বদাই আমাদের সংরক্ষণে তৎপর, কিন্তু আমাদের অতীত ও বর্ত্তমান কর্ম্ম যদি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তবে তিনি নাচার হ'য়ে পড়েন।

কালীদা—বিধির নীতি বলতে কী বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে সত্তা পরিপালিত, পরিপোষিত ও সম্বৃদ্ধ হয় তাই-ই বিধির নীতি। বিধি হ'লো তাই যা' কোন-কিছুকে বিশেষভাবে ধ'রে রাখে। বিধি ভালর দিকে যেমন হয়, মন্দর দিকেও তেমনি হয়। বিশেষ-বিশেষ করার মধ্য-দিয়ে মানুষ যেমন উন্নত হয় তেমনি অবনতির পথেও চলে। আমাদের সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কেমন ক'রে আমরা অবনতিকে এড়িয়ে উন্নতিকে আলিঙ্গন করতে পারি। মানুষের জ্ঞান কম, বোধ কম, তাই তারা বুঝতে পারে না গর্হিত চলন ক্রমপর্য্যায়ে নিজের ও

পরিবেশের জীবনে কি গভীর ক্ষত ও ক্ষতির সৃষ্টি করে। সেইটে যদি সে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পারে তাহ'লে তার পক্ষে খারাপ করা এক-প্রকার অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। আবার, শুভ-চলন ধীরে-ধীরে কেমন ক'রে অমঙ্গলকে বিনায়িত ক'রে মঙ্গলের পথ প্রশস্ত ক'রে তোলে তা' যে বোধ করতে পারে, শুভ-চলনের প্রতি স্বতঃই তার অকাট্য আগ্রহ ও আস্থার সঞ্চার হয়। সেইজন্য বিধির নীতি কেমন অমোঘভাবে ক্রিয়াশীল হয়, তা' নিয়ে চর্চ্চা যত বেশী হয় ততই ভাল! আর, এটা যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা অনেক নীতিকথা বলি কিন্তু কেন কী করণীয় ও গ্রহণীয় এবং কেন কী অকরণীয় ও বর্জ্জনীয় তা' যদি causal relation (কার্য্য-কারণ সম্পর্ক) unfold (উদ্ঘাটিত) ক'রে মানুষের বোধের গোচরীভূত না করা যায়, তাহ'লে তাতে মানুষের প্রত্যয় পাকা হয় না। আর, প্রত্যয় পাকা না হ'লেই মানুষের চলনের মধ্যেও ইতস্ততঃ ভাব ও ব্যত্যয় দেখা দেয়। সেইজন্য আমি বলি কিসে ভাল হয় তাও তোমরা জান আবার কিসে খারাপ হয় তাও তোমরা ভাল ক'রে বুঝে নেও। শুধু বুঝলেই হবে না, ভাল যাতে হয় তা' কর আর মন্দের পথ নিরোধ ও নিরাকরণের ভিতর-দিয়ে সংকীর্ণ ক'রে তোল। তুমি যদি ভালভাবে চ'ল তাতে তোমার ও অনেকেরই ভাল হ'তে পারে। তুমি যদি খারাপভাবে চল, তা'তে তোমার ও সেই সঙ্গে অনেকেরই খারাপ হ'তে পারে। তাই নিজে ভালভাবে চলা, অন্যকে ভালভাবে চলতে সাহায্য করা এবং খারাপ পথে যারা চলে যেন-তেন-প্রকারেণ তা'দের তা' থেকে বিরত ক'রে ভালর পথে টেনে আনা ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য্য।

প্রফুল্ল—অনেকে সৎভাবে চলা সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করে না। তাই তো মানুষ সৎপথে চলতে উৎসাহ পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যা' বলছ তা'র মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। যথাযথভাবে কোন কাজ করলে তা'র উপযুক্ত ফল ফলবেই। কিন্তু কাজের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে তাহ'লে সেই ত্রুটি-অনুযায়ী যে-যে অসুবিধার সৃষ্টি হবার তাও হবে। ধর, তুমি খুব সাধু প্রকৃতির, তুমি কাউকে ঠকাও না। কিন্তু তোমার বুদ্ধি হয়তো প্রখর নয়, সহজেই তোমাকে অন্য লোক ঠকাতে পারে এবং এর ফলে তুমি হয়তো বেকায়দায় পড়লে। এই বেকায়দায় পড়াটা তোমার সততার ফল নয়। এটা তোমার বেকুবীর ফল। এই বেকুবীকে যদি সততার অঙ্গ মনে কর তাহ'লে তোমার বিচারে ভুল রইল। এইভাবে আমাদের দোষের দরুনই অনেক বিপর্য্যয় ঘটে। কিন্তু কী জন্য কী ঘটলো তা' আমরা ভাল করে analyse (বিশ্লেষণ) করি না, প্রয়োজন মতো নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ)-ও করি না। তাই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাই। মন্দের কারণকে অপসারণ ক'রে ভাল যাতে অব্যাহত হয় তা' বিধিমতো করলে ভাল বই খারাপ হ'তে পারে না—এই আমার অকাট্য মত। ভালতে যেয়ে পে'ছাতে গেলে নিজেকে যেমন adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয় বাইরের অনেক-কিছুর দিকে নজর রেখে সেগুলিও তেমনি flawlessly (নির্ভুলভাবে) manipulate (পরিচালনা) করতে হয়। চাই

all round (সর্ব্বতোমুখী) বোধ, দৃষ্টি ও কর্ম্ম। এই ব্যাপারে যেখানে যার যতটুকু খাঁকতি থাকবে তা'কে দুর্ভোগও ভুগতে হবে ততটুকু। এইটুকু জেনে রেখো—দুঃখের কারণ সৃষ্টি না করলে দুঃখের সৃষ্টি হয় না। সামাজিক জীব হিসাবে পরিবেশের দুষ্কর্ম্মের ফলও আমাদের অল্পাবিস্তর ভোগ করতে হয়। তাই সুখী ও সার্থক হ'তে গেলে নিজের ও পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট দুঃখের কারণগুলিকে বিহিতভাবে নিরাকরণ ক'রে সুখ ও সার্থকতার বাস্তব কারণগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টি ক'রে চলতে হবে। যাবতীয় অজ্ঞানতা, খাঁকতি ও অপারগতাকে অতিক্রম ক'রে পারঙ্গমতায় অধিরোহণ করতে হবে। উন্নতির তাৎপর্য্যই হ'লো তাই :

কালীদা— ভাল-মন্দ তো ধারণার ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তা' মনে হয় না। Effect (ফল) দিয়ে বুঝতে হবে কোন কাজ ভাল কি মন্দ। কোন কাজের effect (ফল) যদি খারাপ হয়, অথচ তুমি যদি তা'কে ভাল কাজ ব'লে মনে কর, তাহ'লে তোমার ঐ মনে করার দরুন effect (ফল)-টা বদলে যাবে না। কোন কাজের effect (ফল) যদি সত্তাপোষণী হয়, তবে তাকেই বলা যায় ভাল কাজ। লোকে প্রথমটা বুঝতে না পেরে তাকে যদি খারাপ কাজ ব'লে মনে করে, তা'তেই কাজটা খারাপ হ'য়ে যায় না। Right conception ও conviction (ঠিক বোধ ও প্রত্যয়) থাকলে মানুষ কখনও ভ্রান্ত লোকমতে বিভ্রান্ত হয় না। অবশ্য অপরের mis-conception) (ভুল ধারণা) থাকলেও, তা'দের ego (অহং)-কে wound (আঘাত) না ক'রে tactfully (কৌশলে) deal (ব্যবহার) করতে হয়। কারও ego (অহং)-কে wound (আঘাত) করলে অযথা opposition-এর (বিরুদ্ধতার) সৃষ্টি হয়। তা'তে নিজের চলার পথ, করার পথ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। বিরোধহীন অসৎনিরোধ ও প্রীতি-উদ্দীপী বৈধী বাক্ ও ব্যবহার এস্তামাল ক'রে আদর্শের পথে কল্যাণের আমন্ত্রণে চলতে হয় অবিচলিত চিত্তে।

কালীদা—খ্রীষ্টান পাদ্রীরা conversion (ধর্ম্মান্তরকরণ)-কে ভাল কাজ ব'লে মনে করে। এটা কি সত্যিই ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে যদি স্বীয় ইষ্ট ও পিতৃপুরুষের সাত্বত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না ক'রে বরং ঐ উৎসের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ক'রে যীশু-অনুরাগী ক'রে তোলা হয়, তা'তে খারাপ হয় না। কিন্তু ইষ্ট ও সাত্বত পিতৃকৃষ্টি থেকে বিচ্যুত ক'রে কাউকে যদি খ্রীষ্টান করা হয়, তবে কাজটা anti-Christ (খ্রীষ্ট-বিরোধী) ব'লে আমার মনে হয়। This sort of conversion is a form of treachery (এই ধরণের ধর্ম্মান্তরকরণ একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা)। উৎসকে অবজ্ঞা করতে শেখান মারাত্মক ফল প্রসব করে। আমি বলি ঈশ্বরও যেমন এক, ধর্ম্মও তেমনি এক এবং প্রেরিতপুরুষরাও তেমনি এক। Their advent is for the self-same mission (তাঁদের অবতরণ একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য)। তাঁরা মানুষের দুনিয়ায়, ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকৃত বর্ম্ম। তাঁদের প্রতি অনুরাগ-নিবন্ধ হ'য়েই মানুষ শয়তান

ও অধর্ম্মের কবল থেকে রেহাই পায়। তাঁরা দেশকাল-পাত্রানুযায়ী একই সত্য পরিবেষণ ও প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে বিভেদ করতে নেই। স্বীয় ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রেখে পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী প্রত্যেকের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে চলতে হয়। পূর্ব্বতনদের অনুসরণ করার সহজ পথ হ'লো তাঁদের পরিপূরক বর্ত্তমান মহাপুরুষ যিনি, তাঁর শরণাগত হওয়া। এরজন্য স্বীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পিতৃপুরুষ বা পিতৃকৃষ্টি ত্যাগ করা লাগে না। এর ভিতর-দিয়েই বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও এককে কেন্দ্র ক'রে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে।

মেণ্টু—সব সময় কি ব্রহ্মচিন্তা নিয়ে থাকা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা ক'রলেই থাকা যায়। ব্রহ্মচিন্তা মানে বৃদ্ধির চিন্তা, বিস্তারের চিন্তা। শুধু চিন্তা নিয়ে মানুষ থাকতে পারে না। চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে লাগে বাক্য, কর্ম্ম ও প্রয়াস। মানুষ যদি ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে নিজের ও পরিবেশের জীবনবৃদ্ধিদ চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম ও প্রয়াসে নিজেকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখে, তার ভিতর-দিয়েই প্রত্যেকের ক্ষুদ্র জীবন ব্রাহ্মী জীবনে রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখর চিন্তাই ব্রহ্মচিন্তা, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখর চলনই ব্রাহ্মী চলন। যার জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরতে-পরতে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতা অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলে সে ইষ্টময় হ'য়ে ওঠে, ব্রহ্মময় হ'য়ে ওঠে। এই ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতার গভীরতা, ব্যাপকতা ও মাত্রার কোন ইতি নেই। যত এগুবে তত দেখবে আরো এগুবার রাস্তা সামনে প'ড়ে র'য়েছে। তাই বলে, ব্রহ্মের ইতি করা যায় না। এই অন্তহীন, অচ্যুত ইষ্টানুসরণ ও ইষ্টানুপূরণের খেলায় নিরন্তর মত্ত থাকার জন্যই মানবজীবন।

রাত হ'য়েছে, কিন্তু এক আনন্দমধুর আবেশে শ্রীশ্রীঠাকুর কথার পর কথা ব'লে চ'লেছেন। এমন সময় কলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত কবিরাজ শ্রীনলিনী সেন-মহাশয় আসলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবার জন্যই কলকাতা থেকে এসেছেন। কাল সকালে ভাল ক'রে দেখবেন এবং শারীরিক অসুখ-অসুবিধার বিষয় শুনবেন। এখন এসেছেন প্রণাম করতে। প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে উপবেশন করলেন। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর কবিরাজ মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে বললেন—দেশে আগের সে উন্নত পরিবেশ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতীতে ভারতের বুকে সে ছিল বিরাট এক cnltural environment (কৃষ্টিমুখর পরিবেশ)। আজ এরা মনে করে কি হনু রে। কিন্তু যা' ছিল, যা' হ'য়েছিল, তার তুলনা নেই। শুনেছি নালন্দায় ছেলেদের পশুপক্ষীর ভাষা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হ'তো। তাহ'লে তাদের জগৎটা কত বড় হ'য়ে যেত চিন্তা ক'রে দেখেন। বিভিন্ন ভাষা জানলে জগৎটা কত বড় হয়। আর, জীবজন্তুর ভাষা জানলে কি বিরাট ব্যাপার হয়। এই একটা ব্যাপার থেকেই তৎকালীন শিক্ষা ও সভ্যতার সমুন্নতি-সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

কবিরাজ-মহাশয়ের সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে কালীদা বললেন—আয়ুর্ব্বেদ ভাল জিনিস, কিন্তু কবিরাজদের গোঁড়ামির জন্য জিনিসটা progressive (প্রগতিশীল) হ'তে পারেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—গোঁড়ামি ভাল, কিন্তু অবান্তর গোঁড়ামি ভাল নয়। Orthodoxy (গোঁড়ামি) ভাল, কিন্তু foolish orthodoxy (বোধহীন গোঁড়ামি) ভাল নয়। Orthodoxy (গোঁড়ামি) লাগে মূল ঠিক রাখতে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'য়ে যায় যদি ক্রমবৃদ্ধিপরতাকে খতম ক'রে দেওয়া যায়। মূল মোটামুটি ঠিক থাকলেও, ঐ মূল বেশী দিন টেকে না। তার জীবনীশক্তি নষ্ট হ'য়ে যায় এবং তা'তে পচন, গলন ও ক্ষয় সুরু হয়। অবরুদ্ধ, বদ্ধ জলাশয়, যেমন দেখা যায়, ধীরে-ধীরে অকেজো হ'য়ে ওঠে ও শুকিয়ে আসে। যা' সময়, প্রয়োজন ও পরিস্থিতির সঙ্গে সত্তাপোষণী ধাঁজে তাল রেখে চলতে পারে না, মানুষের সমাদর ও স্বীকৃতিলাভেও তা' বঞ্চিত হয়।

সাধকদের পারস্পরিক মতদ্বন্দ্ব-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrendered man (আত্মনিবেদনসম্পন্ন মানুষ) হলে, তারা একই কথা কবে। দুইরকম কথা আজও কেউ বলতে পারলো না—কারণ বস্তু এক, তত্ত্ব এক। যে যেভাবে যা' বলুক, ঘুরে-ফিরে substance (সারমর্ম্ম) এক। একেই বলে unity in diversity (বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য)।

এরপর সবাই প্রীত অন্তরে বিদায় নিলেন।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৯।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে উপস্থিত দাদা ও মায়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন, এমন সময়ে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), কবিরাজ নলিনীবাবু প্রভৃতি আসলেন।

আভিজাত্য-সম্বন্ধে কথা উঠল।

কবিরাজ মহাশয় বললেন,—আভিজাত্য-বোধকে আজকাল অনেকে ভাল চোখে দেখে না। তা'কে অগণতান্ত্রিক মনোভাব ব'লে মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—সে-কি কথা ! গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ। আভিজাত্য বোধকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ কী-ভাবে হ'তে পারে তা' বুঝি না। পিতৃপুরুষের কৃতিত্ব, গৌরব, বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যকে নিজেদের জীবনে সজাগ রাখাই প্রকৃত আভিজাত্য। তা'তে মানুষ বড় হবার প্রেরণা পায়। তা'ছাড়া যে নিজের আভিজাত্য-সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ সে অন্যের আভিজাত্যকেও শ্রদ্ধা করতে শেখে। তাতে পারস্পরিক সামাজিক সঙ্গতিও পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ঘৃণা, অহংকার বা বিদ্বেষের কোন স্থান নেই এর মধ্যে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাদার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি অন্যায় ক'রেছেন কবিরাজী না ক'রে। এখনও আপনার ধাঁজ আছে।

দক্ষিণাদা আপসোসের সুরে বললেন—আর যদি সামনের জীবনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওমা! কয় কি শোন। দীপঙ্কর নাকি ষাট বছর বয়সে নতুন ক'রে জীবন সুরু করেছিলেন। তাহ'লে আপনি পারবেন না কেন? মন করলেই হয়। পরমপিতার দয়ায় কা'কে দিয়ে কী হয় তা' কি বলা যায়? .....ফলকথা, আমরা নিজেরাও বঞ্চিত হ'য়েছি এবং জগৎকেও বঞ্চিত করেছি আমাদের কৃষ্টিকে ত্যাগ করে। ইষ্ট ও কৃষ্টিকে অটুটভাবে ধ'রে থাকলে আজ আমাদের এ-দশা হ'তো না এবং আমরা ঠিক থাকলে আমাদের দিয়ে জগৎও অনেক বেশী উপকৃত হ'তো।

এরপর ইংরেজী behaviour (ব্যবহার) শব্দটির তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Behaviour (ব্যবহার) বলতে আমি বুঝি be and have অর্থাৎ হও এবং পাও। পাওয়ার উপযোগী ক'রে নিজেকে হইয়ে না তুললে পাওয়াটা হয় না। সব চাইতে বেশী নজর দিতে হয় চারিত্রিক বিন্যাসের দিকে, তাহ'লে পাওয়াটা সহজ হ'য়ে ওঠে।

প্রফুল্ল—মানুষের ভাগ্য তো তার কর্ম্ম, আচরণ ও চরিত্রেরই ফল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্য এসেছে ভজ্-ধাতু থেকে। তার মানে যার সেবা, অনুরাগ, দান, পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিরক্ষণ ইত্যাদি যেমনতর তার ভাগ্যও তেমনতর। ধর্ম্মকে ধরলে অর্থ, কাম ও মোক্ষ আপনিই আসে।

এরপর কবিরাজ-মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাড়ী ধ'রে দেখলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও প্যারীদার কাছে নানা প্রশ্ন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন উপসর্গ সম্বন্ধে অবগত হলেন।

১৬ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ৩০।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সেনগুপ্ত), কবিরাজ নলিনীবাবু (সেন) প্রভৃতি কাছে আছেন।

আর্য্যকৃষ্টি-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের এ মালের তুলনা নেই। দুনিয়ায় এমন কিছু নেই যার উত্তর এতে নেই। ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে সমষ্টির কথা ভাবা যায় না, আবার সমষ্টির মধ্যে ছাড়া ব্যষ্টির অস্তিত্ব অসম্ভব। চাই ব্যষ্টি ও সমষ্টির cordial co-operation (হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতা)। আর, তা' হ'তে গেলেই দরকার Ideal (আদর্শ)। Ideal-এর (আদর্শের) প্রতি attachment (অনুরাগ)-ই হ'ল unifying force (একত্ব-সন্দীপী শক্তি) যা' ব্যষ্টিগুলিকে একমুখী ক'রে তোলে। তাই আর্য্যকৃষ্টির মূলকথা হ'ল concor-

dance of Ideal, individual and environment (আদর্শ, ব্যষ্টি ও পরিবেশের সঙ্গীত)। আবার, অতীতের ঐতিহ্য বাদ দিয়ে বর্ত্তমান দাঁড়াতে পারে না এবং ভবিষ্যৎও গ'ড়ে উঠতে পারে না। তাই পিতৃপুরুষের সাত্বত ধারাকে কখনও ত্যাগ করতে নেই। তার উপর দাঁড়িয়ে বাঁচা-বাড়ার উপযোগী ক'রে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন চলতে পারে। তাতে ঠকতে হয় না, ঠেকতে হয় না। আর প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সর্বদিক দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে হয়। মানুষের ভিতরটাকে সুগঠিত করতে গেলে সৎ দীক্ষা ও সাধনশীলতা একান্ত প্রয়োজন। আমি বলি—উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন, চলা-ফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টনির্দ্দেশ মূর্ত্ত করাই তপ। এই সামান্য জিনিসটুকুর অভ্যাস থাকলে অনন্ত আশীর্ব্বাদের অধিকারী হওয়া যায়। ভিতরের যোগান ঠিক থাকলে বাইরের চলাটা আপনা থেকেই সাবলীল হ'য়ে ওঠে। আর উৎসাহ, উদ্দীপনা, আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির জোয়ার আসে নামপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে, ধ্যানশীলতার ভিতর-দিয়ে, গুরুমুখীনতার ভিতর-দিয়ে। ওতে মন চাঙ্গা থাকে, বুক ভরা থাকে। কাজের মধ্যে একটা নেশার আমেজ লেগেই থাকে। কাজকর্ম্মে, চলা-বলায় ভুল কম হয়। কবিরাজ মহাশয় যেমন মানুষকে ওষুধ দেন নামও তেমনি আমার দেওয়া ওষুধ। যে যতটা নিষ্ঠা সহকারে করবে সে ততখানি ফল পাবে। এ আমার ক'রে দেখা জিনিস। এর ফল নির্ঘাত। গুরুর প্রতি টান নিয়ে যেই-ই ঠিকমতো নামধ্যান করবে তারই ভিতরের ঘুমন্ত গুণগুলি গজিয়ে উঠবে। নাম-ধ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে চাই এন্তার কাজ। নইলে মানুষ নিথর হ'য়ে পড়ে। যার Sensory nerve (বোধস্নায়ু) ও Motor nerve (কর্ম্মীস্নায়ু) সমানভাবে active (সক্রিয়), তার personality (ব্যক্তিত্ব) এক বিশেষ জেল্লা নিয়ে জেগে ওঠে। মানুষের মধ্যে তার influence (প্রভাব) ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। তবে সবটার মূলে চাই শ্রেয়নিষ্ঠা।

নলিনীবাবু—যদি কেউ অন্যত্র দীক্ষিত থাকে তাহ'লে সে কি সদ্‌গুরুর দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন্ত সদ্‌গুরু গ্রহণে কারও পক্ষে কোনও বাধা নেই। যে-যা করছে সেই করাটাই সার্থক ও তীব্রগতি-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে সদ্‌গুরু-প্রদত্ত নির্দ্দেশের অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে। সৎ-নাম সর্ব্ববীজাত্মক। এতে কোন নাম বাদ পড়ে না। যা' থেকে সব নাম, সব মন্ত্র, সব শব্দ, সব সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছে তাই হ'ল সৎনাম। সৎনাম সার্ব্বজনীন। এটা কোন সংস্কার-প্রসূত জিনিস নয়। মূলতঃ যে তত্ত্ব অর্থাৎ তাহাত্ব সর্ব্বত্র নানাভাবে ক্রিয়াশীল ও প্রকাশশীল, সৎনাম তারই দ্যোতক। তাই বলে শব্দব্রহ্ম। পৃথিবীর সব মানুষের পক্ষে এটা এক। তবে এক-এক স্তরের অনুভূতি এক-এক রকমের। একাগ্রতা ও স্নায়ুর সূক্ষ্ম সাড়াশীলতা যার যেমনতর সে তেমনতরই বোধ করতে পারে। সম-একাগ্রতা ও সূক্ষ্ম-সাড়াশীলতা-সম্পন্ন একজন ভারতবাসী ও একজন ইউরোপীয়ের শব্দানুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না—তা'

তারা যে-কোন সম্প্রদায়েরই লোক হোক না কেন। এক কথায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান জড়-বিজ্ঞানেরই মতো সর্ব্বত্র সমভাবে ক্রিয়াশীল। আমি বুঝি সদ্‌গুরু ও সৎ-মন্ত্র সকলেরই গ্রহণীয়। তা'তে কিছুই ছাড়া হয় না। যে স্তরে আছি সেখান থেকে আরও উপরে ওঠার শক্তি ও প্রেরণা সংগ্রহ করা হয়।

লোকের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অভাব মানে না-হওয়া। আমরা যা' হই না, আমরা তা' পাই না। হওয়াটার চেষ্টা কর, পাওয়াটা আপনি-আপনি আসবে। তেমন হও যা'তে পাওয়া ঘটে। হ'তে গেলে আবার করতে হয়। করাটা আবোল-তাবোল হ'লে হবে না। করাটা হওয়া চাই বিধিমাফিক। অভাব অপনোদনের জন্য যা'-যা', যেমন-যেমন ক'রে করা লাগে তা'-তা' তেমন-তেমন ক'রে করতে হবে। ধর্ম্মটা শুধু ভাবা আর কওয়ার ব্যাপার নয়। করা, আচার, আচরণ এর প্রাণ। যাতে পরিবেশ-সহ নিজের বাঁচা-বাড়া বজায় থাকে একযোগে তেমনতরভাবে ভাবা, বলা ও করায় ব্যাপৃত থাকলে তাতেই হয় 'ধর্ম্ম'। আর, সে ধর্ম্ম থেকে অর্থ, কাম, মোক্ষ আপনিই আসে। সেগুলি চাকরের মতো সেবা করে। তাদের জন্য লালায়িত হ'তে হয় না। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ দেখাতে পারবে না যে ধর্ম্ম পালন ক'রে মঙ্গলের অধিকারী না হয়েছে। তবে শুধু একলা-একলা ধর্ম্ম করা যায় না। পরিবেশকেও ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তুলতে হয়। নইলে নিজের ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচা-বাড়াও অক্ষুন্ন থাকে না। দেশে যদি প্রকৃত ধর্ম্ম জাগে তাহ'লে অভাব-অভিযোগ পালাবার পথ পাবে না। তবে মুখে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে যদি কাজে অধর্ম্ম করি অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার উল্টো চলনে চলি তাহ'লে কিন্তু আমাদের সেই ধর্ম্মবুলি ভগবানকে ভোলাতে পারবে না। আমাদের প্রাপ্য দুঃখ, দুর্ভোগ ও অভাব আমাদের ভুগতেই হবে। কর্ম্মফল অনিবার্য্য, বিধি অমোঘ—এ-কথা আমাদের স্মরণ রেখে চলা ভাল।

প্রফুল্ল—হিন্দুরা তো বিশেষভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তবু তারা কেন ক্রমাগত মার খাচ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তো বলছ হিন্দুরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, কিন্তু এই বাংলার বুকে সেদিনও এসে গেলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁকে ক'টা লোক মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে এবং জীবনের পথে অনুসরণ ক'রে চলেছে বলতে পার? ঈশ্বরকে মানি অথচ তাঁর বার্ত্তাবহকে মানি না, ধরি না, অনুসরণ করি না তা' কি কখনও হয়? আর আমরা যেভাবে তাঁদের ধরি, তার মধ্যেও অনেক গোল আছে। নিজেদের কতকগুলি খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য পরমপুরুষকে ধরলে তা'তে আমাদের জীবন বদলায় না, চরিত্র বদলায় না। তার ফল যা' হ'তে পারে তাতো হচ্ছেই। অবতার মহাপুরুষকে ধরা লাগে তাঁর মনোমতো ক'রে নিজেদের গ'ড়ে তোলবার জন্য, নিজেদের ইচ্ছা অগ্রাহ্য ক'রে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য। তাতেই সাধারণ মানুষ অসাধারণ হ'য়ে

ওঠে। তাদের দিয়ে অনেকের কল্যাণ হয়। জাতি শক্তিশালী হয়, সংঘবন্ধ হয়। সংকীর্ণ স্বার্থপরতারূপ মহাব্যাধির নিরাকরণ হ'য়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রবল হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের হয়। আর এইগুলি হ'ল ঈশ্বর-বিশ্বাসের লক্ষণ। এগুলি দানা বেঁধে উঠতে পারে না যদি ঈশ্বরের নরবিগ্রহকে অস্বীকার করা হয়। তথাকথিত ঈশ্বর-বিশ্বাস sterile (বন্ধ্যা)। প্রকৃত বিশ্বাস যেখানে থাকে সেখানে থাকে প্রশ্নশূন্যতা, দ্বিধাহীনতা, বলিষ্ঠ চলন। কেউ যদি প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়, ঈশ্বরকেই জগতের স্রষ্টা ব'লে মনে করে তাহ'লে সে কি কখনও পরিবেশের প্রতি নির্দ্দয় হ'তে পারে? উদাসীন হ'তে পারে? কারণ, ঈশ্বর যদি আমার ও জগতের স্রষ্টা হন, তিনি যদি জগৎপিতা হন তাহ'লে প্রত্যেকটি মানুষ এমনকি প্রত্যেকটি জীবই তো আমার পরম আপনজন। তাদের কারও ক্ষতি করা মানে তো পিতার ক্ষতি করা, পিতার মনে আঘাত দেওয়া। মানুষ তখন অকল্যাণকর চলন থেকে বিরত হ'য়ে কল্যাণকর চলনে না চলেই পারে না। তাই একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমাদের আচরণ এটা ঘোষণা করে না যে আমরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী। সুতরাং আমরা যা' পাচ্ছি তা' আমাদের প্রাপ্য—এইটে বুঝে নিয়ে আমাদের চলনা সংশোধন ক'রে চলতে হবে। পরমপিতা বুলিতে ভোলেন না। তিনি কাজ দেখেন।......আমি বুঝি বিশ্বাসী মানুষ মানে A man of solved problem (সমস্যার সমাধান হয়েছে এমন একজন মানুষ)। অর্থাৎ ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের ঈশ্বরের অমোঘ ও অভ্রান্ত বিধান-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকে না। তার প্রশ্ন থাকে প্রধানতঃ নিজের চলন সম্বন্ধে। এবং সেই চলনকে সে-বিধি-অনুগ ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল হয়। শুধু নিজের চলনকে সে-বিধি-অনুগ ক'রে সে ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু অপরকেও সে বিধির অনুসরণে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। একেই বলে ধর্ম্মীয় চলন, বিশ্বাসী চলন। এর ভিতর-দিয়েই সমাজ ও জাতির অভ্যুদয় অবধারিত হয়।

হরিপদদা (সেনগুপ্ত)—অনেকের জলপড়া, তেলপড়া ইত্যাদির উপর বিশ্বাস থাকে এবং দেখা যায় তা' ব্যবহার করেই তারা রোগ থেকে মুক্তিলাভ করে। এই আরোগ্যের কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে জলপড়া বা তেলপড়া করা হয়, তার মধ্যে হয়তো এমন কিছু থাকে যাতে রোগ নিরাময় হ'তে পারে। তাই এটা হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। বিশ্বাস মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। আরোগ্যলাভ করবার ইচ্ছাশক্তি যখন মানুষের বলবতী হ'য়ে ওঠে তখন তার চিন্তা ও চলনাও এমনতর হয় যাতে রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যলাভ ত্বরান্বিত হয়। সব জিনিসেরই একটা রকম আছে। যেটা যে-রকমে ফলপ্রসূ হয় সেটা তেমন বিহিত রকমেই করতে হয়। অবিধিপূর্ব্বক করা বিহিত ফল প্রসব করে না। অপাত্রে ভক্তি ন্যস্ত করতে গেলে পাত্রই প্রতিবন্ধক হয়। পাত্রের মধ্যে সেই বস্তু থাকা চাই যাতে ভক্তি সার্থক হ'তে পারে। ভক্তি থাকলে কবিরাজ-মহাশয়ের দেওয়া একফোঁটা জলে তোমার মধ্যে

বৈদ্যনাথ অর্থাৎ জানার নাথ বা আরোগ্যশক্তির নাথ জেগে উঠবেন। তার মানে এর মধ্যে কবিরাজ-মহাশয়ের ক্ষমতা এবং তাঁর প্রতি তোমার ভক্তির ক্ষমতা যৌথভাবে কাজ করবে। ভক্তি করার মতো মানুষ চাই এবং তাঁর উপর ভক্তি ও বিশ্বাস চাই। এই শুভ সংযোগের ভিতর-দিয়েই ভক্তি ও বিশ্বাসের অমোঘ শক্তি উপলব্ধি করা যায়।

হরিপদদা—রামকৃষ্ণদেব বহু গুরু করেছিলেন। বহু গুরু করলে নিষ্ঠার পক্ষে কি ব্যাঘাত হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণদেব বহুকে বহু হিসাবে দেখেননি। তিনি এইটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সব গুরু, সব মত ও সব পথ মূলতঃ এক। বাইরে শুধু রকমফের। বহু যেখানে একে সার্থকতা লাভ করে সেখানে বহু আর বহু থাকে না। তাই রামকৃষ্ণদেবের নিষ্ঠা ব্যাহত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শাস্ত্রে বলে 'সর্ব্বদেবময়োঃ গুরুঃ'। অর্থাৎ গুরুর মধ্যেই সমস্ত দেবতার সন্নিবেশ থাকে। একই যে বহু হয়েছেন। তাই সর্ব্বময় এক যিনি, তাঁর শরণাপন্ন হ'তে হয়। তিনি বলেন 'I am come to fulfil and not to destroy' (আমি ধ্বংস করতে আসিনি, পরিপূরণ করতে এসেছি)। এই পূরয়মাণ যুগপুরুষকে ধরলে পূর্ব্বতন সবাইকেই ধরা হয়। বর্ত্তমান পূরয়মাণ পুরুষকে অস্বীকার ক'রে যাই আমরা করতে যাই, আমার মনে হয়, তা' বেদ বিগর্হিত ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ, তার মধ্যে থাকে highest knowledge and highest fulfilment (সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান ও সর্ব্বোচ্চ পরিপূরণ)। তাঁকে যখনই আমরা বাদ দিই তখনই আমরা human perfection-এর (মানবীয় পরিপূর্ণতার) latest and best manifestation-এর (অধুনাতন ও সর্ব্বোত্তম বিকাশের) impulse (প্রেরণা) থেকে বঞ্চিত হই। এতে আমাদের evolution (বিবর্ত্তন) hampered (ব্যাহত) হয়। আমরা back-dated (সেকেলে) হ'য়ে পড়ি। আমাদের progressiveness (প্রগতিশীলতা) blocked (রুদ্ধ) হয়।

হরিপদদা—কুলগুরু অর্থাৎ বংশগত গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার প্রথা তো হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এর কি তাহ'লে কোন সার্থকতা নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অকর্ষিত ক্ষেত্র যা'তে না থাকে, সদ্‌গুরুর অবর্ত্তমানেও মক্সটা যা'তে বজায় থাকে, তার জন্যই কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি চালু আছে। দীক্ষা-গ্রহণ একটা অবশ্য করণীয় ব্যাপার। সদ্‌গুরু যখন জগতে না থাকেন তখন পূর্ব্বতন সদ্‌গুরু-প্রদর্শিত পথে সাধনরত থাকবে এই-ই কাম্য। তাঁর আবার যখন আগমন হবে, তখন মানুষ তাঁকে গ্রহণ ক'রে তাঁকে ধ'রে চলবে এই-ই বিধি। আগে যাঁরা কুলগুরু ছিলেন তাঁরা তাই উপদেশ দিতেন—সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলে তাঁকে গ্রহণ করবে। সদ্‌গুরুর জীবদ্দশায় তাঁর আদেশ ও নির্দ্দেশমতো চলার ভিতর-দিয়ে মানুষের যে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয়, লাখ সাধন-ভজনেও তা' হবার নয়। সদ্‌গুরুর হাতে না পড়লে এবং প্রবৃত্তিভেদী টান নিয়ে তাঁকে অনুসরণ না করলে মানুষ নিজ সংস্কার ও মনের ঘানিতে ঘোরা থেকে নিস্তার পায় না। মনে ভাবে

খুব ধর্ম্ম করছি, কিন্তু আদতে মনের আড় ভাঙ্গে না। শাস্ত্রে তাই বলে যত পুজোই কর, গুরুপুজো না হ'লে হবে না। সত্যিই তারা মহাভাগ্যবান যারা জীবন্ত সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে এবং নিবিড় নিষ্ঠা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে। ধর্ম্মরাজ্যের চাবিকাঠি ওইখানে।

একটি দাদা নাকের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে নাক চুলকালেন। পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাও হাতটা ধুয়ে এস। সদাচারের নিয়মগুলি ভালভাবে পালন না করলে নানারকম infection (সংক্রমণ) হ'তে পারে। তাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আর, তুমি ছেলে-মেয়ের বাপ, মুরুব্বী মানুষ, তুমি যদি সদাচার ও শুচিতা বজায় রেখে না চল, তবে তোমার দেখাদেখি আরও অনেকে bad habit (খারাপ অভ্যাস) acquire (অর্জ্জন) করবে। তাই তোমাদের খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে চলা লাগে। চালচলন এমন করা লাগে যা'তে তার সঞ্চারণায় মানুষের ভাল বই খারাপ না হ'তে পারে।

দাদাটি কুয়োর পাড়ে গিয়ে হাত ধুয়ে আসলেন এবং পরে বললেন—ছেলেবেলা থেকে এত বদঅভ্যাস রপ্ত হ'য়ে আছে যে এখন সবসময় টের পাই না যে সে-গুলি বদঅভ্যাস। আপনার দয়ায় ধীরে-ধীরে চোখ খুলছে, চেতনা জাগছে। তবে আপনার সান্নিধ্যে দীর্ঘ দিন থাকতে পারতাম তাহ'লে দোষগুলি সংশোধন করার পক্ষে সুবিধে হতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের ভুলগুলি নিজে ধরতে শেখাই ভাল। নাম-ধ্যান, আত্মবিচার, আত্মবিশ্লেষণ যত করবে ততই সব নিজের কাছে ধরা পড়বে। আর, যাদের অভ্যাস-ব্যবহার ও চরিত্র সুগঠিত, তাদের সঙ্গ করা লাগে। ওতে খুব লাভ হয়। সাধুসঙ্গের প্রশংসা সর্ব্বশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। সাধু বলতে আমি বুঝি সুকেন্দ্রিক ও কৃতকর্ম্মা লোক। যারা জীবনে সব দিক দিয়ে successful (কৃতকার্য্য) হয় তাদের ভিতরে বিশেষ কতকগুলি গুণ থাকে। Allround success (সর্ব্বতোমুখী কৃতকার্য্যতা) তাই ধর্ম্মের একটা বড় নিশানা। বহু মানুষ একদিক সামলাতে যেয়ে আর একদিক বেতাল ক'রে ফেলে। তার মানে ভিতরে balance-এর (সমতার) অভাব। Unbalanced one-sided success (সমতাহীন এক-দেশদর্শী কৃতকার্য্যতা) কিন্তু আমাদের কাম্য নয়। আমাদের যা' কাম্য তা' পেতে গেলে জীবনকে ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে যা'-কিছু করণীয় করতে হবে।

প্রফুল্ল—কেউ সদ্‌গুরু কিনা তা' কী ক'রে বোঝা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম কথা হ'লো তিনি তাঁর গুরুতে সর্ব্বতোভাবে সংন্যস্ত হবেনই। তাঁর করা, বলা, ভাবার মধ্যে ফারাক থাকবে না। পূর্ব্বতনদের প্রতি তাঁর প্রণতি থাকবেই কি থাকবে। আর তিনি প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ক'রে চলবেন। তিনি অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে মানুষকে সহজ পথে এমনভাবে পরিচালনা করবেন যা'তে তা'দের চারিত্রিক বিকাশ ঘটে। মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী ক'রে তোলার দিকেই তাঁর ঝোঁক থাকবে সব থেকে বেশী। আরও বহু কিছু আছে। তবে

এ-গুলি সদ্‌গুরুর fundamental and universal traits (মৌলিক এবং সার্ব্বজনীন চারিত্রিক লক্ষণ)।

প্যারীদা—কারও ভিতরে ঐ সব লক্ষণ আছে কিনা তা' বাইরে থেকে বোঝা তো দায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নজর করলেই বোঝা যায়। সদ্‌গুরুর অহংটা অত্যন্ত পাতলা। অপরকে সওয়া-বওয়ার শক্তি থাকে তাঁর অসীম। নিজের গুণগান করার অভ্যাস তাঁর খুবই কম থাকে। অপরকে বড় করাই তাঁর সুখ। আত্ম-প্রতিষ্ঠার বালাই তাঁর থাকে না। আদর্শ-প্রতিষ্ঠাই তাঁর একমাত্র ধান্ধা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সুললিত কণ্ঠে গানের সুরে বললেন—তাঁর আছে অনেক নিশানা—নয়নে তাঁর যায় যে চেনা। তাঁর character (চরিত্র) হয় abnormally normal (অসাধারণভাবে সহজ)। তাঁরা যেন প্রকৃতির শিশু। তাঁদের মধুর ব্যক্তিত্ব মানুষকে স্বতঃই মোহিত করে।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন। তাঁর মন যেন তখন কোন্ এক গভীর রহস্যের অতলতলে নিমজ্জিত। তিনি যেন চ'লে গেছেন কোন্ সুদূরে—সকলের ধরাছোঁয়া ও নাগালের বাইরে।

পরে ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে বললেন—রামকৃষ্ণদেব চ'লে যাননি, তাঁর যুগই চলছে। তাঁর ধারাই চলছে। তাঁর আহ্বান এখনও ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা মূর্খ ও অজ্ঞ। তাই বুঝতে পারি না। পরমপিতার কাজ কোনদিন বন্ধ হয়নি, হবেও না। এখন চাই বিশাল সঞ্চারণা। সাধারণ মানুষ সহজেই পরমপিতার কথা ভুলে যায়। তারা যাতে বিস্মৃতির কবলে না পড়ে সে ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহাপুরুষদের কথা, আর্য্যকৃষ্টির কথা, রাষ্ট্র কী, ধর্ম্ম কী, কিভাবে সর্ব্বশ্রেণীর লোককে উন্নত ও উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, শিক্ষা কিভাবে দিতে হবে, বিবাহের নীতি কী, দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে চলতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে রোজ পরিবেশন করা লাগে। যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা, নাটক, নভেল, রেডিও ইত্যাদি সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে সবার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের বার্ত্তা সঞ্চারিত করতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে চাই ইষ্টনিষ্ঠ চরিত্রবান ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজকদের মানুষের বাড়ী-বাড়ী ঘোরা। কাউকে পিছে পড়ে থাকতে দেওয়া হবে না। অজ্ঞ থাকতে দেওয়া হবে না। দরিদ্র থাকতে দেওয়া হবে না। সকলকে টেনে লম্বা ক'রে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরিবেশ যদি দুঃস্থ থাকে তাহলে সেজন্য তারা যতটা অপরাধী তার চাইতে বেশী অপরাধী আমরা। আমরা যদি বাঁচতে চাই, তবে সকলের বাঁচার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। পাশ্চাত্য দেশকে blindly (অন্ধভাবে) follow (অনুসরণ) ক'রে লাভ নেই। কারও লাভ নেই তাতে। আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চললে নিজেরাও যেমন লাভবান হব অন্যেরাও তেমনি লাভবান হবে। বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলনে আমাদের যা' হবার তা'

আমরা হ'তে পারব এবং তখন অন্যের আমাদের কাছ থেকে যা' পাবার তাও তারা পেতে পারবে। ধরুন, প্রত্যেকেই যদি ইষ্টকৃষ্টিকে অবলম্বন ক'রে নিত্য বাস্তবে পঞ্চযজ্ঞ করে তাহ'লে কি বিরাট কাণ্ড হয়। এই পঞ্চযজ্ঞের কথা স্মরণ করেই আমি ইষ্টভৃতির সঙ্গে তার অঙ্গ হিসেবে ভ্রাতৃভোজ্য ও পরিবেশকে সাহায্য দানের বিধান আবশ্যিকভাবে জুড়ে দিয়েছি। রোজ প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের জন্য ভাবে, প্রত্যেকের জন্য করে, প্রীতিপূর্ণ পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সেবা-বিনিময় যদি সহজে উৎসারিত হ'য়ে চলে তাহ'লে কেউ কি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারে? সকলের বুকে কতখানি বল হয়। তখন সকলে মিলে যেন একটা মানুষ। একেই তো বলে সংহতি। আর সংহতিই তো শক্তির উৎস। ইষ্টভৃতির গুণের কথা ব'লে শেষ করা যায় না। আমি একে বলি সামর্থীযোগ। এতে মানুষ যোগ্য হ'য়ে ওঠে। নিয়মিতভাবে ascetic way-তে (তাপসভাবে) ইষ্টভৃতি করলে বোধ করতে পারবেন বিপদ-আপদ কাটাবার ক্ষমতা কতখানি বেড়ে যাচ্ছে। দুনিয়া টলমল করতে থাকলেও আপনি অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন। শক্তির জাগরণ নিজ অন্তরেই বোধ করতে পারবেন। বার্ম্মার যুদ্ধের সময়, নোয়াখালি ও কোলকাতার দাঙ্গার সময় ভুরি-ভুরি দৃষ্টান্ত দেখা গেছে—যারা নিষ্ঠার সঙ্গে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি করে তারা পরমপিতার দয়ায় কিভাবে সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। অবশ্য আত্মস্বার্থের লোভে কিছু করতে নেই। পরমপিতাকে ভালবেসে তাঁর পথে চললে পরমপিতা তাদের হাত ধ'রে চালিয়ে নিয়ে মঙ্গলের কোলে সমাসীন করেন।

হরিপদদা—নাম নেওয়ার পর অনেকের তো দুর্ভোগ বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে মজুত অপকর্ম্মের ফল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। সে যদি নিষ্ঠাসহকারে করণীয় ক'রে চলে, তবে স্বস্তির অধিকারী হবেই।

প্রফুল্ল—একজন হয়তো খুবই সৎলোক, সে যদি দুর্ভোগ ভোগে তাহ'লে কি বুঝতে হবে যে সে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে কষ্ট পাচ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে পূর্ব্বের কর্ম্মফলও যেমন থাকে, বর্ত্তমানের কর্ম্মফলও তেমনি থাকে। সৎলোক মানে সেই লোক যে বাঁচা-বাড়ার নীতি-পদ্ধতি ও নিয়ম ভালভাবে জানে ও মেনে চলে। শুধু জানলে হবে না, মেনে চলা চাই। একজন হয়তো otherwise (অন্যথা) খুব ভাল মানুষ, কিন্তু সে হয়তো সদাচারের বিধি ভাল ক'রে জানে না বা মেনে চলে না, তাতে সে কিন্তু ব্যাধির কবল থেকে রেহাই পাবে না। Ignorance is sin (অজ্ঞতা পাপ)' সদাচারের কথা বলছিলাম—এই সদাচার কিন্তু তিন রকম—আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক। একজন হয়তো শারীরিক সদাচার পালন করে কিন্তু মানসিক সদাচার পালন করে না, তাহ'লে সেও কিন্তু রোগের থেকে রেহাই পাবে না। সে যদি অযথা হতাশা ও অবসাদ-জনক চিন্তায় গা ঢেলে দেয় তাতেও তার স্নায়ু দুর্ব্বল হবে। এবং ধীরে-ধীরে রোগের সৃষ্টি হবে। আবার, শারীরিক ও মানসিক সদাচার পালন করা সত্ত্বেও যদি কারও আধ্যাত্মিক সদাচার পালনে ত্রুটি থাকে

তাহ'লে তার ফলও তাকে পেতে হবে। আধ্যাত্মিক সদাচার বলতে আমি বুঝি সতত সক্রিয় গতিশীল একনিষ্ঠ ইষ্টানুরাগ। ওতে খাঁকতি থাকলে মানুষ প্রবৃত্তির হাতে প'ড়ে যায়। প্রবৃত্তি-চলন সত্তাকে নানাভাবে ক্ষুন্ন করে। ফলকথা, সদাচার মানে বিদ্যমান-তার আচার, থাকা ও বাঁচা-বাড়ার আচার। সৎ-পরিপোষণী আচার করব না অথচ আমি ভাল থাকব—তা হয় না। তাই সৎলোক হওয়া মানে অনেকখানি। জীবনের যে-ক্ষেত্রে বাঁচা-বাড়ার চিন্তা, চলন ও বাক্য থেকে আমরা যতখানি ভ্রষ্ট হই সে-ক্ষেত্রে আমাদের সৎ-ত্ব ততখানি ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং আমাদের জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল যা' থাক বা না থাক আমরা যদি আমাদের বর্ত্তমান চলনকে নিখুঁত করার চেষ্টা করি তাতে অতীতের কর্ম্মফলও অনেকখানি শুভে বিন্যস্ত হ'তে পারে। অদৃষ্টবাদী হ'য়ে লাভ নেই। বরং অজ্ঞতার সব গুপ্তরন্ধ্র দৃষ্টির মধ্যে আন এবং জ্ঞানের আলোকে চল, ইষ্টানুরাগের আলোকে চল, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধান্ধায় চল। তাতে অনেক-কিছু ঠিক হ'য়ে যাবে।

ব্যবসা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যবসা মানে মানুষকে দুঃখ, কষ্ট ও বিনাশের হাত থেকে বাঁচান। ব্যবসা হবে on service basis (সেবার ভিত্তিতে)। তা' যার না হয়, সে গুঁতো খায়। কারণ সে ঠকদার হ'য়ে পড়ে। যতই আমরা মানুষকে ঠকাতে চাই ততই মানুষ আমাদের প্রতিকূল হ'য়ে ওঠে। জীবনের সাধারণ দাবী হ'ল এই যে যখন তুমি অপরের কাছ থেকে নেবে তখনই তাকে উদ্বর্দ্ধিত ক'রে নেবে। আনন্দিত ক'রে নেবে। সে দিক-দিয়ে প্রত্যেকটা মানুষই আমাদের স্বার্থ। অপরের সুখ-সুবিধা ক'রে দিতে থাকলে প্রকৃতিই তার সুখ-সুবিধা ক'রে দেয়। মানুষের বিধানের উপরেও আর-একটা বড় বিধান আছে। সে হ'ল প্রকৃতির বিধান।

নলিনীবাবু—পরিবেশ যদি ভাল না হয় তাহ'লে একক ভাল হ'য়ে চলা খুব কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা খুব ঠিক। তবে আমার মনে হয় কি জানেন? আমি যা' দেখেছি প্রত্যেকেই ভাল হ'তে চায়, ভাল পেতে চায়। কিন্তু জন্ম, দীক্ষা, শিক্ষা শুভ না হ'লে, বিহিত না হ'লে মানুষের অভ্যাস-ব্যবহার ও বুদ্ধি বিকৃতির দিকে বাঁক নেয়। মানুষকে উন্নত করতে গেলে দেশের বিবাহ-বিধান ঠিক করা লাগবে। বিবাহে গোলমাল হ'লে ভাল মানুষ জন্মাতে পারে না। জন্মগত শুভ-সম্পদ না থাকলে বাইরের শত চেষ্টাতেও কিছু ক'রে ওঠা যায় না। দেশের মধ্যে চাই শ্রদ্ধার culture (অনুশীলন)। যেখানে পরিণয় বিধিসিদ্ধ, স্বামী আদর্শ-নিষ্ঠ ও স্ত্রী স্বামী-ভক্তিপরায়ণা, সেখানে সন্তান শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হবেই। ওই শ্রদ্ধাই হলো মূল চীজ যা' মানুষকে বড় ক'রে তোলে। আবার, শুধু মাতৃভক্তি বা পিতৃভক্তিতেই শ্রদ্ধা-ভক্তি চরম সার্থকতা লাভ করে না। তার জন্য চাই যুগ-পুরুষোত্তমের শরণাপন্ন হওয়া। আমরা যার প্রতি যে শ্রদ্ধাই পোষণ করি না কেন, তা' হওয়া চাই ইষ্টানুগ। নইলে তথাকথিত শ্রদ্ধাই অনেক সময় উন্নতির অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। অভ্রান্ত হ'লেন ইষ্ট স্বয়ং।

অপরের ভ্রান্তি থাকতে পারে। তাই unconditionally (নিঃসর্ত্তভাবে) follow (অনুসরণ) করা লাগে একমাত্র তাঁকে। আর, ইষ্টানুরাগ ও ইষ্টানুসরণ অক্ষুণ্ণ রেখে প্রত্যেককে যথাযোগ্যভাবে শ্রদ্ধা ও মান্য করতে হয়। কেউ যদি অটুটভাবে ইষ্টনিষ্ঠ হয় তবে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সে ভাল হ'য়ে উঠতে পারে। আবার তার প্রভাবে আরো অনেকে ভাল হয়।

প্রফুল্ল—আমার কোন গুরুজন যদি চান যে তাঁর কথা আমি প্রতি ব্যাপারে পুরোপুরি অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলি এবং তা' করতে গিয়ে আমি যদি দেখি যে ইষ্টের নীতি ব্যাহত হচ্ছে, সেখানে আমার কি করণীয়? তাঁকে যদি ভালভাবে বলতে যাই তাহ'লেও তো তিনি চটে যাবেন। মনে ব্যথা পাবেন। একটা অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি হবে। কী করলে ইষ্টানুসরণ ও গুরুজনের সঙ্গে সম্প্রীতি দুই-ই অক্ষুণ্ণ থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তাঁর সঙ্গে এমন বিনীত ব্যবহার করবে যা'তে তিনি খুশি হন। তবে সঙ্গে-সঙ্গে বলবে আপনার উদ্দেশ্য আরও ভাল ক'রে সিদ্ধ হ'তে পারে এই-এই ভাবে। ধর, তিনি তোমাকে বললেন একটা লোকের উপর প্রতিশোধ নিতে, তাকে জব্দ করতে। তুমি হয়তো বললে আমি তার সঙ্গে আপনার কথা এমন ক'রে বলব যা'তে সে আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ওতে আপনার জয় তো হবেই এবং তারও হারের ভিতর-দিয়ে জিত হবে। আপনিও তাকে আপন ক'রে পাবেন, সেও আপনাকে আপন ক'রে পাবে। এইভাবে ক্ষেত্র বুঝে বলতে হয়। প্রত্যেকের মধ্যেই শুভ বুদ্ধি আছে। চাই সুকৌশলে তাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। তুমি যদি ইষ্টের সাথে যুক্ত থাক, তাহ'লে—তিনিই তোমার মাথায় বুদ্ধি যুগিয়ে দেবেন—কেমন ক'রে তুমি অপরের অহংকে আহত না ক'রে তাকে শুভের পথে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে নটের মতো চলতে হয়। যেখানে যখন যার সঙ্গে যে কথা, যে ব্যবহার, যে চাল লাগসই হয় সেখানে তাই প্রয়োগ করতে হয়। It is just like a sport (এটা ঠিক একটা খেলার মতো)। এ খেলায় মজা আছে। ইষ্টানুরাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ যার যত পাকা হয়, নিজেকে যে যত শাসনে রাখে সে এই খেলায় তত জয়ী হয়। Inferiority (হীনম্মন্যতা) থাকলে মানুষ অযথা stiff (অনমনীয়) হয়, তখন সে নিজেকেই ঠিকভাবে চালনা করতে পারে না, তাই অপরকেও লওয়াতে পারে না।

১৭ই মাঘ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ৩০।১।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে বসে আছেন। গতকাল সন্ধ্যায় মহাত্মাজীর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া অবধি তাঁর মন খুব বিমর্ষ। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদা, তাঁর মা প্রভৃতি আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গেও ঐ বিষয়ে কথা বলছেন। বারবার বলছেন—কি যে কাণ্ড ঘটল! দল-নির্বিশেষে সকলে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা

করে এমন দ্বিতীয় মানুষ আজ আর কাউকে দেখি না। ভিন্ন মতাবলম্বী লোকরাও মহাত্মাজীকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতো। তাই দেশে কোন বিশৃংখলা উপস্থিত হ'লে তিনি যেমন ক'রে ঠেকাতে পারতেন, এখন কে তা' পারবে? পরমপিতার কি ইচ্ছা জানি না। একে দেশ-বিভাগ হ'য়ে গেল, তারপরে এই দুর্দৈব। তবে ভরসা এই যে পরিস্থিতির প্রয়োজনে উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। তা' হয়তো হ'তেও পারে। কিন্তু যে ক্ষতি হ'য়ে গেল তার কোন তুলনা নেই।

কিছু সময় পরে সুশীলদা (বসু) এবং দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) প্রভৃতি আসলেন।

মানুষের ব্যবহারের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রাণদ ও প্রীতিপ্রদ ব্যবহারের মূলে থাকে মানুষের চরিত্র। যারা সৎ ও বিনয়ী তাদের সব সময় লক্ষ্য থাকে কিভাবে তারা অপরকে সৎভাবে সুখী ও সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে। এই আকুতিই তাদের ব্যবহারের মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতা সঞ্চারিত করে। এবং তা' মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেই। তাদের মধ্যে ভদ্রতার বাড়াবাড়ি বা সৌজন্যের অহংকার থাকে না। অপরের সান্নিধ্যে তারা নিজেরাও সুখী হয়, এবং অপরকেও সুখী ক'রে তোলে। তাদের ব্যবহারের মধ্যে থাকে একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। তাই মানুষ লহমায় তাদের আপন হ'য়ে ওঠে। তাদের প্রাণখোলা ব্যবহার মানুষের মনে দাগ কেটে যায়। যাজকদের পক্ষে এমনতর ব্যবহার আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। ইষ্টানুরাগ ও সেবা-বুদ্ধি থাকলে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী এই রকমটা গজিয়ে ওঠে। ভিতরে যদি প্রীতি ও সেবা-বুদ্ধি না থাকে তাহ'লে মানুষ যতই অন্তরঙ্গতার ভান করুক না কেন তা' কিন্তু মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে না। নিজের প্রাণ যদি না জাগে তবে অপরের প্রাণকে স্পর্শ করা যায় না।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—অনেকের প্রাণ আছে কিন্তু তারা হয়তো লাজুক প্রকৃতির। লোকের সঙ্গে ভাল ক'রে মিশতে পারে না। তাদের প্রাণ থাকা সত্ত্বেও অপরে তা' বোধ করতে পারে না। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা যতই লাজুক প্রকৃতির হোক তাদের সঙ্গে যারাই মেশে তারাই বোধ করতে পারে যে তাদের আন্তরিকতা আছে। লোকের সঙ্গে মিশতে-মিশতে তাদের সংকোচ ধীরে-ধীরে কেটে যায়। কারও মা যদি বোবা হয় তাহ'লে তার সন্তান কিন্তু মায়ের চোখ-মুখ, চাউনি ও আকুলি-বিকুলি থেকেই বোধ করতে পারে মা তাকে কতখানি ভালবাসে। প্রাণের একটা রণন আছে। তা' অন্যের প্রাণে ধ্বনি তোলে। কথার চাকচিক্যের থেকে তা' অনেক শক্তিমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে সুশীলদাকে বললেন—আপনি কিন্তু কোরেশ বংশ-সম্বন্ধে বিশেষ ও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করবেনই। আমার মনে হয়, ইসলামের মধ্যে যা'-কিছু আছে তার কোনটারই কোন অমিল নেই আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাল ক'রে শেখা লাগে। কোরান-হাদিস একত্বানুধাবনী দৃষ্টি নিয়ে অল্প-অল্প ক'রে পড়তে হয়। মূলে সব এক। কেবল ভাষা আলাদা, রকম আলাদা। বহু জিনিস সম্বন্ধেই আমি

দেখেছি original (মৌলিক)-টা বুঝতে কোন বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যাকারদের পাণ্ডিত্যের কেরদানীর দরুন সহজ জিনিসটা জটিল হ'য়ে যায় এবং সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাপুরুষদের কথার মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁদের সব কথাই এক-সূত্রসঙ্গত। কোনটার সঙ্গে কোনটার বিরোধ নেই। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তাঁরা বিভিন্ন কথা বললেও দেখা যায় সবগুলির মূলে উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ জীব-কল্যাণ। বাঁচা-বাড়ার উল্টো কোন কথা তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার, তাঁরা কখনও বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ করতে বলেন না। বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে মানুষের আর কিছু থাকে না।

আবার মহাত্মাজীর প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মহাত্মাজীকে এইভাবে মারল এর চাইতে shocking (বেদনাদায়ক) আর কিছু নেই। তাঁর মত ভাল না লাগে তাঁর কথা শুনো না। কিন্তু তাঁর যে এতখানি করা তার কি এই প্রতিদান? যা' তিনি সত্য ব'লে বুঝতেন তার পেছনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিতেন। একি কম কথা ?

হাউজারম্যানদার মা—অপরের মৃত্যুতে আমাদের মন যে বিমর্ষ হয় তার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি, এটা ঠিকই যে প্রতিটি সত্তার সঙ্গে আমাদের একটা বিশেষ যোগ আছে। যখন কেউ, বিশেষতঃ আমাদের অস্তিত্বের পরিপোষক কোন মানুষ মারা যায়, তখন আমরা যেন অজ্ঞাতসারে বোধ করি যে আমাদের অস্তিত্ব যাদের সহযোগিতায় অস্তিত্ববান, তার একটা উপাদান আমরা হারালাম। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোধ করা যায় যে অপরের অবিদ্যমানতা আমাদের বিদ্যমানতাকেই ক্ষুণ্ণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা আপনি মধু খান তো ? আপনার এই বয়সে রোজ মধু খাওয়া ভাল। তাতে আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

মা বললেন—আচ্ছা !

তিনি পরে জিজ্ঞাসা করলেন—একদল বিয়োগান্তক নাটক পছন্দ করে আর একদল মিলনান্তক নাটক পছন্দ করে—এর পিছনে কোন্ মানসিকতা ক্রিয়া করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় যারা জীবনকে ভালবাসে, আদর্শকে ভালবাসে তারা কঠোর সংগ্রামের ভিতর-দিয়ে জয়, যশ ও জীবনের উদ্বর্দ্ধনে উপনীত হ'তে চায়। তাদের জীবন-উপভোগের প্রধান incentive-ই (প্রেরণাই) হ'লো Ideal-কে (আদর্শকে) খুশি করা। সেই লোভেই তারা বাঁচার জন্য, বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম করে। তাই তারা নাটকের মধ্যেও ঐ চিত্র প্রতিফলিত দেখতে চায়। আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে spiritual lull (আধ্যাত্মিক নিস্তেজতা) যখন আসে, তার will-force (ইচ্ছাশক্তি) যখন কমে যায় তখনই আসে মরণপ্রীতি, ব্যর্থতার প্রতি প্রীতি। ভালবাসা কোনদিন মরণকে স্বীকার করতে চায় না, ব্যর্থতাকে স্বীকার করতে চায় না। অমৃতলোকেই তার

অভিযান। যে করেই হোক সে বাঁচতে ও বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হয় আর তাই বুঝিয়ে দেয় যে মানুষের আত্মার শক্তি দুর্দ্ধর্ষ ও অমর। সে চায় মরণকে মারতে, পতনকে নিকেশ করতে। কেউ জীবনের পথে হ'টে যাক তা' সে চায় না। সবাইকে টেনে তোলাতেই তার আনন্দ। কেউ যদি কোথাও অপরের বাঁচা-বাড়ার পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়ায় সে তার প্রতিকারের জন্য নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে যায় অসংনিরোধী পরাক্রম নিয়ে। ভালবাসা বড় জবর চীজ। তা' কেবলই বলে—নিজে বাঁচ, অন্যকে বাঁচাও আর সকলে মিলে প্রিয়পরমের সেবায় অঢেল হ'য়ে ওঠ। বাধা-বিঘ্ন বিরুদ্ধতা দেখে অবসন্ন হওয়া মানে আমাদের অন্তরস্থ পরমপিতাকে অবমাননা করা। যখনই কেউ কলম ধরবে তখনই তার বোঝা উচিত জীবনের কথা, আশার কথা, আনন্দের কথা, উদ্দীপনার কথা, যদি সে লিখতে পারে তবেই তার কলম ধরার অধিকার আছে। মানুষকে নিস্তেজ করার, দুর্ব্বল করার হাজারো উপাদান জগতে ছড়িয়ে আছে। কলম-বাজী ক'রে তা' কারও ছড়াবার দরকার করে না। সে কাজ যদি কেউ করে তাহ'লে তাতে সমাজের ক্ষতিই করা হবে।

হাউজারম্যানদার মা—মৃত্যুরও তো একটা বিজয়ী রূপ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা হয়তো ঐভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু আমি বলি মৃত্যুকে অতিক্রম করার চেষ্টা আরও ভাল নয় কি? আমরা যদি অনন্তকাল বাঁচতে পারি সে মন্দ কি? মৃত্যুকে মেনে নিলে, মৃত্যুর কাছে নতি স্বীকার করলে আমাদের প্রভুত ক্ষতি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব—মৃত্যুকে প্রতিহত করতে। তাতে আমাদের শক্তি বেড়ে যাবে, জ্ঞান বেড়ে যাবে, আয়ু বেড়ে যাবে। অনধিগত যা' তাকে অধিগত করার প্রয়াসেব মধ্যেই তো জীবনের সার্থকতা।

হাউজারম্যানদার মা—আমি মৃত্যুকে একটা অবস্থার রূপান্তর ব'লে ভাবতে ভালবাসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ঐ অবস্থার রূপান্তর বা দেহ বা মাধ্যম পরিবর্ত্তনে কিছু আসে-যায় না যদি মৃত্যুর পরও আমাদের স্মৃতিবাহী-চেতনা অক্ষুণ্ণ থাকে।

হাউজারম্যানদার মা—আমি আশ্চর্য্যকে অভিনন্দন করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই তো মৃত্যুকে আপনার আরও বেশী খারাপ লাগবে। নিত্য নূতন অনাগত ও আগন্তুক surprise (আশ্চর্য্য) যেগুলি সেগুলি আমরা উপভোগ করব কী ক'রে যদি আমাদের অস্তিত্ব চেতন ও সাবুদ না থাকে? মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছুই জানি না। তাই যে জীবনকে আমরা চিনি ও বোধ করি তা' যাতে সবার পক্ষে উপভোগ্য হয়ে ওঠে, তার পরিধি যাতে সবার জন্য বেড়ে যায় সেইটে করাই সার্থক কাজ ব'লে আমি মনে করি।

হাউজারম্যানদার মা—অনেক বিষয় আছে যে-সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা না করাই আমি ভাল ব'লে মনে করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞান আমাদের অনেক সময় উদ্ব্যস্ত করে কিন্তু অজ্ঞানতা আরও

মারাত্মক। সত্তা সচ্চিদানন্দময়। প্রত্যেকের মধ্যেই সৎ, চিৎ ও আনন্দের element (উপাদান) আছে। সেইটের উপর দাঁড়িয়ে আমরা যত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারি ততই ভাল। জীবনই দেয় আমাদের সেই সাধনা ও অগ্রগতির সুযোগ। এই জন্যই মানব-জীবন এত মূল্যবান। শুধু বাঁচলে হবে না। বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে হবে, যাতে আমরা জীবনের মূল রহস্য, মূল তত্ত্ব ভেদ করতে পারি। আর জন্যই লাগে ধর্ম্ম, লাগে প্রভুর প্রতি অনুরাগ।

হাউজারম্যানদার মা—আমি বরাবর বোধ করেছি যে পরম করুণাময় ভগবান আমার পিছনে রয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা খুব সত্যি কথা। পরমপিতার করুণা ছাড়া আমরা কেউই এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারি না। তিনিই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি। তিনিই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। তাঁর দয়াতেই আমরা জীবন পেয়েছি ও বেঁচে আছি। তাঁর দেওয়া শক্তিতেই আমরা চলছি, ফিরছি, যা'-কিছু করছি। কিন্তু আমাদের এমন ignorance (অজ্ঞতা), এমন ingratitude (অকৃতজ্ঞতা), এমন forgetfulness (ভ্রান্তি-প্রবণতা) যে তাঁর কথাই মনে থাকে না, তাঁকেই স্বীকার করি না, তাঁর গুণগান করি না। তাঁকে ভুলে অহংসর্ব্বস্ব হ'য়ে হামবড়াই ক'রে বেড়াই। তাঁর একান্ত দয়া না হ'লে মানুষ এই দুস্তর মোহ থেকে ত্রাণ পায় না। মানুষ পরমপিতাকে ভুলে যেয়ে চলায় ভুল করে, পদে-পদে কষ্ট পায়। মানুষের সেই অসহায় অবস্থা দেখেই তো পরমপিতার আসন টলে ওঠে। তিনি তাঁর বার্ত্তাবহ পাঠান মানুষের মধ্যে। তাঁরা যখন আসেন তখন তাঁদের কথা শুনে যদি আমরা চলি তাহ'লে কিন্তু বাঁচোয়া।

হাউজারম্যানদার মা—পাপ ও দুর্ব্বলতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত। তাই ভাগবত মানুষ আসলেও সাধারণ মানুষ তাঁদের বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপ ও দুর্ব্বলতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের তখনই আসে যখনই সে উৎস-বিমুখ হয়। নইলে জীবন-বৃদ্ধির প্রতি আকর্ষণ, পুণ্য ও সবলতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়ানো। মানুষের মধ্যে ভগবান ভাল জিনিস দিয়েই দিয়েছেন। ভালটাকে আয়ত্ত করা অতি সহজ হয় যদি প্রাণভরে শ্রেয়কে ভালবাসা যায়। মানুষ ভগবানের অংশেই গড়া। মানুষকে বার-বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে সে পরমপিতার সন্তান এবং পবিত্রতায় ও পূর্ণতায় আছে তার জন্মগত অধিকার।

হাউজারম্যানদার মা কথা-প্রসঙ্গে বললেন—মহাত্মাজীর খুব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পরও জীবন থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গান্ধীজী একবার আশ্রমে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। মা'র ব্যবহারে তিনি খুব খুশি হ'য়েছিলেন।

হাউজারম্যানদার মা—গান্ধীজীর ব্যবহারও খুব চমৎকার ছিল। আমি একবার

সোদপুর আশ্রমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তাঁর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা বড় হয় তাঁদের বড়র মতোই ব্যবহার হয়। গুণ না থাকলে কি মানুষ আপনি-আপনি বাড়ে?

হাউজারম্যানদার মা—আপনি নিত্যত্ব বলতে কী বোঝেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিত্যত্ব ব'লতে আমি বুঝি ceaseless existence (চির-প্রবাহমান অস্তিত্ব)। কালের অনন্তত্ব আছে অথচ তা' বোধ করার মতো কোন চিরন্তন সত্তা নেই, কালের সে অনন্তত্ব সন্দেহযোগ্য ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। কাল বা সময় সৃষ্টির ভিতরকার জিনিস। সৃষ্টিকে বুঝতে গেলে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে বোঝা যায় না। আবার, স্রষ্টাকে বুঝতে গেলেও সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে বোঝা যায় না। অবশ্য সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে পুরোপুরি পাওয়া যায় না। সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত থেকেও সৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে তিনি আপন মহিমায় চিরবিরাজমান।

হাউজারম্যানদার মা—আপনি অস্তিত্বের সঙ্গে স্মৃতি চান এটা খুব ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Without memory (স্মৃতি ব্যতীত) consciousness (চেতনা) থাকতে পারে। যেমন ঘুম। ওতে gap of memory (স্মৃতির ফাঁক) আছে কিন্তু gap of consciousness (চেতনার ফাঁক) নেই। পরমপিতার কাছে আমাদের প্রার্থনা স্মৃতিযুক্ত চেতনা দাও।

বিণ্টুদা (বিশ্বাস) এবং পাকিস্তানের আরও কয়েকটি দাদার প্রশ্নের জবাবে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওখানকার স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ভাল যা' বিশেষতঃ বাস্তুভিটা ইত্যাদি তা' কখনও ছাড়বে না। কিন্তু less profitable (কম লাভজনক) ও unprofitable (অলাভজনক) যা', তা' প্রয়োজন হ'লে ছাড়তে পার। এমনভাবে চলা লাগে যাতে তোমরা কোন অবস্থায়ই বিপন্ন না হও। যেখানেই থাক নিজেদের নিরাপত্তার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সজাগ থাকবে।

১৮ই মাঘ, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১।২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), বঙ্কিমদা (রায়) প্রভৃতি অল্প কয়েকজন উপস্থিত আছেন।

প্রচার ও যাজনের মূল ধারা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মূল জিনিস হলো nature-এর (প্রকৃতির) nurture (পোষণ)। Nature should be nurtured in the way of liberation (প্রকৃতিকে পোষণ দিতে হবে মুক্তির পথে)। প্রত্যেকটা মানুষের প্রকৃতিরই একটা সার্থকতার দিক থাকে। বুদ্ধি ক'রে সেই সার্থকতার পথটা দেখিয়ে উন্মুক্ত ক'রে দিতে হয়। একজনের হয়তো ঝগড়াটে স্বভাব। সে হয়তো নিজের স্বার্থ, অহংকার

এবং খেয়ালের জন্য ঝগড়া করে। তাকে হয়তো আপনি এমনভাবে প্রবুদ্ধ করে তুললেন, যাতে সে নিজের স্বার্থের জন্য ঝগড়া না ক'রে দশের স্বার্থের জন্য অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিখল। কৃষ্টি-বিরোধী যা' তার বিরুদ্ধে লড়তে শিখল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দিলেন—'ঝগড়া করবে এমন ক'রে যাতে অন্য মানুষ তোমার যুক্তিতে, বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে সানন্দে তোমার কথা মেনে নেয়, মানুষের মন জয় করতে না পারলে জানবে যে তুমি হেরে গেছ।' মোট কথা, দেখতে হবে আমাদের কথায় যেন কারও বুদ্ধিভেদ না হয়।

কেন্টদা—আমরা অনেক কথা বলি যাতে বুদ্ধিভেদ জন্মে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধিভেদ জন্মানো ভাল নয়। ওতে মানুষ জবু-থবু হয়ে পড়ে। কোন্‌ভাবে চলবে দিশে পায় না। সেইজন্য গীতায় আছে—'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ, সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' তার কারণ হচ্ছে, প্রকৃতি-সঙ্গত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষের experience (অভিজ্ঞতা) হয় না, expansion (বিস্তার) হয় না, enjoyment (উপভোগ) হয় না। কারও মধ্যে ভুল যদি কিছু থাকে তাও সে ঐ কর্ম্মসঞ্জাত ফল ও অভিজ্ঞতার ভিতর-দিয়েই বুঝতে পারে। চলাটা যদি মানুষের খতম হয়ে যায়, তাহ'লে তার জীবনটাই খতম হওয়ার পথে চলে। সে কিছুতেই উৎসাহ পায় না, স্ফূর্ত্তি পায় না। ওতে ভাল হয় না। মানুষের দোষত্রুটি, মলিনতা থাকেই, তা নিয়ে বেশী ঝকাঝকি করতে নেই। কর্ম্মের পথে যাতে সে এন্তার হয়ে ওঠে, তাই করতে হয়। তাকে শুধু প্রেরণা দিতে হয় যাতে তার কাজের ভিতর-দিয়ে সকলের ভাল হয়। সে যাতে আত্মবিশ্লেষণমুখর হয়, নিজে enlightened (জ্ঞানদীপ্ত) হয় ও অন্যকে enlightened (জ্ঞানদীপ্ত) ক'রে তোলে সেই দিকেই তাকে চেতিয়ে দিতে হয়। মানুষের মনোভাব ও কাজের ক্রূর সমালোচনা করতে নেই। যা করছে তার মধ্যে ভাল যেটুকু আছে সেটুকুর জন্য তারিফ ক'রে আরও কত ভাল যে সে করতে পারে সেইটে তাকে দেখিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেকটি মানুষকে অফুরন্ত বিস্তার ও বিবর্দ্ধনের দিকে ঠেলে দেওয়াই আমাদের কাজ। প্রত্যেকেরই বড় হওয়ার ও ভাল হওয়ার সম্ভাবনা অঢেল। কিন্তু এটা হবে প্রত্যেকে তার নিজস্ব ধরণে। আমার যে রকমটা ভাল লাগে সেই রকমটা যদি অন্যের উপরে চাপাতে যাই তাহ'লে তারও লাভ নেই, আমারও লাভ নেই। কারও চলা-বলা আমাদের মনোমতো না হলে আমরা অনেক সময় তার উপর বিদ্বিষ্ট হই। লোক নিয়ে যারা চলবে তাদের পক্ষে এটা প্রচণ্ড ত্রুটি। প্রত্যেকে যদি তার স্বাতন্ত্র্য-অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠবার প্রেরণা আমাদের কাছ থেকে না পায় তাহলে মানুষ আমাদের কাছে ভিড়বে কেন? ভগবানের রাজ্যে বহু মানুষ, বিচিত্র তাদের প্রকৃতি। এবং প্রত্যেকটি প্রকৃতিরই স্ফুরণের প্রয়োজন আছে তার নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য। সেটা অনুধাবন করতে না পেরে সবাইকে ছেটে-কেটে আমি যদি আমার মতো করতে চাই তাতে কারও মঙ্গল নেই। ও একরকমের জবরদস্তি। প্রত্যেকে সুখী হয়, সার্থক হয়, বড় হয়, যদি সে তার জন্মগত বিশিষ্টতার

পথে চলবার সুযোগ পায়। এই সুযোগ দেওয়াই, প্রত্যেকটি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে মর্য্যাদা দেওয়াই শিষ্টতার রাজলক্ষণ। অন্ততঃ সুধী যাঁরা, তাঁরা তাই ক'রে থাকেন। যে-কোন মানুষকে নিয়ে চলতে গেলেই এদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নইলে অযথা বুদ্ধিভেদ ঘটানো হয়, ভাবে ব্যাঘাত করা হয়, মানুষের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

প্রফুল্ল—আমরা কি করে বুঝব তার অন্তরতম প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা কী? আমরা তো সাধারণভাবে যা' মঙ্গলজনক বলে বুঝি তা' সকলের কাছেই প্রায় একভাবে বলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু নিজের রকমে নিজের জগতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। প্রত্যেককে observe (পর্য্যবেক্ষণ) করা চাই; তার চাহিদা, পছন্দ, প্রয়োজন, ঝোঁক ইত্যাদি বিষয়ে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে ধরা চাই। একজন হয়তো অর্থ চায়। তাকে যদি তুমি বোঝাতে চেষ্টা কর যে অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল তাহ'লে তোমার কথায় তার কোন লাভ হবে না। বরং অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে সে উৎসাহ-সহকারে যে চেষ্টা করছিল, সে-চেষ্টার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায় সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। তাই মানুষকে negative (নেতিবাচক) কথা না ব'লে তার উদ্দেশ্যের higher fulfilment (উচ্চতর পূরণ) যাতে হয় তাকে সেই ভাবে মাতিয়ে দেওয়াই ভাল। তাকে হয়তো তুমি বললে এমন একটা কিছু করা ভাল যাতে তুমি বহু লোকের অন্নদাতা হতে পার। তুমি চেষ্টা করলে এমন একটা industry (শিল্প) করতে পার, যাতে দেশের লোকের অভাব মেটে, বহু লোকের অন্নসংস্থান হয়, তুমি নিজেও ধনী হতে পার এবং দেশকেও ধনী ক'রে তুলতে পার। এমন জিনিস করা চাই যাতে বিদেশের বাজারে তার চাহিদা হয়। তাতে অন্য দেশ থেকে ভারতবর্ষে বহু টাকা আমদানী হতে পারবে। কারও যদি স্বার্থবুদ্ধি থাকে সেই স্বার্থবুদ্ধির জন্য তাকে কটাক্ষ না ক'রে তার স্বার্থবুদ্ধি বিস্ফারিত হ'য়ে যাতে মহাস্বার্থের আবাহনে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে সেইভাবে তাকে তাজা ক'রে ছেড়ে দিতে হয়। কাউকে নিন্দা করার কিছু নেই, ঘৃণা করার কিছু নেই, চাই শুধু প্রত্যেককে তার মতো ক'রে মহামঙ্গলের পথে পরিচালিত ক'রে দেওয়া। ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে এইভাবেই যুতে দিতে হয় মানুষের মধ্যে। কুছ্ পরোয়া নেই। প্রত্যেকের বড় হওয়ার পথ, মনস্কামনা পূরণের পথ খোলা আছে। মহৎ-স্বার্থী হওয়াই যে আত্মস্বার্থসম্পূরণের প্রকৃষ্ট পথ এটা প্রত্যেককেই তার নিজস্ব রকমে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তোমার সংস্পর্শে এসে অপরে যেন বুঝতে পারে যে তুমি তাকে ভালবাস, তুমি তাকে শ্রদ্ধা কর, তার ভাল হ'লে তুমি বর্ত্তে যাও, তার দায়টাকে তুমি নিজের দায় বলে মনে কর, তাকে উপদেশ দেবার জন্য তুমি ব্যস্ত নও, তার সেবা ও সাহায্য করতে পারলে তুমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কর। এই আকুল প্রীতি-প্রাণতার স্পর্শ কেউ যদি তোমার কাছে এসে পায়, তাহ'লে সে কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না। কঠোর ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে এইভাবে চলতে পারাই যাজনজৈত্র হওয়ার তুক। মঙ্গল তখন তোমার পিছে-পিছে

পায়-পায় হাঁটবে। তুমি পদ্মপাদের মতো হ'য়ে উঠবে। তোমাকে দিয়ে তখন ভাল ছাড়া মন্দ হবে না কারও কিছু। যারা egoistic (অহংকারী) লোক, তারা মানুষের ভাল করতে গিয়ে অজ্ঞতা ও জেদ-বশতঃ অন্যের উপর নিজেদের অনেক কিছু খেয়াল চালাতে চেষ্টা করে। তাই তাদের দিয়ে মানুষের ভাল যেমন হয়, মন্দও তেমনি কম হয় না।

প্রফুল্ল—চেষ্টা ক'রেও অনেক সময় অপরের প্রকৃত চাহিদা ও ধরণটা বুঝতে পারি না। তার নিয়ামক প্রবৃত্তি কী তা না বুঝতে পারার দরুন মানুষটাকে আপন ক'রে তুলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই জন্যে সব সময় মনটাকে ইষ্টে ভরপুর করে রাখা লাগে। ওতে মন ও দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে। তখন সহজেই ধরা পড়ে। নিজের প্রবৃত্তির অভিভূতি যত কমে, মনটা যত uncoloured (অরঞ্জিত) ও receptive (গ্রহণমুখর) থাকে, ততই বোঝার সুবিধা হয়। মনটা তো শূন্য থাকতে পারে না, তাই মনটাকে পরমপিতার ভাবে মাতোয়ারা ক'রে রাখতে হয়। ঐ ভূমিতে দাঁড়ালে, উপর থেকে দাঁড়িয়ে মানুষগুলিকে ভাল ক'রে দেখা যায়। প্রবৃত্তিলীন মানুষের মন যে-স্তরে আছে, তোমার মনও যদি সেইরকম স্তরে থেকে হাবুডুবু খায়, তাহ'লে তোমার সেই দিশেহারা পরিশ্রান্ত ও জাবড়া মন নিয়ে তুমি অন্যকে কতটুকু দেখতে পাবে। পুকুরের জলে আকাশের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই জলে যদি ক্রমাগত ঢেউ উঠতে থাকে—তাহ'লে তা'তে কি আকাশের যথাযথ প্রতিরূপ প্রতিফলিত হবে? আমাদের নিজেদের মনই থাকে ইষ্টাতিরিক্ত নানান ধাশ্ধায় নানাভাবে বিব্রত, অশান্ত ও অস্থির হয়ে। তাই আমাদের বহুধা-বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত মনের উপর বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে যথাযথ ও অবিকৃত বোধ গ'ড়ে উঠতে পারে না। আমি যে বলেছি 'ঊষা-নিশায় মন্ত্রসাধন চলা-ফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ'—এটা খুব জোরসে চালান লাগে। মনে করবে, তোমার জীবন যখন তুমি পরমপিতাকে দিয়েছ, তখন তাঁর অনুকুল চিন্তা ছাড়া প্রতিকুল চিন্তা করবার অধিকার তোমার নেই। যা' তাঁকে দিয়েছো তার মালিক তিনিই। তা' তাঁর কাজে নিয়োগ করাই তোমার ধর্ম্ম। সব সময় যদি তোমার মানস-শক্তিকে ইষ্টার্থে নিয়োজিত করতে অভ্যস্ত হও, তাহ'লে দেখতে পাবে, তোমার ঐ মানস-শক্তি কত উন্নত ও অমোঘ হ'য়ে উঠছে। তোমার সেই ইষ্টোন্নত একাগ্র মনের মনোযোগ যখন যেদিকে যাবে তখন সেদিকেই অসাধারণ সাফল্য লাভ করবে। আমি তো কেবল ভাবি ভগবান যখন তোমাদের এত বড় ক'রে তুলতে চান, কেন তোমরা ইচ্ছা ক'রে ছোট হ'য়ে থাক। আমি যে-ভাবে তোমাদের চলতে বলি, সে-ভাবে যদি চলতেই থাক, তাহ'লে দেখতে পাবে তোমরা নিজেরা তো বড় হ'য়ে উঠছই, আবার তোমাদের দিয়ে কত মানুষ যে উপকৃত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। তোমরা হ'য়ে উঠবে মানুষের উপরে ওঠবার সিঁড়ি।

কেষ্টদা বললেন—এক সময় আপনি আমাকে কেষ্ট দাসের কাছে পাঠাতেন তার তত্ত্বালোচনা শোনবার জন্য। তার প্রাণপণ চেষ্টা সে আমাকে তার আজেবাজে

অযৌক্তিক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিয়ে ছাড়বেই। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে, যুক্তির সঙ্গে যার কোন যোগ নেই তেমন জিনিস আমি কোনদিনই বুঝিও না, স্বীকারও করি না। আমি যত প্রশ্নই করি সে সেই প্রশ্নের ধার না ধেরে আরও নতুন-নতুন বড়-বড় কথার আমদানি ক'রে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করত। তার ঐ-সব কথাবার্ত্তায় আমার মাথার মধ্যে কি যে যন্ত্রণা হত তা ব'লে বোঝাতে পারি না। আমি যেতে চাইতাম না তবুও আপনি ঠেলে-ঠেলে পাঠাতেন। অনেকেই অল্পবিস্তর ঐরকম করে। মানুষটার প্রশ্ন কী, সমস্যা কী, সেদিকে আদৌ লক্ষ্য দেয় না। ভাবে তার নিজস্ব কথাগুলি একধারসে আউড়ে যেতে পারলেই আর-একটা মানুষ convinced (প্রত্যয়-দীপ্ত) হ'য়ে যাবে। এও একধরণের পাগলামি। অন্যের কথা শোনার বালাই নেই, অথচ নিজের কথা ঢালবার জন্য ব্যগ্রতা। আপনি যাজন-সংকেতে যাজনের যে-সব মনোবিজ্ঞানসম্মত নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সেগুলি রপ্ত করতে গেলে নিজেদের যে mental preparation (মানসিক প্রস্তুতি) দরকার তা' আমাদের অনেকেরই নেই। এখন দীক্ষাদি যে হয় তার বেশীর ভাগই বৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে হয়। তাই আপনি যে-ধরণের লোক চান, সে-ধরণের লোক কমই দীক্ষিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা ওদের গ'ড়ে-পিটে নেবেন। যে যেমনতর, যে যেখানে আছে তাকে সেখানেই ধরবেন। যা' সে বোঝে না তা' তাকে বলতে যাবেন না। যা' ধরতে পারে সেইটে ভাল ক'রে ধরিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে ধীরে-ধীরে আরও জিনিস এমন ক'রে যোজনা করবেন যা'তে তার বুদ্ধিভেদ না হয়। এমনি ক'রে প্রত্যেককে আরোর দিকে নেবেন। ভেঙ্গে দেবেন না। Gradual upliftment (ক্রমিক উন্নতি) যাতে হয় বিবেচনা ক'রে তাই করবেন। মানুষকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে তৈরী করতে হয়। যে যেদিকে interested (অন্তরাসী), তাকে সেই দিকে উৎসাহ দিতে হয়। আরোর ক্ষুধা মানুষের চিরন্তন। সেই দিকে মানুষের নেশা ধরিয়ে দিতে হয়। কতকটা সাঙ্কেতিকভাবে বলতে হয়। যদি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলা যায়—এই কর, তাহ'লে তার natural (স্বাভাবিক) যা', তা' হয়তো স্ফূর্ত্ত হবে না।

কেষ্টদা—তার পক্ষে যা' natural (স্বাভাবিক) তাই-ই যদি বলা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ভেবে-চিন্তে সমস্যা ও সংঘাতের মধ্যে প'ড়ে নিজের প্রকৃতিগত শক্তি, সম্ভাবনা, রুচি ও আনন্দ কিসে, তা' যদি আবিষ্কার করতে না পারে, তাহ'লে কিন্তু সে evolve (বিবর্ত্তনলাভ) করে না। প্রতিপদক্ষেপে তাকে যদি একজন বাইরে থেকে dictate (আদেশ) করে, তা'তে তার সত্যিকার উপকার হয় না। যারা কাজের আনন্দ ও কাজের মাধ্যমে অপরকে বাস্তব সেবা ক'রে তুষ্টিলাভের আনন্দ থেকে টাকা পাওয়ার কথাটা বড় ক'রে ভাবে, তারা ঠিকই পেয়ে ওঠে না, কোন্ কাজে তাদের প্রকৃত তৃপ্তি ও সার্থকতা। মানুষ পেটের দায়ে বৈশিষ্ট্য-বিরোধী জীবিকার আশ্রয় নিতে-নিতে আজ ধরতে পারে না কোন্ কাজ তার প্রকৃতিসঙ্গত। বর্ণাশ্রম যত ভাঙ্গা পড়বে, ততই নিজের সঙ্গে নিজের অপরিচয়ের মাত্রা মানুষের বেড়ে যাবে। সে কী,

কী তার কাজ, কিসে তার সুখ, এইটেই তার বোধে গজিয়ে উঠবে না সহজে। বঙ্কিম আমাকে খাঁকাতে, লালন-পালন করতে ভালবাসে। এই কাজ ঠিক থাকলে সে হয়তো গন্ধমাদন আনতে পারবে, এটা ছাড়িয়ে দিলে সে হয়তো কোন কাজ পারবে না। ও তো ওই খায়, তবু সালসার মতো কাজ হচ্ছে। আমাকে আয়েস দিয়ে আরাম পায়, স্ফূর্ত্তি হয় ওর, এই foundation-এর (ভিত-এর) উপর অনেক কিছু build (নির্ম্মাণ) ক'রে তোলা যায়। Unexpectantly (প্রত্যাশাশূন্যভাবে) শ্রেয়-প্রীত্যর্থে ক্লেশ-স্বীকারের বুদ্ধি ও অভ্যাস যদি কারও মাথা তোলা দেয়, তার জন্য আর ভাবনার কিছু নেই। সে কত করবে, কত পারবে, কত বুঝবে তার কি সীমা আছে ?

কেষ্টদা—যারা দীক্ষা নিয়েছে, তাদের যদি ভালভাবে organised (সংগঠিত) ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে বিরাট কাজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organise (সংগঠন) করা মানে to make everyone active for the principle according to his instinctive possibility (প্রত্যেককে তার সংস্কার-গত সম্ভাব্যতা অনুযায়ী ইষ্টার্থে সক্রিয় ক'রে তোলা)। প্রত্যেকের স্ফূর্ত্তিজনক কৃতিসম্বেগকে এমন ক'রে বাড়িয়ে তুলতে হবে, যা'তে ইষ্টের ইচ্ছা ও পরিকল্পনাগুলি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেকটা cell (কোষ) যেমন work (কাজ) করে for life (জীবনের জন্য), প্রত্যেকটি individual-এর (ব্যক্তির) তেমনি work (কাজ) করা চাই for the fulfilment of the Ideal (ইষ্টের পরিপূরণের জন্য)। আমরা সবাই পরমপিতার হাত-পা বিশেষ। তাই আমরা প্রত্যেকে আবার প্রত্যেকের জন্য। এই রকমটা যত দানা বেঁধে উঠবে ততই সেবা, সম্পদ, শক্তি ও সংহতি উচ্ছল হ'য়ে উঠবে। একজনের গায় একটা আঁচড় লাগলে সকলেই চনমন ক'রে ঠেলে উঠবে। একেই বলে divine organisation (ভাগবত সংগঠন)।

কিছুক্ষণ বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—সুশীলদাকে বলেছি, আপনাকেও বলেছি, আবার বলছি—আমাদের বক্তব্য ও করণীয় মোদ্দা বিষয়গুলির উপর কয়েকখানা ছোট বই যদি লিখতেন, তাহ'লে ভাল হ'তো। যা' লিখবেন, তা thorough (পূর্ণাঙ্গ) হওয়া চাই। যা'তে ঐ বই পড়ে আর কোন প্রশ্ন না থাকে। ঐ সম্পর্কে মানুষের মনে যত রকমের প্রশ্ন জাগতে পারে, তার সমাধান যেন থাকে। অথচ বইগুলি ছোট হওয়া চাই। লেখার ধরণ এমন হওয়া চাই, যা'তে বই পড়তে সুরু ক'রে শেষ না ক'রে উঠতে ইচ্ছা না করে। লোকে পড়বে আর মনে-মনে বলবে বা! বা! এই তো কথা, এ হ'লে তো আর কারও কোন দুঃখ থাকে না, আর এটা করাও তো সহজ ও স্বাভাবিক। প্রফুল্ল যদি চেষ্টা করে তাহ'লে ও-ও পারে। ওর হ'লো artistic taste (শিল্পমুখী অনুরাগ)। ব্যাপার হ'লো fact (তথ্য)-গুলি সাজান to establish a point (কোন একটা বিষয়ের প্রতিপাদন ও প্রতিষ্ঠার জন্য)। পর্য্যায় ক'রে সাজালেন, তা' থেকে অনিবার্য্যভাবে যে সিদ্ধান্ত আসে তা' যুক্তিযুক্তভাবে বের ক'রে এমনভাবে তুলে ধরলেন যে প্রত্যেকের মন যেন তাতে সায়

দেয়। আবার এমনভাবে সাজাবেন, যাতে অন্যভাবে explain (ব্যাখ্যা) করবার scope (অবকাশ) না থাকে। বিষয়ের inner-core (অন্তরগত মর্ম্ম)-টা ফুটিয়ে তোলা চাই। লেখার মধ্যে শুধু যুক্তি, বুদ্ধি, ভাষার জোর ও পাণ্ডিত্য থাকলে চলবে না। চাই বাস্তব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, দরদ, আবেগ ও প্রত্যয়ের ছাপ, যা'তে লেখা পড়ে প্রত্যেকের সত্তা আলোড়িত হ'য়ে ওঠে, তার এলোমেলো চিন্তাধারা ঠিক পথে ঘুরে দাঁড়ায়।

১৯শে মাঘ, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ২।২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলঘরে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়-চৌধুরী), হরেনদা (বসু), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদার মা, গোপেনদা (রায়), আদিনাথদা (মজুমদার) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। গতকাল বেলা তিনটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মহাত্মাজীর মৃত্যুতে ইংরাজী ও বাংলায় শোকজ্ঞাপন বাণী দান করেন। সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—প্রফুল্ল! বাণী দুটি পড়ে শোনাও তো!

তারপর প্রথমে ইংরাজী বাণীটি পড়া হ'লো—

To shoot Mahatma
is to shoot the hearts
of all the people—
the lovers of existence.
O thou the great Tapas!
bestow thy bliss
that resists
with every shooting off,
the evils that obsess;
Father the Supreme!
pour thy grace
on this dumb appeal of human heart.

পরে পড়া হ'লো বাংলা বাণীটি—

যে গুলি মহাত্মাকে মৃত্যুবিদ্ধ করেছে
সে গুলি সত্তানুরাগী সবারই হৃদয়কে
আবিদ্ধ, বিদীর্ণ করে ফেলেছে।
মহাতাপস! তোমার আশীর্বাদ যেন
সবারই অন্তর্নিহিত অমঙ্গলকে
চিরদিনের মতো অবলুপ্ত করে।

পরমপিতঃ !
মানুষের এ আবেদন
তুমি মঙ্গলে পূর্ণ ক'রে তোল।

হাউজারম্যানদার মা বললেন—আপনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন সেগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Word (শব্দ) হ'লো feeling-এরই (ভাবের) picture (ছবি)। আমার কোন জ্ঞান নেই, বোধই ভাষা টেনে আনে। আমার ওর উপর কোন দখল নেই।

একটি দাদা—শরীর ভাল নয়, কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ক'রো যা'তে মানুষকে স্ফূর্ত্তি দিয়ে স্ফূর্ত্তি পাও। মানুষ যদি তোমাকে দিয়ে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহ'লে তাতে তুমিও স্ফূর্ত্তি পাবে। ওতে শরীর মন দুই-ই ভাল হবে। তোমাকে দিয়ে মানুষ যদি সম্ভাবে স্ফূর্ত্তি না পায়, তাহ'লে তুমিও স্ফূর্ত্তি পেতে পার না। ভেবে দেখো—কোন্ ভাবে স্ফূর্ত্তি পাও ও স্ফূর্ত্তি দিতে পার, আর তাই-ই ক'রে চলো। সঙ্গে-সঙ্গে আহার, বিহার, আচার, শ্রম, বিশ্রাম, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা বিহিতরকমে করতে হয়।

উক্ত দাদা—শরীর খারাপ থাকলে অন্যকে স্ফূর্ত্তি দেওয়ার কথা মনেই আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো ব্যাধির লক্ষণ। শরীর খারাপ হ'লে যেমন শক্তির অল্পতার দরুন মানুষ পরিবেশ-সম্বন্ধে উদাসীন হয়, আবার পরিবেশ-সম্বন্ধে উদাসীন হ'লেও তেমনি তার শরীর-মন, নিস্তেজ ও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে। ঐ উদাসীনতা বা বিমুখতার ভাব দেখা দিলে জোর ক'রে তাকে তাড়াতে হয়। সক্রিয় ভালবাসা যত বিস্তার লাভ করে, শরীরবিধানও তত energised (শক্তিসম্ভৃত) হ'য়ে ওঠে। ইষ্টপ্রাণতা শরীরকেও পুষ্ট করে। ঐ একটি মাল আছে যা' সবদিক দিয়ে কেবল ভালই করে। ইষ্টপ্রাণতায় ভালবাসা যেমন কেন্দ্রায়িত থাকে, তেমনি তা' প্রসার লাভ করে।

দাদাটি বললেন—আমার ব্যবসায়ে লোকসান হচ্ছে। কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন ঠকছ, ভেবে দেখা লাগে। সেইগুলি ঠিক ক'রে ভাল ক'রে লাগতে হয়। নিজের ভুল ত্রুটি কোথায় তা' যদি নিজে ধরতে না পার, সংশোধন করতে না পার, তাহ'লে যতই টাকা ঢাল, যতই অপরের দোষ দাও, যতই সময়ের দোষ দাও, ভাগ্যের দোষ দাও, তা'তে কিন্তু কোন লাভ হবে না। ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি সব জিনিস নিজের নখদর্পণে রাখা লাগে। কোনদিকে চোখবুঁজে থাকলে বা আলস্য করে নজর না দিলে, সেই দিক দিয়ে বিপদ আসতে পারে। ব্যবসায়ের ঠাটবাট আগে বাড়াতে নেই। কুলোতে পারবে কিনা সে-সম্বন্ধে না ভেবে হয়তো মাইনে ক'রে একটা লোক রাখলে, তার উপর হয়তো টাকা-পয়সার ভার ছেড়ে দিলে। এ-সব ভাল নয়। অনিবার্য্য প্রয়োজন হ'লে লোক অবশ্য রাখতেই হয় এবং তার উপর নির্ভরও কিছুটা করতে হয়। কিন্তু এমনভাবে লাগাম নিজের হাতে রাখতে হয়, যা'তে ইচ্ছা করলেও সে তোমার ক্ষতি করতে না পারে। নিজে গাফিলতি

না ক'রে লোককে খারাপ করবার সুযোগ দিয়ে পরে তার দোষারোপ ক'রে লাভ নেই। বাকী-বকেয়া দেওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হ'তে হয়। ধার দিলেও তা' মাত্রামতো দিতে হয় ও সময়মতো আদায় ক'রে নিতে হয়। মহাজন, কর্ম্মচারী ও খরিদ্দারদের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করতে হয়। তাদের ঠকাতে নেই এবং নিজেও ঠকতে নেই। কারও সঙ্গে কথা খেলাপ করতে নেই বা কাউকে কথা খেলাপ করতে দিতে নেই। দোকানের লাভ যা হয়, তার বেশীটা ব্যবসায়ের জন্য তুলে রেখে বাদবাকী সংসার খরচের জন্য নেওয়া চলে। মূলধন ভেঙ্গে খাওয়া ব্যবসায়ের পক্ষে মারাত্মক। ব্যবসায়ীকে যদি না বাঁচাও তবে ব্যবসায় তোমাকে বাঁচাবে কী করে? সৎ-কৃতী ও বনেদী ব্যবসায়ী যারা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা লাগে এবং দেখতে হয় তারা কিভাবে কী করে? প্রত্যেকটি কাজে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য লাগে কতকগুলি ছোট-ছোট সৎ অভ্যাস ও সূক্ষ্ম সজাগ নজর। যাদের মধ্যে সেগুলি চরিত্রগত, চোখ-কান খোলা রেখে তাদের সঙ্গ-সাহচর্য্য ক'রে সে-গুলি অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত করে নিতে হয়। ঠকাটা আমার কাছে বড় insulting (অপমানজনক) লাগে। আর কখনও ঠকো না।

লোকের অযোগ্যতার প্রধান কারণ কী এবং তার নিরাকরণ কিভাবে হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন নিজের অকৃতকার্য্যতার জন্য নিজেকে দায়ী না ক'রে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপায়, তখনই সে inefficiency (অযোগ্যতা) invite (আমন্ত্রণ) করে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ যে কাজের পথে নানা অসুবিধা ও অন্তরায় সৃষ্টি ক'রে থাকে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কৃতী হ'তে চায়, তার ওতে দমে গেলে চলবে না। তার চাই ও-গুলি overcome (অতিক্রম) করা। Negative criticism (নেতিবাচক সমালোচনা) success (সাফল্য) এনে দেয় না। পরিবেশ যে-যে অসুবিধার সৃষ্টি করে বা করতে পারে সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকা ভাল এবং সেগুলি উত্তীর্ণ হবার কায়দা-কৌশল ও প্রস্তুতিও ঠিক রাখা দরকার। কিন্তু অপরের দোষ গেয়ে বেড়ালে কোন লাভ হয় না। ওতে co-operation (সহযোগিতা) পাওয়া দুষ্কর হয়। যার সাহায্য যতটুকু পাওয়া যায়, তার জন্য তাকে শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। এতে তার সাহায্য করার উৎসাহ বাড়ে। মানুষের অসামর্থ্য বা অনিচ্ছার দরুন যে ঈপ্সিত সাহায্য তার কাছ থেকে পাওয়া যায় না, সে-সম্বন্ধে অনুযোগ অভিযোগ বা দোষারোপ করতে গেলে নিজেকেই বঞ্চিত হ'তে হয়। মানুষ ছাড়া মানুষের চলে না, তাই যারা বড় হ'তে চায়, তাদের একান্তভাবে চাই সহ্য, ধৈর্য্য ও সহানুভূতি। আর চাই আদর্শানুগ উদ্দেশ্য ঠিক রেখে নিয়মিত কঠোর শ্রমপরায়ণতা নিয়ে লেগে প'ড়ে থাকা। মানুষ যদি একটু কম ধারালো হয়, তাতেও ক্ষতি হয় না, যদি এইসব গুণ থাকে। চেষ্টা ও সংকল্প থাকলে বেশীর ভাগ লোকই যার-যার নিজস্ব রকমে যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারে। তবে এর পিছনেও nurture (পোষণ) চাই। অভিভাবক, শিক্ষক, ঋত্বিক্ ও সমাজের মুরুব্বী যারা তাদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেককে এমনভাবে inspire (প্রেরণা-

দীপ্ত) করা, guide (পরিচালিত) করা ও nurture (পোষণ) দেওয়া, যাতে কেউই অযোগ্য হ'য়ে না থাকে।

হাউজারম্যানদার মা—ঈশ্বরনিন্দা (blasphemy) কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, প্রেরিতপুরুষ বা শ্রদ্ধার্হ গুরুজনদের অবজ্ঞা বা অস্বীকার করলে তাতেও Blasphemy (ঈশ্বরনিন্দা) হয়। পরমপিতার অপার-দয়ায় আমরা জীবন পেয়েছি ও বেঁচে আছি। যাঁর দয়ার দৌলতে সবকিছু, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও নতিই স্বাভাবিক। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও নতি থাকলে তৎপরায়ণ মহাপুরুষদের আমরা ভাল না বেসে পারি না। আর, ভালবাসলে অনুসরণ করার প্রবৃত্তি আসে। তাই, যদি কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা ও তাঁর গুণগান করা সত্ত্বেও তাঁর প্রেরিতকে না মানে ও তাঁর সত্ত্বাসম্বর্ধনী নীতির অনুবর্ত্তী হ'য়ে না চলে, তাহ'লে in essence (তত্ত্বতঃ) ঈশ্বরকে অবমাননা করা হয়। মুখে ঈশ্বরনিন্দা না করাই যথেষ্ট নয়, দেখতে হয় আচরণ দিয়ে যেন ঈশ্বরনিন্দা করা না হয়। Blasphemy (ঈশ্বরনিন্দা) মানে to throw blast against holy fame (পবিত্র খ্যাতির বিরুদ্ধে আঘাত হানা)।

মা—ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া মানুষের আচরণ ত্রুটিশূন্য হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুব—মানুষ যত ঈশ্বরমুখী হয়, ততই তার চলন শুদ্ধ হয়। Machanically (যান্ত্রিকভাবে) ভাল হ'তে গেলে, অনেক গরমিল থেকে যায়। কিন্তু ইষ্টানুরাগ যদি একবার দানা বেঁধে ওঠে, তাহ'লে চলনা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হ'য়েই পারে না। ঈশ্বরের কৃপা ব'লে যদি কিছু থাকে, তা হ'লো ইষ্টানুরাগ আর এটা হ'লো ভক্তের নিজস্ব ইচ্ছাসাপেক্ষ ব্যাপার। ইষ্টকে ভালবাসতে চাইলেই ভালবাসা যায়। এই ভালবাসার ক্ষমতা পরমপিতা দিয়েই দিয়েছেন। এই তাঁর দয়া। তাঁর দয়া সত্ত্বেও মানুষ যদি নিজের প্রতি সদয় না হয়, তাহ'লে পরমপিতার দয়া কার্য্যকরী হ'তে পারে কমই।

মা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হিটলার 'আর্য্য' শব্দটা সম্বন্ধে লোকের মনে একটা বিরূপ ভাবের সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিটলারের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে ভুল থাকতে পারে। কিন্তু truth is truth (সত্য সত্যই), তার কোন নড়চড় হয় না। পিতৃপুরুষের সম্বন্ধে গর্ব্ববোধ কোন খারাপ জিনিস নয়। তা' না থাকাই বরং খারাপ। ঐ গর্ব্ববোধ না থাকলে জাতি বড় হ'তে পারে না। তারা উন্নতির প্রেরণা পায় না। তবে নিজ জাতি সম্বন্ধে গর্ব্ববোধ মানে এ নয় যে অপর জাতিকে ছোট ভাবতে হবে বা তাদের অবজ্ঞা করতে হবে। বরং কেউ যদি নিজের জাতিকে শ্রদ্ধা করে, তার সব জাতিকেই যথাযোগ্যভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। একটা আছে inferiority (হীনম্মন্যতা)-প্রসূত গর্ব্ববোধ, আর একটা আছে শ্রদ্ধাপ্রসূত গর্ব্ববোধ। শ্রদ্ধাপ্রসূত গর্ব্ববোধ

অপরকে শ্রদ্ধা বই অশ্রদ্ধা করতে শেখায় না। Inferiority (হীনম্মন্যতা) থাকলে অপরের সঙ্গে সশ্রদ্ধ সঙ্গতি বজায় রেখে চলার বুদ্ধি থাকে না।

মা—আর্য্যদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্য্যরা প্রধানতঃ সত্তাবাদী। প্রবৃত্তির ঝোঁকে তারা সত্তাকে minimise (খাটো) ক'রে দেখতে নারাজ। সত্তার পূজারী যারা, তারা স্বভাবতঃই হয় উৎসমুখী। পিতৃপুরুষ, ঋষি-মহাপুরুষ ও ঈশ্বরের প্রতি তারা normally (সহজভাবে) ovation (সম্মাননা) নিয়ে চলে। Past (অতীত)-কে তারা কখনও অস্বীকার করে না। Past experience-এর (অতীত অভিজ্ঞতার) উপর দাঁড়িয়ে তারা বর্ত্তমানের সম্মুখীন হয়। Recorded past experience (লিপিবদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতা)-কে বলা যায় শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। মনুষ্যলব্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী রীতি, নীতি ও প্রথাকে বাস্তবজীবনে apply (প্রয়োগ) ক'রে চলার tradition (ঐতিহ্য) আর্য্যদের স্বভাবগত। এইভাবে চললে ঠকার সম্ভাবনা কম থাকে। Whims (খামখেয়ালীপনা)-কে যারা প্রশ্রয় দিয়ে চলে, তাদের progress (উন্নতি) hampered (ব্যাহত) হ'তে বাধ্য। আর্য্যরা যে নিত্য progressive (প্রগতিশীল), তার একটা প্রধান কারণ তারা বিদিত বেদকে বরবাদ ক'রে, খেয়ালের তাড়নায় যথেচ্ছ চলনে চলে না। নূতনকে আমন্ত্রণ করার বুদ্ধি তাদের যেমন আছে, তেমনি আছে যুগ যুগ ধ'রে যা' ভাল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, সাময়িক উল্টো হুজুগকে উপেক্ষা ক'রে তা' আঁকড়ে থাকার দৃঢ়তা। এই হিসাবে সমীচীন গোঁড়ামির একটা মূল্য আছে। Reasonable conservativeness (যুক্তিযুক্ত রক্ষণশীলতা) আর্য্যদের একটা বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কুলগত বৈশিষ্ট্য preserve (রক্ষা) ক'রে চলতে চায় তারা। আর্য্যদের culture (কৃষ্টি) তাই এত varied (বৈচিত্র্য-পূর্ণ)। এত variety (বৈচিত্র্য) সত্ত্বেও unity (ঐক্য) maintained (রক্ষিত) হয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ একাদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভিতর-দিয়ে। আমার মনে হয় এইগুলিই হ'লো আর্য্যদের main characteristics (প্রধান বৈশিষ্ট্য)। অবশ্য, আমি history (ইতিহাস) জানি না। ধারা, ধরণ যা' দেখি, বুঝি, তা' থেকে এই মনে হয়।

২২শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ৫।২।৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলঘরে। সুশীলদা (বসু), হরিদাসদা (সিংহ), নরেশ ভাই (দাস) প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত আছেন।

একটি মা বললেন—ভগবানের বিচার কোথায়, তা' ঠিক পাওয়া যায় না। যার কষ্টের কপাল, তার সব দিকেই কষ্ট। আর যার সুখের কপাল, তার সুখের পর সুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান মানুষকে সুখও দেন না, দুঃখও দেন না। মানুষ যেমন করে, যেমন চায়, তেমনি পায়। দুঃখ যা'তে পেতে হয়, তেমনভাব চ'লে মানুষ

মুখে-মুখে যদি সুখ চায় এবং সুখ না পাওয়ার জন্য আপসোস করে, তাহ'লে বুঝতে হবে সে নিজেকেও সেই সঙ্গে-সঙ্গে অপরকেও প্রতারণা করছে। এত অকাম যে আমরা করি, তবুও কিন্তু পরমপিতা কাউকে তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত করেন না। একজন পাপ করলো ব'লে প্রকৃতির অবদান সে কিন্তু কিছুই কম পায় না, বাতাসটা পুণ্যবানের জন্য বয়, পাপীর জন্য বয় না, সূর্য্য সৎলোককে আলো ও তাপ দেয়, অসৎলোককে আলো ও তাপ দেয় না—তা' কিন্তু নয়। পরমপিতা সব সময় সবার ভালই করেন। মন্দের স্রষ্টা আমরা। তবে মন্দকে ভালয় পর্য্যবসিত করার শক্তিও পরমপিতা আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ অবিচার করতে পারে, কিন্তু তিনি কখনও অবিচার করেন না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন ঃ—মানুষ আর কোথাও দোষারোপ করার জায়গা না পেয়ে যে-একজনকে দোষারোপ করে, তিনিই ভগবান, তখনই কেবল শয়তান ভগবানের দিকে চায়।

উক্ত মা—আমার ছেলেটি বড় দুষ্ট, কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেটির যা'তে মা'র উপর টান হয়, তাই করিস। বাপ-মার উপর যে ছেলের টান থাকে, সে যতই দুষ্ট হোক ভাল হ'য়ে যায়।

একটি দাদা বললেন—আমার একজন সহকর্ম্মী আমার নামে লোকের কাছে মিথ্যা নিন্দা ক'রে বেড়ায়। এ-ক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কি ক'রে জানলে যে সে মিথ্যা নিন্দা করে ?

দাদাটি বললেন—যাদের কাছে নিন্দা করে, তারাই আমাকে বলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেও তার বক্তব্যটা তার কাছে থেকে শোনা লাগে। তুমি হয়তো একজনের প্রতি সজ্ঞানে কোন অন্যায় করনি। কিন্তু সে তোমার কাছ থেকে যা' প্রত্যাশা করে, তা' হয়তো পায় না। তার প্রত্যাশা সমীচীন কিনা এবং তোমার পক্ষে তার প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব কিনা, এতখানি ভেবে দেখার মতো মনের অবস্থা সকলের থাকে না। কারণ, obsession (অভিভূতি) সুস্থ-চিন্তাশক্তিকে নষ্ট ক'রে দেয়। ঐ অবস্থায় নিজে-নিজে অকারণ দুঃখিত, নিরাশ ও অসন্তুষ্ট হ'য়ে তার পক্ষে তোমার বিরুদ্ধে নিন্দা ক'রে বেড়ান অসম্ভব নয়, যদিও তা' অন্যায়। এমন হ'লে দোষারোপ না ক'রে সহানুভূতির সঙ্গে তার সাথে খোলামেলা কথাবার্ত্তা বলা ভাল, যাতে সে তোমার কাছে প্রাণ খোলে। তখন হয়তো তুমি তার obsession (অভিভূতি) remove (দূর) করার সুযোগ পেতে পার। অপরের কাছে কিছু শুনে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে তার সঙ্গে সরাসরি কথা ব'লে তার দিকটা শোনা ভাল, প্রয়োজন-মতো মোকাবিলাও করতে হয়। তা'তে মানুষের দুরিত-বুদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'লে তা' সমীচীনভাবে resist (নিরোধ) করতে হয়, আর foolish obsession (নির্ব্বোধ অভিভূতি) আছে বুঝলে তা' থেকে তাকে উদ্ধার করতে হয়। মোকাবিলা করালে অনেক সময় দেখা যায়, কথাটা originally (গোড়ায়) innocently (নির্দ্দোষভাবে) বলা, পরে তার সঙ্গে জোড়াতালি লাগিয়ে ক্রূর উদ্দেশ্য আরোপ ক'রে

ব্যাপারটাকে জটিল ও জংলা ক'রে তোলা হয়েছে। গোলমাল বাধাবার ব্যাপারে অনেকের খুব উৎসাহ দেখা যায়। তোমরা এমনভাবে চলবে যা'তে গোলমাল মিটে যায়, পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের আত্মাভিমানকে খাটো ক'রেও এটা করা ভাল। তা'তে শেষ পর্য্যন্ত মানুষ বড় হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলঘরে। হাউজারম্যানদা, তাঁর মা, দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালবাসার একটা মস্ত লক্ষণ হচ্ছে Beloved-এর (প্রিয়ের) যাতে কোন আপদ-বিপদ বা ক্ষতি হ'তে না পারে, সে-সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ ও হুঁশিয়ার থাকা। এই রকমটা থাকলে আগে থাকতেই সে ঐ-সব সম্বন্ধে টের পায়, এবং ও-গুলির নিরাকরণের জন্য prepared (প্রস্তুত) হয়। Lord (প্রভু)-কে protect (রক্ষা) করার urge (আকূতি) যার যত প্রবল হয়, self-protecting knack (আত্ম-রক্ষণী কৌশল)-ও তার তত মাথা তোলা দেয়। যে শুধু নিজেকে বাঁচাতে চায়, সে বাঁচার কায়দা ঠাওর পায় না। যে Beloved-এর (প্রিয়ের) জন্য বাঁচতে চায়, নিজের বাঁচাটা তার কাছে সমস্যা হ'য়ে দেখা দেয় না। সে automatically (আপনা থেকে) টিকে থাকে। Lord (প্রভু)-কে ভালবাসার আর একটা লক্ষণ হ'লো তাঁকে নিজের মধ্যে alive (জীয়ন্ত) ক'রে তোলা, অর্থাৎ নিজের character (চরিত্র)-কে তাঁর likes, dislikes (পছন্দ-অপছন্দ)-অনুযায়ী mould (গঠন) করা। এমনি ক'রে মানুষের সদ্‌গুণ বাড়ে ও সেগুলি ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে ওঠে, আর দোষগুলিও কমে।

হাউজারম্যানদার মা—আপনি প্রভুর জীবনরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলছেন, কিন্তু মানুষে সে ব্যাপার করতে পারে কতটুকু ? তিনি যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, তাই-ই ঘটে, তাই-ই হয়। দেহ নিয়ে যেমন তিনি কাজ করেন, বিদেহ অবস্থায়ও তেমনি তিনি কাজ করেন। মানুষের অন্তরে-অন্তরে তাঁর কাজ চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বিশ্বাস করি Christ could be saved, Srikrishna could be saved, if the adherents were careful (ভক্তরা সতর্ক হ'লে যীশু-খৃষ্টকে বাঁচান যেত, শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচান যেত) তাঁদের বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের স্বার্থ। তাঁরা বিদেহ অবস্থায়ও হয়তো অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু আমরা দেহধারী, সেই হেতু আমরা তাঁদের জীবন্ত দেহধারীরূপেই পেতে চাই। আমাদের চাওয়াটা বড় কথা নয়। মানুষ মাত্রেই চায় বাঁচতে। তাঁরাও যে বাঁচতে চাইতেন না, এ-কথা মনে হয় না। কিন্তু তাঁদের বাঁচার উপযোগী ও সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের উপর। Any death is perhaps against the wlll of God. The will of Satan may be active there. The opposite thing of God is death. God is always life and light. (যে-কোন মৃত্যু হয়তো ভগবানের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে। হয়তো শয়তানের ইচ্ছা সেখানে সক্রিয়। ভগবানের বিপরীত জিনিস মৃত্যু। ভগবান সর্ব্বদা জীবন ও আলো।)

মা—আমি এটা বিশ্বাস করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এ-কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি। I believe it with every cell of my being (আমি আমার সত্তার প্রতিটি কোষ দিয়ে এ-কথা বিশ্বাস করি।

মা—মৃত্যু মানে আধার বা বাহনের পরিবর্ত্তন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবর্ত্তন অনেক রকমের হ'তে পারে, কিন্তু why cessation of conscious memory (চেতন স্মৃতির বিরতি কেন)? মৃত্যুর পর আর যা' হো'ক বা না হো'ক স্মৃতিবাহী চেতনা চাই-ই। তাহ'লে মানুষ বুঝতে পারে যে সে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে একই stream of life (জীবন-স্রোত) বহন ক'রে চলেছে। তার experience ও knowledge (অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান) accumulated (সঞ্চিত) হ'য়ে চলে। নইলে প্রত্যেক জীবনে কেচে-গণ্ডূষ করতে গেলে evolution-এর (বিবর্ত্তনের) পথে অনেক time & energy (সময় ও শক্তি) wasted (নষ্ট) হয়। আমি কই—মৃত্যু মরুক, আমরা অমৃতের সন্তান, আমরা মরব কেন? যদি যাইও, minimum (ন্যূনতম) এইটুকু চাই যে conscious memory (চেতন স্মৃতি) যেন থাকে। দিল্লীর শান্তির কথা যা' শুনেছি, তাতে খুব ভরসা হয়। Culture (অনুশীলন) করলে, প্রত্যেকেই হয়তো স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করতে পারে।

মা—আমি আমার পূর্ব্ব ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই, সে-ধারণাকে আমি বদলাতে চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাল। তবে মা বলতেন—যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, মিলালে মিলিতে পারে অমূল্য রতন। পরমপিতার রাজ্যে কত কি যে সম্ভব তা' ব'লে শেষ করা যায় না। Profitable possibility (লাভজনক সম্ভাবনা)-কে ignore (উপেক্ষা) করা ভাল না। There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio! (হোরেশিও! তোমার দর্শনশাস্ত্র যার কল্পনা করতে পারে না, তেমন বহু জিনিস স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আছে)।

মা—মানুষ যা' কল্পনা করতে পারে না, এমন অনেক জিনিস প্রার্থনার দ্বারা সিদ্ধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা খুব ঠিক। পরমপিতার কাছে active submission (সক্রিয় নতি) যার যত প্রবল হয়, তার চলনও তত নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী হয়। প্রার্থনার মধ্যে আছে ইষ্টাভিমুখী ভাবা, বলা, চলা। প্রার্থনাময় হ'লে মানুষের চরিত্রই বদলে যায়। ভক্তিমান মানুষ truth (সত্যি)-কে ignore (উপেক্ষা) করে কম, তাই তার ignorance (অজ্ঞতা)-ও দিন-দিন পাতলা হ'য়ে আসে,

জ্ঞান ও বোধ যায় বেড়ে। পরিবেশ ও প্রকৃতির আনুকূল্যও তার প্রতি ঝুঁকে আসে। আমরা জগৎকে যে-ভাবে গ্রহণ করি, জগৎও আমাদের সেইভাবে গ্রহণ করার তাগিদ বোধ করে। পশুপক্ষী, গাছপালা পর্য্যন্ত আমাদের ভিতরের প্রীতি-অপ্রীতির ভাব টের পায় ও সেইভাবে সাড়া দেয়। মানুষ যত ঈশ্বরপ্রেমী হয়, সবার প্রতি ভালবাসা তার তত মজ্জাগত হ'য়ে ওঠে। তার ফলে automatically (আপনা থেকে) known and unknown (জ্ঞাত ও অজ্ঞাত) বহু source (উৎস)-থেকে সে help (সাহায্য) ও co-operation (সহযোগিতা) পায়। পরমপিতার দয়ার অন্ত নেই। যতই তাঁতে লগ্ন থাকা যায়, ততই তা' পদে-পদে টের পাওয়া যায়। অহংকারে যারা অন্ধ হ'য়ে থাকে, তারা বোধ করতে পারে না পরমপিতার দয়া কি বিরাট role play (ভূমিকা গ্রহণ) করে আমাদের জীবনে। যারা বোঝে তারা লহমার জন্যও তাঁর কথা ভুলে থাকতে পারে না। আর, যারা তাঁকে কখনও ভোলে না, তাদের আর পায় কে ? তারা তো মার দিয়া কেল্লা ! পরমপিতায় তন্ময় হ'য়ে চলার যে সুখ, সে সুখের আর তুলনা হয় না। সে কোন-কিছুর জন্য তাঁকে ডাকে না, তাঁকে ছাড়া তার চলে না, তাই সর্ব্বদা তাঁকেই ভাবে, তাঁকেই কয়, তাঁর জন্যই যা' কিছু করে। ছেলেবেলা থেকে মা'র উপর আমার অসম্ভব নেশা। মা আমাকে গালাগালি দিলে বা মারলেও মাকে ছাড়া আমার চলত না। মাকে আমার এতই দরকার যে এখনও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না যে মা for good (চিরকালের জন্য) চ'লে গেছেন। এই ব'লে মনকে ভাঁড়াই যে মা হয়তো শীঘ্র চ'লে আসবেন।

প্যারীদার উপর একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। তাই প্যারীদাকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে ! কাম হাসিল করছিস তো ?

প্যারীদা সঙ্কুচিতভাবে বললেন—এখনও সময় পেয়ে উঠিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিষণ্ণভাবে বললেন—আমার মনটা খারাপ ক'রে দিলি। আমি তো জানি তোর সময়ের অভাব। তৎসত্ত্বেও যে আর একটা responsibility (দায়িত্ব) দিয়েছি, তার উদ্দেশ্য তোর efficiency ও power of quick execution (দক্ষতা ও ক্ষিপ্র কর্ম্মসম্পাদনের ক্ষমতা) যাতে বেড়ে যায়। তোরা ক্রমাগত বেড়ে চলেছিস এইটে দেখতে পেলেই আমার খুব satisfaction (তৃপ্তি) হয়। সুবিধা-সুযোগের মধ্যে অনেকে অনেক কাজ করতে পারে। আমার দেখতে ইচ্ছা করে অসুবিধা সত্ত্বেও কে কত স্থিরমস্তিষ্কে তৎপরতার সঙ্গে কাজ উদ্ধার করতে পারে। আমার নিজের চরিত্রটাও ঐ রকম। বাধাবিঘ্ন বা অসুবিধাকে আমি কোনদিন ডরাইনি। তাছাড়া ৫ মিনিটে যা' পারি, তা ২½ মিনিটে করা যায় কিনা দেখতাম। নিজেকে চাপের মধ্যে ফেলতে ভাল লাগতো। সেইটেই যেন আমার আরাম। এখন শরীরটা অপটু হওয়ায় আগের মতো পারি না।

এরপর অনেকেই বিদায় গ্রহণ করলেন।

সমাপ্ত